তামিল গল্প সংগ্রহ

আদান-প্রদান

তামিল গল্প সংগ্রহ

সম্পাদক

মি. পা. সোমসুন্দরম্

অনুবাদ

অজিতকুমার দত্ত

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিশ্বের সব ভাষাতেই আজ কথা-সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এর উন্নতিকল্পে সবারই একটা বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। প্রধান কারণ, কাহিনী যুগধর্মের অন্যতম পরিচায়ক হিসেবে বিকাশমান নব্য সাহিত্যকে নিরন্তর সমৃদ্ধিশালী করে তুলছে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত, তামিল-গল্পও আজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। একথা সত্য যে এই গল্প-শাখার সূত্রপাত ঘটেছে বহুকাল পূর্বেই, লোকগাথার পরম্পরা থেকে। তামিলনাড়ুর ঘরে ঘরে, বারোয়ারী চৌচালায়, শহরে-গঞ্জে আর সাহিত্যের আসরে, আবৃত্তি আর কথকতার আকারে সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। আজকের তামিল কথা-সাহিত্যের ওপর পশ্চিমী ছাপটা খুবই স্পষ্ট। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে আজ তামিল ভাষায় নব আকারে ও নব রূপে নতুন ভাব ও গঠনশৈলীতে অসংখ্য কাহিনী রচিত হচ্ছে।

কিছুকাল আগে এক বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্থা আয়োজিত এক সমীক্ষার সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায় যে তামিলে প্রতি বছর এক হাজারেরও অধিক গল্প প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে বৃহৎ আর এটাও ঠিক যে এরই ভেতর কিছু গল্পের স্থায়ী সাহিত্য-মূল্য রয়েছে।

প্রতি বছরের হাজার গল্প থেকে, বিশেষ করে সেটা যখন বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের সীমায় গিয়ে ঠেকেছে, বাছাই করার কাজটা খুব সহজ নয়। একথা অনস্বীকার্য যে মাত্র কুড়িটি গল্পের এই সংগ্রহে অনেক শ্রেষ্ঠ লেখক আর অনেক ভাল লেখাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। একই ধরনের কাহিনীর মধ্যে কোনটা নির্বাচন করা যায় আর কোনটা যায় না, এটা স্থির করার কাজটাও সোজা ছিল না।

এই রচনা-সংগ্রহের বিশটি কাহিনীর নির্বাচনে আমাকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছে। অধ্যাপক কে. স্বামীনাথন আর ড: মু. বরদারাজনের পরামর্শানুযায়ী আমার নিজের বাছাই গল্প থেকে কিছু বাদ দিয়ে নতুন কিছু গল্প যোগ করেছি। এত সবের পরেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে মাত্র এই বিশটি গল্প তামিল গল্প-সাহিত্যের পূর্ণ-প্রতিনিধিমূলক নয়। আমি আশা করছি যে আরেকটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশের পর এই ঘাটতি পূর্ণ হবে আর দুটি সংগ্রহ মিলে তামিল কাহিনী-সাহিত্যের পরিচয় দিতে অনেকটা সক্ষম হবে।

পরিসরের স্বল্পতা বা গল্পের দৈর্ঘের কারণে ইচ্ছা সত্বেও কিছু গল্প এই সংকলনে

সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। তবুও আমার ধারণা যে, এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত সব গল্পই মোটামুটি উচ্চমানের। গল্পের মান নির্ধারণের সঙ্গে অন্য বিষয়েও কিছু মনে রাখা প্রয়োজন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের প্রধান ড: বালকৃষ্ণ কেশকর এধরনের গল্প-সংগ্রহ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত একটি কথায় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কাহিনী-সংগ্রহের ভাষান্তর ব্যাপারে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, নির্বাচিত গল্প যথার্থই উচ্চমানের ও অন্য ভাষায় অনুবাদযোগ্য কিনা। যদি অন্য ভাষা-ভাষীরা এই সঙ্কলন-মারফৎ তামিলনাড়ুর লোকেদের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, ভাবনা-চিন্তা বা লৌকিক-সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, তবে সেটা খুবই সুখের ব্যাপার হবে। তাঁর এই বক্তব্যের গুরুত্ব আর জাতীয় ঐক্যের কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করে, কয়েকটি গল্প আমি এই সঙ্কলনের জন্য বাছাই করেছি।

অন্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে তামিলনাড়ুর লেখকদের পরিচয় করানোর জন্য গল্পের শুরুতেই কাহিনীকারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে তামিলনাড়ুর লেখকরা সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক গৌরব, ভাষার ব্যঞ্জনা, জনজীবনের প্রাচীন প্রথা, শিল্পসমৃদ্ধ চিত্রকল্প তথা জীবন-দর্শন যেভাবে ভাষায় ব্যক্ত করেন, সে-সবই এই সংগ্রহে সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

যদি এই সঙ্কলন, তামিল-গল্পের সুসমৃদ্ধ পরিচয়-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে, এ ভাষায় আরও গল্প-পাঠের কৌতূহল বাড়াতে সহায়ক হয়, তবেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। আমার ধারণা এই একদিক থেকেই এ গল্প-সংগ্রহ জাতীয় ঐক্য ও বোঝাপড়া বাড়াতে সহায়ক হবে।

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে সব ভিন্নভাষী বন্ধু ও ভাইয়ের আমি সহযোগিতা লাভ করেছি, তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মি. পা. সোমসুন্দরম্

রাজাজী (চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী)

জন্ম ১৮৭৮ সালে। অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজির সঙ্গে যোগদান করেন। দুই বার মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হন, পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম গর্ভনর জেনারেল। একজন মননশীল লেখক হিসাবে সুপরিচিত। ভাবগম্ভীর ভাষণ ও রচনায় তামিল সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

দেবানৈ

রামনাথ আয়ার আর তার স্ত্রী সীতালক্ষ্মী নিজেদের মোটরে চায়না বাজারে গিয়ে কিছু জিনিস কিনল। রেঁস্তোরায় কিছু খেয়েদেয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল। রামনাথ আয়ার জিজ্ঞাসা করল, 'সমুদ্রের ধারে যাবে?'

'সমুদ্রের ধারে? হ্যাঁ, চল। তবে গাড়ী এমন জায়গায় যেন রাখে যেখানে ভিড় নেই। আমার আবার ভিড় একেবারেই সহ্য হয় না। এক-আধটা কিছু কেনো। নিয়ে যাই বাচ্চাদের জন্য...।'

সীতালক্ষ্মী তার কথাও শেষ করেনি কিন্তু কি আশ্চর্য খেলনাওয়ালা তার মনের কথাটা ঠিক ধরতে পেরে গাড়ীটার পাশে এসে গেল। গাড়ীতে বসেই দর-দস্তুর করে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে নিল। তখনই গাড়ীর অন্য দরজার পাশে এসে একটি যুবতী ভিখারিণী দাঁড়াল। নিজের কোলের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে সে বলল, 'দয়া করুন বাবুজী। মা বাচ্চাটার দিকে তাকান একবার।'

এদিকে রামনাথ আয়ার জিজ্ঞাসা করল, 'সব খেলনাই ত' জাপানী না?'

বিক্রেতা উত্তর দিল, 'জাপানী নয়ত কি? আমাদের দেশে এধরনের খেলনা বানায় কোথায়?'

ভিখারিণী আবার ভিক্ষা চাইল।

সীতালক্ষ্মী বলল, 'কেনাকাটার সময় আবার এই নচ্ছারটা কোথা থেকে এসে হাজির হল! এ শহরে ভিখারিগুলো বড্ড ঝামেলা করে।

'খিদে পেয়েছে, মা। এদিকে একটু তাকান—রাজরাণী হবেন আপনি', বলল ভিখারিণী।

'যাবি, না পুলিশ ডাকব?' বলে সীতালক্ষ্মী ধমক দিল ওকে।

'মা, দেখুন দুধ না পেয়ে বাচ্চাটা কিরকম কাঁদছে। এক আনা পয়সা দিন না...রাজাবাবু, কত পয়সা আপনারা কতভাবে খরচ করেন।'

ওকথায় কান না দিয়ে, দাম-দস্তুর করে কেনা জিনিসগুলো গাড়ীতে গুছিয়ে রাখতে রাখতে রামনাথ আয়ার বলল, 'গাড়ী চালাও, সমুদ্রের ধারে চলো।'

ড্রাইভার ভিখারিণীটাকে সরে যেতে বলে গাড়ী চালিয়ে দিল।

'বাবুজী, বাবুজী', চীৎকার করতে করতে গাড়ী ধরে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়াতে লাগল ভিখারিণীটা।

'আসিস না, মরবি', রামনাথ বলল ওকে। তখনই ভিখারিণীর চেহারার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। মনে হল সে কোথায় যেন দেখেছে ওকে।

গাড়ী জোরে চলছে। সে বলল, 'হায় বেচারী! বাচ্চা মেয়ে! চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ও-অঞ্চলেরই।'

'তা' যেখানকারই হোক, এসব বদমাইসদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?...এগুলো কি নতুন ধরনের কিছু? উড়ো জাহাজ? দাও না আমায় একটু দেখি। চাবি দিয়ে চালায়, না সাধারণ ধরনের?' একথা বলে সীতালক্ষ্মী একটা একটা করে খেলনা দেখতে লাগল আর সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেল।

দুই

সালেমের পোন্নম্মাপ্পেট্টে পেরিয়ান্না মুদলী গলিতে এক গরীব জোলা পরিবার বাস করত। তিনজন লোকের পরিবার—ত্রিশ বছরের বৈয়াপুরী, ওর বিশ বছর বয়সের অবিবাহিত বোন দেবানৈ আর ওদের মা পলনিয়ম্মাল। তিনজনেই পারিবারিক বৃত্তি—কাপড় বোনার কাজ করে অতিকষ্টে দিন যাপন করত। সারাদিন ধরে কাজ করে তিনজন মিলে সপ্তাহে চার টাকা কামাত।

ক্রমে হাতে-বোনা, কাপড়ের ব্যবসায়ে মন্দা লাগল আর এদের মজুরির অঙ্কও কমে গেল। এর পর যৎসামান্য কাজের অভাবে লোকের দুর্গতির আর সীমা রইল না। সালেমের অন্য বহুজনের মতো বৈয়াপুরীরর তাঁতও অচল হয়ে পড়ল। দেবানৈ উচ্চপদস্থ ব্রাহ্মণদের গৃহে ঘর ঝাড়-পোঁছ ইত্যাদি ছোট ধরনের কাজ করতে লাগল। এতে মাসে তার তিন টাকা রোজগার হত। ওর মা পলনিয়ম্মালও ঘর পরিষ্কারের কাজ করে মাসে এক টাকা পেত। চাকুরীর জন্য বৈয়াপুরী মিল-মালিকদের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এভাবে কিছুদিন চলে গেল, কিন্তু কোথাও চাকুরী মিলল না। তখন মাকে জানিয়ে সে ব্যাঙ্গালোর চলে গেল। মিলে চাকুরীর উদ্দেশ্যে সালেমের কোনও বৈশ্য পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তিও তার সঙ্গে গেল।

সেখানে পৌঁছে কিছুদিন ঘোরাফেরার পর পত্র লিখে বৈয়াপুরী জানালো এক মিলে সে কাজ শুরু করেছে। বৈয়াপুরী লেখাপড়া জানত। ছোটবেলা ওর বাবা ওকে পোন্নম্মাপ্পেট্টের সরকারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সে সময় জোলাদের জীবন এত কষ্টময় ছিল না।

'অনেক ঝামেলার পর কিছু লোককে টাকা-পয়সা দিয়ে একটা মিলে আমি ঢুকেছি।

দিনে আট আনা মজুরি। মাসে ছাব্বিশ দিন কাজ করতে হয়। এ হিসেবে তের টাকা পাব। এ মাসের মাইনে খাওয়া-খরচ আর ধার-দেনা শোধ করতেই চলে যাবে। এর পর থেকে মাসে দুটাকা করে আমি তোমাদের পাঠাব। ভগবানই মালিক—তিনিই শেষ অবধি দেখবেন আমাদের।' প্রতিবেশী মারিয়প্প মুদালিয়ারের ছেলে বৈয়াপুরীর চিঠিখানা পড়ে শোনাল।

দশদিন বাদে দ্বিতীয় পত্র এল।

'মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাচ্ছি। ভগবৎ কৃপায় এখনে কুশলে আছি। এই মিলে কাজ করতে আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। বাড়ীতে বসে যখন তাঁত বুনতাম, সে সময়ের কথা ভাবলে চোখে জল আসে। মনে হচ্ছে আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। মাথা ঘুরতে থাকে। নিজের মানসিক ও অন্যান্য কষ্টের বর্ণনাও করতে পারছি না। মনে হয় কেন নিজের জায়গা ছেড়ে এখানে এসেছিলাম! পড়শীর ছেলেকে দিয়ে, চিঠি লেখাতে পারলে লিখিও। ঠিকানায় সালেমের পোন্নম্মাপেট্রের বৈয়াপুরী, মল্লেশ্বরের মজুরগলি—এভাবে লেখাবে।'

তিন

যে কটা বাড়ীতে ঝাড়-পোঁছের কাজ করত দেবানৈ, তারমধ্যে একটিতে এক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুবই ভাল। কাজের বেলায় তেড়ে কাজ করাতেন, কিন্তু আচার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই স্নেহপরায়ণ। তিনি দেবানৈকে একটা শাড়ী দিয়েছিলেন। উদ্বৃত্ত ভাত-সব্জীও দিতেন যখন-তখন। এভাবে কিছুদিন কাটল।

ওর এধরনের সুখ বোধহয় দেবতাদের সহ্য হয়নি। ওই বাড়ীতে একটি রসুইও ছিল। সে দেবানৈকে বেঁচে-যাওয়া খাবার ইত্যাদি দিত। মজা করবার চেষ্টা করত। একদিন লোকটার ব্যবহার ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

দেবানৈর রাগের আর পরিসীমা রইল না। কিন্তু কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে তার খুব লজ্জা হল। 'কাউকে বলবি না, আমি তোকে মাসে দুটো করে টাকা দেব', একথা বলে সেই ইতর লোকটা দেবানৈকে বশ করে ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইল।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে বাড়ী পৌঁছে মাকে বলল। 'মা, আমি আর নিমগাছওয়ালা বাড়ীতে কাজ করব না।'

মা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে যা যা হয়েছে সব বলল। সব কথা শুনে বুড়ী মা বলল, 'এখনই গিয়ে গিন্নীমাকে সব বলছি।' কথাটা বলে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

'না, মা! ওদের এসব বলে কি লাভ? আমি আর সে বাড়ীতে কাজ করছি না'

বলল দেবানৈ।

অন্য জায়গায় সে কাজ খুঁজতে লাগল। সব বাড়ীতেই কেউ না কেউ কাজ করছে দেখা গেল। দুমাস এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরির পর এক কাজ মিলল।

ছ'মাস চলে গেল। ব্যাঙ্গালোরে বৈয়াপুরীর মিলে ধর্মঘট হল। মজুরদের এক সর্দারকে কোনও একজন অফিসার নাকি একটা চড় মেরেছিল। আর শুধু তাই নয়, সেই মজুর আর কয়েকজন সঙ্গীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিল। শ্রমিক সঙ্ঘ পরে এক সভা আহ্বান করে। নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে মাসের বেতন নিয়ে ওরা ধর্মঘট শুরু করে। বৈয়াপুরীকেও সে ধর্মঘটে অংশ নিতে হয়।

একমাস চলল সে ধর্মঘট। অনেকগুলো শ্রমিক-সমাবেশে দাঙ্গা-মারামারি হল। গোড়ায় গোড়ায় সবারই খুব উৎসাহ ছিল। হাতের পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায় সে উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। সরকারীভাবে মিটমাটের চেষ্টা একটা হয়েছিল। সবাই মিলে আবার কাজও শুরু করল। এক সপ্তাহ বাদে মিলের গেটে একটা নোটিশ টাঙিয়ে বিশজন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হল। তাদের মিলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল। এই কুড়িজনের মধ্যে বৈয়াপুরীও ছিল।

বৈয়াপুরী গিয়ে স্বীয় অফিসারকে বলল, 'স্যার, আমি ত' দোষ কিছু করিনি। আমি নতুন এসেছি এখানে। আমি ধর্মঘটে যোগ দিইনি।'

সেই অফিসার উত্তরে বলল, 'এ ত ওপরওয়ালার আদেশ। এ সবই বদমাইস টাইমকীপার রঙ্গস্বামী নায়কনের কাজ। অন্যান্যদের সঙ্গে তোর নামটাও সে বড় অফিসারের কাছে দিয়ে দিয়েছে। এখন আমি আর কিছু করতে পারব না।'

তারপর সে গিয়ে রঙ্গস্বামী নায়কনের কাছে অনুনয়-বিনয় করল। সে বলল, 'আমি কিছুই জানি না। এসব সেই ব্রাহ্মণ পে-ক্লার্কটারই কাজ।' কাউকেই মিনতি জানিয়ে কোনও কিছু ফল হল না। ম্যানেজারের কাছে যাওয়ায় উনি বললেন, 'তুই ত লেখাপড়া জানিস। তুই অন্যদের উস্কে দিয়েছিস। তোকে আর আমি কাজে বহাল করতে পারি না।'

দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর হাতের পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায়, অতি কষ্টে বৈয়াপুরী মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছাল। ওরই মত মিল থেকে বরখাস্ত আরেক শ্রমিকও চাকুরীর খোঁজে একই সঙ্গে মাদ্রাজ গেল। ওদের কাছে কিছু পয়সা ছিল। নিজেদের মধ্যে আপোষে সেটা সমান-সমান ভাগ করে নিত। তা থেকে খাওয়া-খরচ চালিয়ে দিন আষ্টেক নানা মিলে সে চক্কর লাগাল। শেষ অবধি একটা মিলে বৈয়াপুরীর চাকুরী জুটে গেল।

যা রেওয়াজ, গেটের চৌকিদার ও অন্যান্য কিছু লোককে কিছু দেবার জন্য চার-পাঁচটা টাকার প্রয়োজন হল। এ-বাবদে, খাওয়া-খরচ আর আগেকার ধার-কর্জ মেটাতে গিয়ে বৈয়াপুরীকে নিজের কানের লৌল বন্ধক রেখে টাকা নিতে হল। মাদ্রাজের

মিলে চাকুরী পাবার কিছুদিন পর থেকেই নিজের দুঃখ ভোলার উপায় হিসাবে সে মদ খেতে শুরু করল। সালেমে থাকাকালীন এ-অভ্যাস তার ছিল না। কিছুকাল পরে বন্ধুরা বোঝাল যে জুয়া খেলে পয়সা রোজগার করা যেতে পারে। সেটাও সে শুরু করল। মজুরির পয়সা থেকে খাওয়া-খরচ আর ঘরভাড়া দিয়ে যা বাঁচত সেটা বৈয়াপুরী বাড়ীতে আর না পাঠিয়ে ওসব কাজে খরচ করতে লাগল। মহাজনের কাছে ধার-দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল। এই অসহনীয় কষ্ট এড়াতে সে আরও বেশি মদ খেতে লাগল।

গোড়ায় বৈয়াপুরী নানা বাহানা তোলার চেষ্টা করত। পরে সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে পয়সা পাঠানো আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। দরকার হয় ত' দেবানৈ মাদ্রাজে এসে কোনও মিলে চাকুরী নিতে পারে। এই চিঠি পেয়ে দেবানৈ আর পলনিয়ম্মালের বুক কেঁপে উঠল।

দিন কয়েক বাদে দেবানৈ একসময় মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা আমি মাদ্রাজ চলে যাই না কেন? আমি বৈয়াপুরীর সঙ্গে কাজ করে পয়সা রোজগার করব। তোমায় সে টাকা পাঠাব। অনেক মেয়েরাও ত মাদ্রাজে অফিসে চাকুরী করে। তাই না?'

প্রথমে মা রাজী হয়নি। বলেছিল, 'এ কখনও হয়? তুই ত নিতান্তই অবোধ বালিকা। তুই যাবি সেখানে?' এ-ধরনের তর্কাতর্কির পর বৃদ্ধা মা মেনে নিল। প্রতিবেশী মারপ্পনের কাছে সোনার কর্ণফুল বাঁধা রেখে বারোটা টাকা সে ধার নিল। দেবানৈ মাদ্রাজ রওয়ানা হয়ে গেল।

মাদ্রাজে এক মিলে বোনাই বিভাগে বৈয়াপুরী দেবানৈকে কাজে লাগিয়ে দিল। বৈয়াপুরীর ছিল অন্য একটা মিল। দেবানৈর মতো আরও দেড়শ মেয়ে এই মিলে কাজ করত। তাদের মধ্যে কারুর বা অল্প বয়স, কারুর বা বেশি। দেবানৈ আর তার সঙ্গের দশজন মেয়ের ওপর ছিল একজন সর্দার। প্রথম প্রথম দেবানৈর সঙ্গে সে খুব ভাল ব্যবহার করত। কিন্তু পরে তাকে বকাঝকা আরম্ভ করল। কখনও কখনও গাল-মন্দও করত। তবে একলা পেলে, অকারণই খুব আদর করে কাথাবর্তা বলত।

'এই, সর্দার এমনতর ব্যবহার কেন করছে? দেবানৈ তার সঙ্গের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'তুই এসব কিছুই বুঝিস না? তুই জানবি-ই বা কি করে? গাঁ থেকে এসেছিস! ওর সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার না করলে, তোর বেতনের অর্দ্ধেকই জরিমানা হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। তাই ওকে খুশী রাখা তোর বিশেষ প্রয়োজন।

দারিদ্রের কষ্ট কে বোঝে! গরীব ঘরে জন্মিয়ে মিলে মজুরি পূর্বজন্মের পাপের ফল বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

দেবানৈ কিছুদিন সবই সহ্য করল। তার স্থির ধারণা হল যে ভগবান বলে কেউ নেই। আর সর্দারের সঙ্গে ঝগড়ায়ও সে ক্ষান্ত দিল। নিজেকে বোঝাল। হেসে কথা

বলতে লাগল ওর সঙ্গে। এতেই ক্রমে আনন্দ পেল সে। মজুরিও তার বাড়ল।

আরও কয়েক মাস কেটে গেল। দেবানৈর শরীরে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। জানা গেল সে অন্তঃসত্ত্বা। তখন নানা দেবদেবীর কাছে মানত শুরু হল। 'আমি একথা কাকে গিয়ে বলি।' এসব ভাবনা ভেবে চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। শিকারীর লক্ষ্য থেকে ছুটে পালানো ভয়-চকিতা হরিণীর অবস্থা দাঁড়াল তার। ভাই বৈয়াপুরীকে বলায় সে ঘাবড়ে গেল। কাজের কজন সঙ্গিনীকে কথাটা বলায় তারা হাসাহাসি করতে লাগল। একবার ভেবেছিল স্বস্থানে ফিরে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়ও হল যে সমাজ তাদের একঘরে করে দেবে। মা-ই বা তার এই অবস্থা সইবে কি করে? এসব ভেবে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার মতলবটা সে ত্যাগ করল। মেনে নিল যে ভগবানই একমাত্র ভরসা। আর এই অবস্থাতেই ধৈর্য সহকারে সে মিলে কাজ করে যেতে লাগল।

আবার একদিন সে চিন্তায় পড়ল। সঙ্গিনীদের গিয়ে বলল, 'হায়,এ কি করলাম আমি? আমার কুলে কালি দিলাম।'

সঙ্গিনীরা বলল, 'দেবানৈ, ঘাবড়াস না। এ'ত এক সাধারণ ব্যাপার। এরও ব্যবস্থা রয়েছে। শীগ্‌গিরই তুই ঠিক হয়ে যাবি।'

'আমিও শুনেছি এসব। তবে চিকিৎসা করাতে ভয় হয়। তাতে প্রাণ সংশয় না ঘটে। হায় ভগবান! কোথায় গিয়ে আমি লুকোই?' ডুক্‌রে কেঁদে উঠল দেবানৈ।

'মুত্থুস্বামী বড়ই-এর গলিতে একটি মেয়েলোক থাকে। দুটো টাকা দিলে সে সব ঠিক করে দেবে', সঙ্গী একটি মেয়ে বলল।

দেবানৈ জিজ্ঞাসা করল, 'পরে আবার পুলিশ খবর পেয়ে ধরে নিয়ে যাবে না ত...?'

ওসব ভাবনা করিস না। ওই মেয়েছেলেটির পুলিসের সঙ্গে ভাল জানা-চেনা আছে। টাকায় সব হয়। একথা তুই কি জানিস না?' সঙ্গিনীটি বলল।

'হায়, টাকার জন্যই বা কোথায় যাই? হায় ভাগবান! তুমি আমায় কি করে সব ভুলিয়ে রাখলে? এই পাপী শহরে কেন এসেছিলাম? সালেমে না খেয়ে মরে গেলেও কত ভাল হত!' এসব বলতে বলতে সে আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

কিছুদিন বাদে তার পরামর্শদাত্রী অন্য একটি মেয়ে তাকে বলল, 'বাচ্চাটাকে প্রাণে মারা ঠিক হবে না। তার যা পাপ, সেটা তিন জন্মেও যাবে না। গণেশ মন্দিরের গলিতে একটা বুড়ী থাকে, সে বেশ ভাল। ওর কাছে গেলে ও সব ঠিক করে দেবে। তোর মত অনেক মেয়েই ওর ঘরে থেকে বাচ্চা বিইয়েছে। তুই চিন্তা করিস না।'

'বোন, তুই সুখী হ' বলে দেবানৈ ওর মঙ্গল কামনা করল। পরে সে গণেশ মন্দির গলির সেই পরোপকারিণী মেয়েলোকটির কাছে গিয়ে হাজির হল। প্রসব ঠিকঠাকমতই হল। বাচ্চার জন্মের পর দুনিয়ার চেহারাই বদলে গেল দেবানৈর কাছে। নিজের সব

কষ্টই সে ভুলে গেল। শিশুটিকে নিয়েই যেন তার সংসারের যত কিছু।

'এ ত ভগবানের দান। এ বেচারা কি করেছে? কুল-কলঙ্কিনী ত' আমি' এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতো। এভাবে কিছুদিন চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রইল।

'দেবানৈ এখনও ত তোর কাজে যাওয়া সম্ভব নয়। আরও কিছুদিন থাক এখানেই।' খুব স্নেহভরে কথাগুলো বলল গণেশ মন্দিরের গলির পরোপকারিণী সেই মেয়েলোকটি।

'এমন সব ভালো লোক রয়েছে, অথচ ঈশ্বরের নিন্দা করেছি' একথা বলে দেবানৈ তার মহিমা গাইতে লাগল।

চার

'সালেমে আমাদের বাসায় কাজ করত সেই দেবানৈর কথা তোমার মনে নেই? ওর মতন লাগছিল ওই ভিখারিণীটাকে' রামনাথ আয়ার বলল।

শুরুতে সালেমে যে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের বাড়ীতে দেবানৈ কাজ করত তারই জ্যেষ্ঠপুত্র এই রামনাথ আয়ার। মাদ্রাজে এক বড় ব্যাঙ্কে সে ক্যাশিয়ার।

'সালেমের সে-মেয়ে এখানে কেন আসবে? এ তোমার ভুল ধারণা', বলল সীতালক্ষ্মী।

'তা যা-ই হোক বা যে-ই হোক, একটা যুবতী মেয়েকে এভাবে বাচ্চা কোলে নিয়ে ভিক্ষা করতে দেখে মনে কেবল এই একটা কথাই উদয় হয় যে দেশের এ কি হাল হল?' রামনাথ আয়ার বলল।

'তোমার সব সময় এই এক চিন্তা দেশ নিয়ে। কেন পরিবার সম্বন্ধে চিন্তার কি কিছু কম রয়েছে?'

পরের দিন সন্ধ্যাতেও রামনাথ আয়ার সেই ভিখারিণীটার কথা ভুলতে পারল না। সোজা অফিস থেকে সে চায়না বাজার পৌঁছুল। সেই জায়গাটায় আবার দেখা হতে পারে, দেখা হলে প্রশ্ন করে ওর সব বিষয় জানা যেতে পারে, এসব কথা চিন্তা করে প্রথম দিনের সেই রাস্তা ধরে রেস্তোরাঁটার ধারে গিয়ে পৌঁছুল। কিছুক্ষণের জন্য নিজের গাড়ীটা রেস্তোরাঁর গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখল। অনেক ভিখারী এসে চেঁচিয়ে ওকে ঘিরে ধরল, কিন্তু সেই ভিখারিণীটাকে আর দেখা গেল না।

এর পরের শনিবারও সন্ধ্যায় রামনাথ আয়ার আর তার স্ত্রী চায়না বাজারে গেল। একটা ছোট ইশারা করে সীতালক্ষ্মী বলল, 'ওই তো তোমার সেই ভিখারী মেয়েটা।'

বাচ্চাটাকে কোলের উপর নিয়ে 'মা, এক আনা পয়সা দাও। এ বাচ্চাটাকে দাও মা'

বলে ভিক্ষা চাইতে চাইতে কিছু দূরে এসে দাঁড়ানো একটা গাড়ীর দিকে সে এগিয়ে গেল।

রামনাথ আয়ারের গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে ভেতরে-বসা লোকটি পয়সা দেবে না, এরকম অনুমান সে করল। তারপর এগিয়ে গেল অন্য গাড়ীর দিকে। অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই এই জ্ঞানটা সেই ভিখারী মেয়েটা লাভ করেছিল। সব কাজের জন্যই তেজ, বুদ্ধি আর কর্মকুশলতার প্রয়োজন হয় বৈকি! দূরে দাঁড়ানো ভিখারী মেয়েটাকে ডাকতে রামনাথের লজ্জা হল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল ওই গাড়ীতে নিজের কাজ শেষ করে তার দিকে আসবে মেয়েটা। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল যে আর তাকে দেখা গেল না।

'আচ্ছা, এবার তবে চল' বলল সীতালক্ষ্মী।

আট দিন বাদে রামনাথ আয়ার আর সীতালক্ষ্মী সিনেমা দেখতে গেল। ছবিটা ছিল নলোপাখ্যান।

গেটে প্রচণ্ড ভিড়। নতুন অভিনেত্রী টী. কে. ধনভাগ্যম্ দময়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করছে।

টিকিট চাইতে জবাব পাওয়া গেল, 'আপনি পরের শো দেখতে পারেন। এই শোয়ের সব টিকিটই বিক্রী হয়ে গেছে।'

রামনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ী গিয়ে আসব?'

সীতালক্ষ্মী জবাব দেবার আগেই একটা ভিখারিণী মোটরের পাশে এসে বলল 'ভিক্ষা দাও মা।'

কি সালেমের সেই মেয়েটি নয় তো? ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রামনাথ আয়ার। এই এক সুর সবারই। তবে এ অন্য একজন।

'এখানে গাড়ী দাঁড় করালেই ভিখারীগুলো জ্বালাতন করে। রামন নায়ার শিগগির বাসায় চলো' সীতালক্ষ্মী ড্রাইভারকে ডেকে বলল।

সে সময় একটা পুলিস এসে ডাণ্ডা উঁচিয়ে সেই ভিখারিণীটাকে তাড়া করল সেখান থেকে।

সেদিন রাতে স্বপ্নে এক ভিখারিণীকে দেখল রামনাথ আয়ার। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই দেবানৈ না? তুই কোথাকার লোক?'

ভিখারিণীর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাচ্চার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, 'হুজুর, আপনি সালেমের না? আপনি নিমগাছওয়ালা সেই বাড়ীর অফিসারের ছেলে না?'

'নায়ার, একে সামনে বসিয়ে নাও', মোটর ড্রাইভারকে সে বলল।

বাড়ীতে পৌঁছুনোর পর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে? এই বদমাইসটাকে বাড়ীতে এনেছো কেন?'

রামনাথ আয়ার বলল, 'একে আমাদের এখানে কাজে লাগিয়ে দিই না কেন? খাওয়া ছাড়া চারটে টাকা দেওয়া যেতে পারে।'

'ভাল বলেছো! এরকম নীচ মেয়েকে বাড়ীতে ঠাই দেবে? কি বুদ্ধি তোমার?' একথা বলে সীতালক্ষ্মী ভিখারিণীটাকে তাড়াল সেখান থেকে।

ভিখারী মেয়েটা বলল, 'মা, আমি চুরি করব না। কাজ যা করতে বলবেন, তাই করব।'

সীতালক্ষ্মী বলল, 'ওসব হবে না। বেরো এখান থেকে।'

একে একটা টাকা দেবার জন্যে রামনাথ আয়ার বাক্স খুঁজতে গেল। পকেটে ব্যাগটা পাওয়া গেল না। খুঁজতে লাগল সেটা। ভিখারিণীর বাচ্চাটা জোরে কেঁদে উঠল...জেগে গেল সে এ-তো স্বপ্ন। ওর মেয়ে রাধা বিছানায় উঠে বসে কাঁদছিল।

'আচ্ছা, এ সবই তবে স্বপ্ন। সীতালক্ষ্মী বাস্তবিকই এতটা নির্দয় নয়' এ ভেবে প্রসন্ন বোধ করল রামনাথ আয়ার।

এর পরে বহুদিন পর্যন্ত বাজার, রেলওয়ে স্টেশন, সিনেমা হল ইত্যাদি নানা জায়গায় ওর খোঁজ করেছিল রামনাথ আয়ার। কিন্তু সেই ভিখারিণীটাকে আর দেখতে পায়নি। কে জানে তার কি হল?

□

শাপমোচন

পুদুমৈপিত্তন

জন্ম ১৯০৪ সালে। এঁর আসল নাম চো. বৃদ্ধাচলম্। দৈনিক 'দিনমণি'-তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সময় নিজের 'মণিক্কোডি' পত্রিকার জন্য নানা উল্লেখযোগ্য কাহিনী রচনা করেন। নবীনতা, চিন্তার গভীরতা তথা সেসবের অতুলনীয় প্রভাবের কারণে তামিল সাহিত্যে পুদুমৈপিত্তন অমর হয়ে রয়েছেন।

পথে একটি প্রস্তর প্রতিমা পড়ে আছে। শিথিল আর ক্ষীণ কটি বিশিষ্ট এর চেহারায় একটা সম্মোহনী রূপ আর আবেগ সঞ্চারের ক্ষমতা। উন্মনা করে দেবার মতো। কোন বিশেষ শিল্পী পৃথিবীতে যেন জন্মই নিয়েছে নিজের স্বপ্নকে রূপায়িত করতে। কিন্তু মূর্তিটির চোখে একটা অবর্ণনীয় শোকের ছায়া। এটা দর্শকের ইন্দ্রিয়কে প্রেম-কামনা-বাসনা মুক্ত করে, শোকমগ্ন করে তুলছে। কোনও শিল্পীর স্বপ্ন নয়, এক শাপের পরিণতি। এ-ই অহল্যা।

অরণ্য পথে, প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রস্তরীভূত শোক প্রতিমার চোখে তার দুঃখের প্রকাশ যেন অনেকটা অপলকহীন তপস্বিনীর দৃষ্টির মতো। সূর্য তাপ বিকীরণ করে চলেছে। কুয়াশা। বৃষ্টি হচ্ছে। ধূলা, পোকামাকড়, পাখি আর কিছু প্যাঁচা। কয়েকটা উড়ছিল। সংজ্ঞাহীন তপস্বিনীর মতো সে পড়েছিল, যেন প্রস্তরীভূত।

কিছু দূরে এক টিলায় ধীবরদের বসতি। ধ্যানমগ্ন হয়ে আত্মসম্বিত এবং দুঃখ ভুলে গৌতম সেখানে তপস্যায় রত। প্রকৃতি অচঞ্চলভাবে তাকেও পোষণ করছিল।

স্বল্পব্যবধানে এই দম্পতির ছায়াদানকারী আশ্রয়টা জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হয়ে ভূমিসাৎ। সেটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে মিশে গেছে। ঘর-গৃহস্থলী সব তছনছ হয়ে লোপ পেয়েছে। দেওয়াল পড়ে গেছে। ধ্বংসাবশেষটুকুই খাড়া। মনোকষ্টের একটা চিহ্নের মতো সব প্রকাশ।

অদূরে গঙ্গার কলকল নিনাদ। কে জানে মা গঙ্গার এদের অপার শোকের সঙ্গে কোনও পরিচয় ছিল কি না!

এভাবে এই দম্পতির অনেক যুগ পার হয়ে গেল।

একদিন...

দিনের প্রথম প্রহরে সূর্যের তাপ ছিল প্রচণ্ড, তবু তরুলতার শ্যামলিমা, ঘন ছায়া আর মৃদুমন্দ পবনে শীতলতার একটা আমেজ। ঠিক এ ধরনের একটা আধ্যাত্মচিন্তাই আমাদের সাংসারিক দুঃখ ভুলিয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে আর আমাদের নতুন বিশ্বাস, মনোবল আর নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

পুরুষ সিংহের বিক্রমে আর কাজ সম্পূর্ণ করতে পারার আনন্দে মনে গুনগুন করতে করতে বিশ্বামিত্র আসছিলেন। মারীচ আর সুবাহু যে কোথায় গেল, কোনো পাত্তাই নেই। বৃদ্ধা তাড়কা বধ হয়ে গেছে। ধর্মে কর্মে রত লোকেদের শান্তি দেবার জন্য আপন শক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি হোম জপ করছেন। এই কথাটা ভেবেই তাঁর মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

বারবার তিনি পেছনে তাকিয়ে দেখছিলেন। চোখে তাঁর অপার স্নেহ মমতার ছাপ। দৌড়ে দৌড়ে দুটি শিশু একে অনাকে ধরবার খেলা খেলছিল। এরা আর কেউ নয়—ঈশ্বরাবতার বালক রাম ও লক্ষ্মণ। রাক্ষসী বিনাশকর্মে লিপ্ত। পরিণাম জানতে পারার আগেই দৌড়ে দৌড়ে একে অন্যকে ধরার চেষ্টা।

ওদের দৌড়োনোর সঙ্গে সঙ্গে ধূলো উড়ছিল। লক্ষ্মণ আগে দৌড়ে যাচ্ছে, রাম তার পেছনে তাড়া করছে। রাশি রাশি ধূলোয় পাথরটা ছেয়ে গেছে।

ওদের উৎসাহের কারণটা বোঝার জন্য কৌতূহলী হয়ে বিশ্বামিত্র পিছনে তাকাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

ধুলোর রাশি উড়ে উড়ে পাথরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

পাথরের অন্তঃস্থলে হৃদস্পন্দন। অবশ্য কালের গতিতে সেটাও প্রস্তরীভূত। যে রক্ত জায়গায় জায়গায় থেমে গিয়েছিল, সেটা আবার প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। প্রস্তরে প্রাণ সঞ্চারিত আর সেটা ক্রমে সজীব রূপ পরিগ্রহ করছে। হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান আবার ফিরে আসছে।

অহল্যা চোখ বন্ধ করে আবার খুলল। চেতনার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল। শাপমোচন হয়ে গেল তার। শাপ মুক্তি ঘটল।

হে দেব! এই কলঙ্কিত দেহ পবিত্র করে দাও!

নবজীবন দানকারী দৈববলী এই পুরুষটি কে? কে এই বালক?

তার পায়ে পড়ে সে প্রণাম করতে লাগল। রাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ঋষির দিকে তাকাল।

বিশ্বামিত্র জানতে পেরেছিলেন যে অজ্ঞানতাবশত মায়াবীরূপে এই অহল্যাই ইন্দ্রকে বিভ্রান্ত করেছিল। পতির প্রতি অপরিসীম প্রেমের জন্য এই মায়াবী বেশ ধারণই তার দেহকে অপবিত্র করেছিল। সে ছিল গৌতমের পত্নী। সব কথাই সে রামকে বলেছিল। রেশমীগুটিতে সূতো বোনায়-রত মৌন কীটের মতোই আত্মচেতনাহীন হয়ে গৌতম সামনের টিলায় ধ্যানমগ্ন। আরে, ও যে, উঠে গেল।

তপস্যায় বিরত, শান দেওয়া তীক্ষ্ণ তরবারির মতো তাঁর দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ফিরছে। যেন কোনও যাদুবলে শরীরে শক্তি সঞ্চারিত। স্বীয় উদ্যমে নারীর মায়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না, তাই যেন সেটা আস্তে আস্তে আসছে।

আবার সেই দুঃখ জাল? শাপমুক্তির পর জীবন কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে

কোনও চিন্তা সে করেনি, কিন্তু এখন সেটা একটা বিরাট প্রাচীরের মতো সব আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে মনে সে ঘাবড়ে গেল।

রামের জ্ঞান-ধর্ম চোখেই দেখল। সেটায় স্বচ্ছতারই প্রকাশ। কিন্তু তাতে অনুভূতির শান দেওয়া নেই। বশিষ্ঠ এমনভাবেই এদের শিক্ষাদান করেছিলেন। জীবনের সব সমস্যায়, এক একটা সূত্রকে পৃথক করে, তার সমাধানের তারা চেষ্টা করত। কিন্তু তারা নীচতাকে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। তাঁর শিক্ষায় ধৈর্যসহকারে বুদ্ধিকে নতুন পথে চালনায়—উৎসাহ তিনিই দিতেন।

একটা জটিল অবস্থার মুখোমুখি করিয়ে আঘাত হানা-ই-তো' জাগতিক অস্তিত্ব! মানসিক বা শারীরিক ক্ষমতায় যা দমন করা সম্ভব হয়নি, তেমন একটা ঘটনার জন্যই তো' এই দণ্ড তাকে দেওয়া হয়েছিল। তাই না? 'মা' সম্বোধন করে রাম তার পায়ে নতজানু হয়ে প্রণাম করল।

ঋষি দুজন (যাঁদের একজন সাহসকেই জ্ঞান বলে মনে করেন, আরেকজন প্রেমই ধর্মের আকর বলে ধরে নিয়েছেন) বালকের মনের চিন্তার এই আভাষ পেয়ে চমৎকৃত হলেন। কত সরল, মধুর অথচ ভীষণ এই সত্য!

অন্তর থেকে কোনও দোষ যে করেনি, তাকে আপন করে নেওয়াই উচিত, বিশ্বামিত্র ধীর স্বরে বললেন।

শীতল বাতাস বইতে শুরু করায় তর্ক-বিচারের কর্কশতার মধ্যে যেন রসাভাস সঞ্চারিত।

গৌতম, তাঁর স্ত্রী আর ধ্বংসাবশেষযুক্ত টিলা আপন আপন স্থান থেকে নড়েনি। প্রথমে যে জায়গায় নির্জীবতা বিরাজ করেছিল, সেখানে চেতনার স্ফূরণ হল।

চাবুকের মারের মতো যে শক্তি জীবনের আচার-আচরণ বদলাতে উদ্যত হয়েছিল, সেটা সেখান থেকে মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যার মধ্যে মিথিলা পৌঁছানো যাবে না? দুটি সংসারী ব্যক্তি হাত নেড়ে বলছিল না সেরকম?

মনোমালিন্যরহিত হয়ে গৌতম আগের মতো কথা বলতে পারল না। সেদিন তাকে বেশ্যা বলে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল সে আগুন তার জিভও পুড়িয়ে দিয়েছে। 'কি বলব? বলব কি?'

'কি চাই?' গৌতম জিজ্ঞাসা করল। ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাই অসার কতগুলো শব্দই কেবল নির্গত হচ্ছে মুখ দিয়ে।

শিশুর মতো অহল্যা বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

গৌতম পাশের ক্ষেত থেকে কিছু ফল ইত্যাদি জোগাড় করে নিয়ে এল। তার মনে স্নেহ আর প্রেমের একটা ভাব জাগল। আগে সেটা শুধু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটে উঠতো।

যদিও পরস্পরের প্রতি প্রেম জাগ্রত হওয়ার পরে বিবাহসূত্রে এঁরা আবদ্ধ হয়েছিল,

তবুও তার মূলে ধোঁকাবাজীর একটা ক্ষীণ চিন্তাও ছিল! বলদের ওপর প্রভুত্ব অর্জনের পরেই না ওকে পেয়েছে।[1] এভাবে গৌতমের চিন্তাধারা বিভিন্ন খাতে বইছে। একটা আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে উঠল।

অহল্যা তার ক্ষুৎ-নিবৃত্তি করে নিল।

প্রেম চিন্তায় উভয়ের মনই পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু চিন্তা দুজনের দুদিকে।

অহল্যার মনে ভাবনা, সে কি গৌতমের যোগ্যা?

গৌতম ভাবল সে কি অহল্যার অনুরূপ?

ওদের দেখে রাস্তার ধারের প্রস্ফুটিত পুষ্পদল হেসে উঠল।

দুই

অহল্যার ইচ্ছানুযায়ী অযোধ্যার কিছুটা বাইরে সরযূ তীরে মনুষ্য-সম্পর্ক-রহিত জায়গায় একটা কুটীরে গৌতম ধর্ম চিন্তায় মগ্ন। এখন গৌতমের পূর্ণ আস্থা ফিরে এসেছে অহল্যার ওপর। তাকে এখন ইন্দ্রের কোলে বসে থাকতে দেখলেও সে কোনও রকম সন্দেহ করবে না। সে তাকে পবিত্র নারী বলে গণ্য করতে লাগল। এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়াল যে তার মনে হল এর সহায়তা ছাড়া তার সব ধর্ম চিন্তাই নষ্ট হয়ে যাবে।

হৃদয়ের অপরিমেয় এক প্রেমে অহল্যা তাকে অভিভূত করে রেখেছিল। স্বামীর কথা মনে হতেই তারও মন তথা শরীরের প্রতি অনুপরমাণু নববিবাহিতার মতো পুলকিত হয়ে উঠত। তবু মনের ভার তার কখনই লাঘব হয়নি। তার এমন ভাবে থাকতে ইচ্ছা হত যাতে কারুর মনে কোনও সন্দেহ না জাগে বা কারুর এদিকে খুঁটিয়ে দেখার কোনও অবকাশ না জোটে। এর ফলে তার স্বাভাবিক ব্যবহারে একটা ব্যবধান থেকে গেল। চারপাশের সবাইকে সে ইন্দ্ররূপে দেখতে লাগল। অহল্যার মনে ভয় বাসা বাঁধল। অতীত প্রসঙ্গে কোনও রকম কথাবার্তা বা হাসি-মস্করা বন্ধ করে দিল। হাজার বার মনে মনে আউড়ে, তার সেটা বলা উচিত হবে কি না, এসব ভাল করে চিন্তা করে সে কথা বলত। গৌতম কিছু বললে, সেটা শুনে তার কোনও গূঢ়ার্থ আছে কি না ভেবে, অনেক সময় মনে মনে সে ব্যথিত হত।

জীবন তার কাছে নরক যন্ত্রণার মতো হয়ে উঠল।

সেদিন মরীচি এসেছিল। আগের দিন ঋষি দধীচি এসেছিলেন। বারাণসী যাওয়ার পথে ঋষি মাতঙ্গ গৌতমের কুশলবার্তা জানতে এসেছিলেন। মনে স্নেহ বা মমতার

---

[1]প্রাচীনকালে তামিলনাড়ুতে কোনও কোনও জাতি উপজাতিভুক্ত পুরুষেরা সাতটি অসাধারণ শক্তিশালী মোষ বলি দিয়ে নিজেদের বীর্যের পরিচয় দিয়ে কোনও কন্যাকে বিবাহ করত।

উদয় হলেও, সঙ্কোচহেতু অহল্যার শরীর সিঁটিয়ে এসেছিল। মনে হল যেন অতিথি সৎকারে ত্রুটি থেকে যাবে। সাধারণভাবেও যে তার মাথা থেকে পায়ের দিকে তাকাত, সেই নির্দোষ দৃষ্টিতেও তার সঙ্কোচ অনুভূত হত। কুটীরের ভেতরে গিয়ে সে লুকিয়ে থাকত।

গৌতমের চিন্তা-ভাবনা নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল, যে বুঝে শুনে এগোয়, ধর্মের বন্ধন তার জন্যই। আত্মজ্ঞান রহিত হয়ে কাজ করতে পারলে, মানবজাতি বিনষ্ট হবার মতো দুষ্ট কাজ করলেও সেটা পাপ কর্ম নয়। পরিপূর্ণভাবে মন ঢেলে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সে কাজ করলে তাতে আমাদের দোষ বর্তায়। ভাঙাচোরা, আবার জায়গায় জায়গায় সংস্কার করা, তার সেই কুটীরে বসে গৌতম নিজের চিন্তাকে নতুন দিকে চালনা করেছিল। তার মনে অহল্যার নিষ্কলঙ্করূপ। তার ধারণা হয়েছিল, এ ব্যাপারে তার নিজের কিছু করার নেই, ক্রোধজাত শাপাগ্নিই অহল্যাকে কলঙ্কিত করেছে।

চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে কখনও কখনও রথে চড়ে রাম আর সীতা সেদিকে আসতেন। শিশুরূপী সেই অবতার গৌতমের মনে আদর্শ যুবক হিসেবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের প্রাণখোলা হাসি আর খেলাচ্ছল, স্ব-আলোকিত দীপের মতোই তাঁদের ধর্মাচরণের ভাষ্যরূপ প্রতিভাত। এই যুব দম্পতীর মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ প্রেম! তাঁদের প্রেম গৌতমকে তার আগের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

সুন্দরী সীতা এসেছিলেন অহল্যার মনের ভার হালকা করার জন্য। অহল্যার মনে হল সীতার কথা, সীতার হাসি সবই যেন তার যত কলঙ্ক মালিন্য সব ধুয়ে মুছে দিচ্ছে। তাঁর আসার পর থেকেই অহল্যার অধরে চাপা হাসি, আঁখিতে উল্লাস।

তিনিই ত' ছিলেন বশিষ্ঠের শিক্ষায় শিক্ষিত ভাবী অধিপতি! সরযূর তীরে, জগৎ-সংসার থেকে দূরে অন্য এক লোকে বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে ত' তিনিই প্রেরণা সঞ্চার করেছেন।

এখন পর্যন্ত বাইরে বেড়ানো বা অন্যত্র যাবার ইচ্ছা অহল্যার হয়নি। সীতার সান্নিধ্য তার মনের বোঝা অনেক হালকা করেছে আর মনে উৎসাহেরও সঞ্চার করেছে।

রাজ্যাভিষেক কালে অহল্যা অযোধ্যা যেতে রাজী হল। কিন্তু প্রাসাদ অভ্যন্তরের চিন্তা চক্রের কত শক্তি! সীতার এক শাশুড়ী দশরথের প্রাণ হরণ করল, বনে পাঠাল রামকে, শোকাভিভূত, অশ্রুবিসর্জনকারী ভরতকে নন্দীগ্রামে থাকতে বাধ্য করল।

এ সবই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। মনে হল মানুষের ক্ষমতার চেয়েও বড় কোনও অদৃশ্য শক্তি উন্মত্ত আবেশে পাশার চাল চেলে, সে খেলায় সব বাজী জিতে নিল।

বশিষ্ঠ মুনি যথেষ্ট সাবধান হলেন। মানব ধর্মের বিজয়-সূচক এক রাজ্য স্থাপনার্থে তিনি অপলক জেগে রইলেন। তবে তাঁর সব হিসাবেই গোলমাল। তাঁর ধর্মরাজ্যের

কল্পনা নন্দীগ্রামে এক উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে জ্বলছে।

এভাবে সরযূ তীরের সেই কুটীর আবার জনবিহীন হয়ে ভেঙে পড়ল। এই ঝড়ে গৌতমের ধর্ম চিন্তা বিনষ্ট। মনের বিশ্বাস লুপ্ত। সে অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে।

অহল্যার কি হল? তার অপরিসীম দুঃখ কথায় বোঝানো চলে না। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে খুব ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাম বনে চলে গেছেন। ভাই তাঁর সঙ্গে গেছেন আর সীতাও। পূর্বে শিলীভূত কালে যেমন মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, এখনও সেরকম। তবে এবারে মনের ভার আর যেন সে বইতে পারছিল না।

ভোরে উঠে নদীতে গিয়ে জপাদি সেরে গৌতম কুটীরে ফিরে এসেছে।

তার পদপ্রক্ষালনের জন্য হাতে জলভর্তি ঘটি নিয়ে দাঁড়ানো অহল্যার ঠোঁট যেন ঈষৎ কুঞ্চিত।

সে বলল, 'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমি মিথিলায় যাব।'

'বেশ, চল যাই। শতানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেও বহুদিন আগে', বলতে বলতে গৌতম বাইরে বেরিয়ে এল।

দুজনে মিথিলার দিকে চলল। দুজনের মনেই দুঃখ। গৌতম একটু দাঁড়িয়ে পড়ল।

অহল্যার হাত ধরল। 'ভয় পেয়ো না', বলে সে চলতে লাগল।

তিন

সকাল হয়েছে। গঙ্গার ধার ধরে দুজনে যাচ্ছে।

নদীর জলে দাঁড়িয়ে উঁচু ও স্পষ্ট কণ্ঠে কেউ গায়ত্রী জপ করছে।

জপ শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় দুজনে নদীর ধার থেকে সরে এসে দাঁড়াল।

'শতানন্দ?' গৌতম চীৎকার করে বলল।

'বাবা?...মা?' বলে মনের আনন্দ প্রকাশ করে শতানন্দ এসে তাঁদের পায়ে পড়ে প্রণাম করল।

অহল্যা মন-প্রাণ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার মনে হল ঋষিদের মতো দাঁড়ি গোঁফ রেখে তাদের ছেলে শতানন্দ কি রকম পর হয়ে গেছে।

পুত্রের তেজস্বিতা গৌতমের মন তৃপ্তিতে ভরে দিল।

শতানন্দ এদের দুজনেক নিজের কুটীরের ভেতর নিয়ে গেল।

তাদের পথশ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদনান্তে সে জনক রাজার ধর্ম আলোচনা মণ্ডপে যাওয়ার জন্য তৈরী হল।

গৌতমও তার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। ছেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী, তবে, তারই রক্তের সন্তান, তাই দীর্ঘ যাত্রাপথের কথা ভেবে সে চিন্তিত। কিন্তু

যুগব্যাপী তপস্যাতেও যে শরীর ক্ষীণ হয়নি, ভেঙে পড়েনি, তার এটুকু পথ পাড়িতে কি হবে? সে-ও তাই পিছু নিল। তার ধর্ম-সম্পর্কিত নবীন তত্ত্ব সম্বন্ধেও জানার আগ্রহ হল ছেলের।

মিথিলার রাস্তা ধরে যেতে যেতে গৌতমের মনে হল যে অযোধ্যায় যে মনোবেদনার সূত্রপাত, এখানেও সেটা ব্যপ্ত। এক দীর্ঘকালের চাপা বিশ্বাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

লোকজনের চলাফেরা, কাজকর্ম নিষ্কামভাবে সবাই করে যাচ্ছে। কারুর সঙ্গে কারুর যোগ নেই আবার একেবারে তন্ময় হওয়া নেই।

প্রভুর স্নানের জল নিয়ে যাচ্ছে হাতী ঘড়া ভর্তি করে, কিন্তু চলায় যেন উৎসাহ নেই। সঙ্গের পূজারীর মুখে চোখেও ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্তির কোনও উৎসাহব্যঞ্জক ছাপ নেই।

উভয়ে রাজার বিচার মণ্ডপে প্রবেশ করল। সৎসঙ্গ মণ্ডপে প্রচুর লোক জড় হয়েছে। এই হাটের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনা কি হবে? সচকিত হয়ে গৌতম ভাবল। এ তার অকারণ চিন্তা।

জনকের দৃষ্টি হঠাৎ এ দুজনের ওপর পড়ল।

ছুটে এসে উনি মুনিকে অর্থ দান করে অভ্যর্থনা করলেন আর তাদের নিয়ে নিজের কাছাকাছি বসালেন।

জনকের মুখে একটা বিষাদের ছায়া। কিন্তু কথাবার্তায় শিথিলতা মোটেই ছিল না। এতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তাঁর মন থেকে ধৈর্য নিঃশেষিত হয়নি।

কি বলবে ভেবে গৌতম সঙ্কোচ বোধ করল।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জনক ধীরস্বরে বললেন, 'বশিষ্ঠ যে রাজ্যের নির্মাতা, সেখানে চিন্তা ভাবনার স্থান নেই।'

জনকের এই বাক্যে ঈর্ষার ভাব।

গৌতম বলল, 'ভাবনার বহতা খাতেই সত্যের উৎপত্তি।'

জনক উত্তর দিলেন, 'নিজে ভাবনার উপযুক্ত না হয়ে উঠতে পারলে, তাতে দুঃখেরই উৎপত্তি ঘটবে। রাজ্য নির্মাণের বেলায়ও চিন্তার প্রয়োজন। নয়ত রাজ্য টিকবে না।'

'আপনার নিজের বেলায়।' সংশয়াকুল হয়ে গৌতম প্রশ্ন করল।

জনক বললেন, 'আমি রাজত্ব করছি না, শাসন বিষয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি মাত্র।

কিছুক্ষণ দুজনেই মৌন।

'আপনার ধর্ম-চিন্তাটা কোন ধরনের?' সবিনয়ে জনক জানতে চাইলেন।

'সেটা এখনও ভাবতে শুরু করিনি। এখন বোঝার চেষ্টা করব। পঞ্চেন্দ্রিয় আপাতত নিজ জালে জড়িয়ে রয়েছে', বলে গৌতম উঠে গেল।

পরের দিন জনকের বিচার মণ্ডপে আর সে যায় নি। হিমালয়ের মতো পর্বত-প্রমাণ সব প্রশ্ন তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে আপাতত একা থাকতে চায়। কিন্তু অহল্যার মনটা যাতে ভেঙে না পড়ে, সে খেয়াল নেই।

জনক পরের দিন উৎকণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুনিবর কোথায়?'

শতানন্দ উত্তর দিল, 'কুটীরের সামনের অশোকগাছের নীচে উনি কালাতিপাত করছেন।'

'ধ্যানে রয়েছেন?'

'না, কিছু চিন্তা করছেন।'

জনক আপন মনে বললেন, 'তরঙ্গ এখনও শান্ত হয়নি।'

অহল্যার স্নানে খুব আগ্রহ। গঙ্গার ধারে শান্তি পাবে এই ভেবে একলা উষাকালে ঘড়া নিয়ে সে চলেছে।

দুয়েক দিন একলা গিয়ে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত। নিজের চিন্তাকে সে লতার মতো বাড়তে দিয়েছে। মনের ভার হালকা, তাই তৃপ্তি। তার সঙ্গে স্নানের মজা। এসবের পর জল ভরে নিয়ে সে ফিরত।

তবে এরকম বেশি দিন চলল না।

স্নানান্তে নীচের দিকে দেখতে দেখতে নিশ্চিন্ত মনে সে ফিরছিল।

সামনে নূপুর নিক্কণ শোনা গেল। ঋষি-পত্নী কেউ হবে। সেও স্নানে আসছিল। ওকে দেখে এমন দূরে সরে গেল, মনে হল কোনও চণ্ডালিনীর সামনে পড়ে গেছে। অত্যন্ত ভয় চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চলে গেল।

দূরে কথা শোনা গেল, 'ওই ত' অহল্যা।' একথা শুনে তার অন্তরের শাপাগ্নি যেন আরও ধিকিধিকি জ্বলে উঠল।

এ সময়টায় তার মনে যেন এক দাবানল প্রজ্জ্বলিত। তার সব চিন্তাধারাই পাল্টে গেল। 'হে ঠাকুর! শাপমোচন ত' হল, কিন্তু পাপের স্খালন কি হবে না?' একথা মনে হতেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সেদিন অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতোই সে গৌতম আর শতানন্দকে খেতে দিল। 'ছেলে আমার পর হয়ে গেছে। আর যারা পর তারা আমার বিপক্ষে। আমার আর এখানে থেকে কি লাভ?' মনে মনে বারবার এই একই কথা অহল্যা আউড়াতে লাগল।

মাঝে মাঝে হুঁশ ফিরে আসতে গৌতম এক এক গ্রাস মুখে দিচ্ছে আর আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ছে।

তার এই আত্মমগ্নতাজনিত বেদনা শতানন্দকেও রুদ্ধশ্বাস করে দিচ্ছে।

তার এই বেদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে শতানন্দ বলল, 'অত্রি মুনি জনকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অগস্ত্যের সঙ্গে উনি চলছেন। মেরু পর্বতের দিকে যাচ্ছেন এঁরা। রাম আর সীতা অগস্ত্য ঋষিকে দর্শন করেছেন। ওঁদের দুজনকে অগস্ত্য বলেছেন,

'পঞ্চবটী অতি মনোরম স্থান। সেখানেই তোমরা থেকো।' মনে হচ্ছে তাঁরা ওখানেই এখন।'

অহল্যা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরাও যাব তীর্থ যাত্রায়?'

'চল', বলে হাত ঝেড়ে গৌতম উঠে দাঁড়াল।

শতানন্দ প্রশ্ন করল, 'এখনই?'

'এখন গেলেই বা ক্ষতি কি? বলতে বলতে কোণায় রাখা নিজের যষ্টি আর কমণ্ডুল উঠিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল গৌতম।

অহল্যাও তাঁর পেছনে পেছনে চলল।

শতানন্দ মনে খুবই দুঃখ অনুভব করল।

চার

সন্ধ্যা হয়েছে। ঝাপসা হয়ে এসেছে এদের চেহারা। সরযূ নদীর তীর ধরে দুজনে চলেছে অযোধ্যার দিকে।

কালের অথৈ প্রবাহে চৌদ্দটি বছর বিলীন। এমন কোনও মুনিবর বা এমন কোনও তীর্থ নেই যা তারা দেখেনি। তবুও এদের শান্তি মেলেনি।

শংকরাচার্যের বিরাট মন্দিরতুল্য সব সিদ্ধান্ত যেমন শক্তিহীন বুদ্ধাবলম্বীর কাছে অগোচর, তেমনি শারীরিক ক্ষমতাহীন ব্যক্তির কাছে হিমালয়ও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার দর্শন এরা হিমাচ্ছাদিত গিরি শিখরে দাঁড়িয়ে করেছে।

আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত দুঃখের মরুভূমিও এরা অতিক্রম করেছে।

অর্ন্তজ্বালার মতোই, ভিতর থেকে ছাই ধূলো মাটি উদ্‌গিরণকারী জ্বালামুখীও তারা পার হয়ে এল।

মনের মতোই সতত তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রও তাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে সরে গেল।

জীবনের মতোই জটিল উচ্চাবক বহু পথ পাড়ি দিয়ে তারা এগুতে লাগল।

'আর কিছু সময়ের ব্যবধানেই রাম ফিরবেন। তখনই আমাদের জীবনে প্রভাত দেখা দেবে'—এ আশাই নিরন্তর তাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছিল।

চৌদ্দ বছর আগেকার তৈরী, বর্তমানে জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত তাদের কুটীরের সামনে এসে আবার তারা দাঁড়াল।

রাতারাতি মেরামত করে গৌতম সেটা আবার বাসযোগ্য করে নিল। কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোরের সূর্যের হাসির ছটা দেখা গেল।

দুজনে সরযূতে স্নান সেরে ফিরে এল।

অহল্যা পতি সেবায় রত। দুজনেরই মন রাম সীতার প্রত্যাবর্তন দিবসের অপেক্ষায়

উন্মুখ। তবে মন ভিন্ন আর কিসের সাহায্যে সময়ের দুস্তর পথ পাড়ি সম্ভব?

একদিন তাড়াহুড়ো করে অহল্যা স্নানে গিয়েছিল।

তার আগে স্নান সেরে জনৈকা বিধবা ফিরে আসছিল। অহল্যা তাকে চিনতে পারেনি। সামনে আসতে সেই মহিলা তাকে চিনতে পারল। সে দৌড়ে এসে অহল্যার পায়ে পড়ে তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল।

আরে, এই ত দেবী কৈকেয়ী! আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে একা, সন্ন্যাসিনী।

ঘড়া নামিয়ে রেখে অহল্যা দুহাতে ধরে কৈকেয়ীকে ওঠাল। কৈকেয়ীর ধরণ-ধারণ সে বুঝে উঠতে পারল না।

কৈকেয়ী বলল, 'ধর্মাবিষ্ট হয়ে ভরত তার মন থেকে আমায় সরিয়ে দিয়েছে।'

কথায় তার ক্রোধ নেই, অহংকারও নয়। যে কৈকেয়ীর কথা ভেবেছি আর যাকে দেখছি এ-দুজন আলাদা। অহল্যা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে কৈকেয়ীর মনোভাব বুঝে নিতে চাইল।

একে অন্যের হাত ধরে দুজনে সরযূ নদীর দিকে চলল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করল, 'ভরতের এই বৈরাগ্যভাবের কারণ কি?' সহানুভূতিজাত মৃদু রেখা তার মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

কৈকেয়ী জিজ্ঞাসা করল, 'ছোট বাচ্চা আগুন লাগানোর ফলে যদি শহর জ্বলে যায় তবে কি সে বাচ্চাকে পিটব?'

অহল্যা ভাবল বাচ্চা আর আগুনের মাঝে বেড়া থাকা প্রয়োজন। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল, 'যা জ্বলে গেছে, সেটা শেষ হয়ে গেছে বৈকি!'

'জ্বলে যাওয়া জায়গাটা পরিষ্কার না করলে অঙ্গার আর আবর্জনায় চারিদিক স্তূপাকার হয়ে থাকবে। সেটা কি ঠিক?' কৈকেয়ী প্রশ্ন করল।

অহল্যা বলল, 'অঙ্গার-স্তূপ পরিষ্কারের লোক দুয়েকদিনেই এসে যাবে।'

কৈকেয়ী 'হ্যাঁ' বলে কথাটা স্বীকার করল। কথার ভাবে পরম সন্তোষ ব্যক্ত। ভরত নয়, রামের প্রতীক্ষা করছিল কৈকেয়ী।

পরের দিন যখন তার অহল্যার সঙ্গে দেখা হল, তখন তার মুখ চোখ নিষ্প্রভ আর মন নিস্তেজ প্রতীয়মান।

কৈকেয়ী বলল, 'চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে দেখলাম। রামের কোনও খবর নেই। এখন থেকে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কি করে সে এসে পৌঁছুবে? ভরত প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে। সে এক অগ্নিকুণ্ড তৈরীর ব্যবস্থা করছে।'

তার কথা থেকে মনে হল যে রাজ্য-মোহজনিত যে দোষ ভরতের মধ্যে বর্তেছে—অগ্নি প্রবেশই সে দোষ-স্খালনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে কৈকেয়ী মেনে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে কৈকেয়ী বলল, 'আমিও আগুনে ঝাঁপ দেব—তবে একেবারে নিজের ভাবে আর চুপি চুপি।' এতে তার মনের বিরক্তি প্রকাশ পেল।

চৌদ্দ বছর বাদে আবার সেই পুরানো ভাবনা ফিরে এল। অযোধ্যার প্রতি সেই শাপ কি দূর হল না।

অহল্যার দিশাহারা মন ঘাবড়ে গেল। তার মনে সন্দেহ জাগল যে এসব তারই পাপের ফল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করল, 'বশিষ্ঠ মুনিকে বলেকয়ে এটা বন্ধ করতে পারা যায় না?'

কৈকেয়ী বলল, 'ধর্মের অধীনতা ভরত মানতে রাজী তবে বশিষ্টের অধীনতা সে মানবে না।'

অহল্যা সক্রোধে বলল, 'যে ধর্ম মনুষ্য পরবশ নয়, সেটা মানব জাতিরই শত্রু।'

তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে সম্ভবত তার স্বামীর কথা সে মেনে নেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা অযোধ্যায় আবার না একটা দুঃখ প্রবাহ বয়ে যায়!

গৌতম চেষ্টা করতে স্বীকৃত হল, কিন্তু কিছুই লাভ হল না তার কথায়।

অগ্নিদেব ভরতের বলি গ্রহণে রাজী ছিলেন না। হনুমান আসায় আগুন নিভে গেল। চারিদিকে শোকের পরিবর্তে অপার আনন্দ। ধর্ম-চক্র ঘুরতে লাগল।

'চৌদ্দ বছর বাদে এবার আমার স্বপ্ন সার্থক হবে'—এ ভেবে বশিষ্টের আনন্দ হল। তাঁর মুখের ভাবে হাসির ঝিলিক।

'এই আনন্দময় পরিবেশে আমার কি করার আছে', ভেবে গৌতম ফিরে গেল।

সীতা আর রাম তাকে দেখতে আসবে একথা চিন্তা করে অহল্যার খুব আনন্দ। স্বাগত জ্ঞাপন শেষ হওয়ার পর তাঁরা পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাদা এদিকে আসছেন।

রথ থেকে নামার সময়ে রামের কপালে ভাবনার বলীরেখা ফুটে উঠছে। ভিন্ন এক অনুভূতিতে সীতার সৌন্দর্য দ্বিগুণ হল। দুজনের হাসি যেন একটা স্বপ্নময় অবস্থার সৃষ্টি করছিল।

রামকে নিয়ে গৌতম বাইরে যেতে উদ্যত হল।

আপন গর্ভজাত সন্তানের মতোই বিশেষ স্নেহ সহকারে অহল্যা সীতাকে ভেতরে নিয়ে গেল। দুজনে হাসতে হাসতে কথা বলছিল।

রাবণ কর্তৃক অপহরণ, বিষাদ, তার থেকে মুক্তি ইত্যাদি তাবৎ বৃত্তান্ত খুব অবিচলিতভাবে সীতা শোনাচ্ছিলেন। রামের সঙ্গে মিলনের পর তার আর দুঃখ কি?

সীতা অগ্নি পরীক্ষার উল্লেখ করলেন। সে কথা শুনে অহল্যার বুক কেঁপে উঠল।

'উনিই বলেছেন এরকম করার জন্য? তুমি কি স্থির করলে?' অহল্যা জিজ্ঞাসা করল।

'উনি বললেন। আমিও করলাম!' সীতা শান্তভাবে জবাব দিলেন।

'উনি বলেছেন!' চীৎকার করে উঠল অহল্যা। তার সারা শরীর মন জুড়ে সতি কন্নকি[1] যেন আবেশ বিভোর হয়ে নেচে উঠল।

[1]তামিল মহাকাব্য শিলপ্পদিকারমের নায়িকা

অহল্যার জন্য এক নীতি আর তার জন্য আরেকটা?

এটাই কি ধোঁকাবাজী? গৌতমের শাপ কি তার জন্মের সঙ্গেই শুরু হয়েছে?

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ।

'সারা জগতের কাছে কি প্রমাণ করার ব্যাপার নয় এটা?' বলে সীতা ধীরে ধীরে হাসলেন।

অহল্যা বলল, 'অন্তর থেকে সেটা জানা হলেই কি যথেষ্ট নয়? সত্যকে কি দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করা যায়।' তার কথায় কঠোর ভাব।

'আর প্রমাণ কিছু করলেই কি তা সত্য হয়ে গেল? যদি অন্তরই সেটা স্পর্শ না করে, তবে? আচ্ছা থাক। সংসারই বা কি?' অহল্যা জিজ্ঞাসা করল।

বাইরে শব্দ শোনা গেল। ওঁরা ফিরে এসেছেন।

রাজমহল যাওয়ার জন্য সীতা বেরিয়ে এলেন। অহল্যা আসল না।

সে রামকে দুঃখ দিয়েছে। পায়ের ওপরকার ধূলোও তাকে দুঃখ দিয়েছে।

রথ চলতে লাগল। চাকার আওয়াজও ক্রমে মিলিয়ে গেল।

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গৌতম আবার চিন্তায় ডুবে গেল। লক্ষ্যহীন, ভাসমান ত্রিশঙ্কু-মণ্ডলী তার নজরে এল।

একটা নতুন ভাবনা মনের গুহায় বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। মনের ভার হালকা করার জন্য, সেই স্নেহ-বাৎসল্য ফিরিয়ে আনার জন্য কি একটি শিশুকে লালন-পালন করবে? তার কোমল আঙুলের স্পর্শ কি মনের ভার হালকা করে দেবে না?

সে ভিতরে গেল।

অহল্যা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। যে ইন্দ্র নাটক তার বিশেষভাবে বিস্মৃত হওয়া উচিত সেটা আবার তার মানসপটে ভেসে উঠেছে।

গৌতম তার গায়ে হাত রাখল।

সে যে গৌতমের মধ্যেই ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করল। তার হৃদয় পাথর হয়ে গেল। আঃ কি শান্তি!

গৌতমের হাতে ধরা এক পাষাণ প্রতিমা। আবার অহল্যা পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

তার মনের বেদনাও মুছে গেছে।

নির্জন, কুয়াশামোড়া রাস্তা ধরে একাকী এক মানবমূর্তি কৈলাস পর্বতের দিকে চলেছে। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে সংসার বিরাগী।

সে-ই গৌতম।

সে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে।

□

কৃ. পা. রাজাগোপালন

জন্ম ১৯০৯ সালে। রাজাগোপালন তামিলের সঙ্গে সঙ্গে তেলুগু, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা ইত্যাদি ভাষাও জানতেন। স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হন। চিন্তাশীল আলোচনা ও ঘটনাবহুল অনেক গল্প রচনা করে পাঠক ও লেখক মহলে সমাদর লাভ করনে। ইনি গল্পে এক নতুন শৈলীর প্রবর্তক।

ক্ষণিক উল্লাস

হে ভগবান! আমার এক এক সময় মনে হচ্ছে ওর সব যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। আবার একথা ভেবেও আমার হৃদয় কেঁপে উঠছে—হায়, জেনেশুনে মৃত্যুর কোলে ওকে ছেড়ে এসেছি।

এর জন্য আমি কি করতে পারি? কিছু করার সুযোগই ত' সে আমায় দিল না।

সেই বাড়ী থেকে চলে আসার পর ত' ক'বারই গেছি সেদিকে, কিন্তু তাকে দেখতে পাইনি।

গতকাল সেখানে গিয়েছিলাম। জানলাম যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে মারা গেছে।

স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদযন্ত্রের গতি!

কে জানে কি রহস্যময় কথায় পূর্ণ হয়েছিল তার মন? সবগুলো মিলে গতিরুদ্ধ করে দিল হৃদযন্ত্রকে।

আমার মনে হচ্ছে সেই রাত্রে কিছু কথা আমায় বলেছিল।

শেষে বলেছিল, 'ব্যাস, এই অনেকখানি! এর চেয়ে বেশি আর খুলে বলতে পারছি না।'

যতটুকু বলেছিল তাতেই আমার মন বেদনায় বিধুর হয়ে উঠেছিল। সে-বেদনার কখনও উপশম হবে না।

হ্যাঁ, এসব ভেবেই সে চুপ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর কি হল? আমার চলার পথে যে প্রতিবন্ধক সে সৃষ্টি করেছিল, এর ফলে সেটা অপসারিত হল।

গত বছর মাদ্রাজে এক বাড়ীর বাইরের ঘরে আমি থাকতাম। একটি পরিবারও সে বাড়ীতে থাকত। ওদের কথা অনুযায়ী ওর ছিল স্বামী-স্ত্রী। স্বামীটি কোনও এক ব্যাঙ্কে কাজ করত। সারাদিন বাড়ীর বাইরে থাকত। রাতেও নামেমাত্রই বাড়ীতে থাকত। খাওয়াদাওয়ার পরে বেরিয়ে যেত আর রাত দুটোয় এসে দরজা খটখট করত।

একলা সে বাড়ীতে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর মনে হত। আমি একজন লেখক।

ঘরের ভেতরেই সারাদিন থাকতাম। সকালে বিকালে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতাম।

আমার কিছু বলার আগেই সে লোকটি একদিন বলল, 'আপনি এখানে একা আছেন ভেবে বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। আমি সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ লোক নই। আপনি ত সব সময় নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। মানুষের স্বভাব-চরিত্র বুঝতে কতক্ষণ লাগে? আপনার মতো একজন লোক বাড়ীতে থাকায় আমার বেরুতে সুবিধা হয়।'

'আপনি যেমন', একথা উল্লেখ করে সে কি বলতে চাইল বা কি গুণ দেখল আমার মধ্যে কে জানে।

সেই মেয়েটি—সাবিত্রী—আমার দৃষ্টির সামনে বড় একটা আসত না। অতিরিক্ত সাহস নিয়ে মাথা তুলে কোনও মহিলার প্রতি তাকিয়ে থাকাটা আমারও অভ্যাসের বাইরে। ফলে কিছুকাল একত্রে থেকেও, কেবলমাত্র আওয়াজ দিয়েই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

ছেলেটির নাম ছিল গোপাল আয়ার। ওর অফিস যাবার আগেই আমি উঠোনের কলে গিয়ে আমার কাজ সেরে নিতাম। এরপর আর ওমুখো যেতাম না। সে বেরিয়ে গেলে বাইরের কামরার সঙ্গের দরজাটা নিজেদের দিক থেকে বন্ধ করে মেয়েটি ছিটকিনি লাগিয়ে দিত। সাবিত্রী কারুর সঙ্গেই অকারণ কথাবার্তাই বলত না। বাড়ীর বাইরেও সে যেত না।

এভাবে এক সপ্তাহ চলে গেল। আধেক ঘুমের ঘোরে লোকটার রাত দুটোয় এসে দরজা খটখট করা, সাবিত্রীর উঠে দরজা খোলা, আবার ছিটকিনি লাগিয়ে ওর সঙ্গে ভিতরে আসা ইত্যাদি সবই টের পেতাম। একদিন এসে সে দরজা খটখট করতে শুরু করল ঘুমটা তখনও গাঢ় হয়নি। চার-পাঁচবার খটখট করল দরজা। আমিই উঠে গিয়ে খুলে দিলাম।

'আরে, আপনাকে উঠে এসে দরজা খুলতে হল! মাপ করবেন' বলে সে ভেতরে চলে গেল। আমি আমার ঘরের খিল এঁটে আবার শুয়ে পড়লাম।

ভেতরে গিয়ে তার স্ত্রীকে সে কে জানে কি বলল। পরে মনে হল লাথি মেরেছিল আর মেয়েটি উঠে বসল। আমি মেয়েটিকে নীচু গলায় বলতে শুনলাম, 'কি অনেকক্ষণ ধরে এসে তুমি দরজা ধাক্কা দিচ্ছিলে? সারা দুপুর মাথার যন্ত্রণা ছিল। কিভাবে হঠাৎ গাঢ় ঘুম...'

'হ্যাঁ, আমি সেটা কেমন করে জানব? এখন তো বলছ সব' বলে সে মেয়েটিকে আবার মারল। মারার আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। কি করব আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় তৃতীয় ব্যক্তির থাকা অনুচিত মনে করলাম।

সারারাত আর কথাবার্তা হয়নি। তবে বুঝলাম যে অনেক রাত অবধি ওরা ঘুমোয় নি। আমিও শুতে পারি নি।

পরের দিন রাতে মেয়েটি জেগে রইল আর নিজেই দরজা খুলে দিল। কিন্তু

সেদিনও সে মার খেল। তবে প্রথম দিনের মতো সে চুপ করে রইল না।

'আমায় এভাবে মারছ কেন? তোমার কোনও কাজে আমি মানা করি?'

'আচ্ছা, তবে কথা ফুটেছে?'

'আর কত দিন আমি...'

'চুপ কর। আবার মুখ খুলবি তো দাঁত তুলে নেব।'

'ঠিক আছে, তুলে নাও।'

গালে একটা চাপড় মারার শব্দ শোনা গেল। অজ্ঞাতেই আমি উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর দিককার দরজার পাশ থেকে বললাম, 'মশায়, দরজাটা খুলুন।'

হেসে হেসে আমার সঙ্গে কথা বলত যে লোক, সে তখন ভিতর থেকে জানোয়ারের মতো গর্জে উঠল, 'কিসের জন্য?'

'খুলুন, বলছি।'

'না মশায়, সেটা সম্ভব নয়।'

'দরজা না খুললে ভেঙে দেব।'

সে দরজা খুলল আর আমার ঘরে এসে সেটা ভেজিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার মশায়?'

'আমার মনে হল আপনার স্ত্রীকে ধরে আপনি পিটছেন।'

'তা হতে পারে, তবে আপনার তাতে কি?'

'আমি সেটা হতে দেব না।'

'কেন, কি করবেন?'

'আমি পুলিশে খবর দেব। তার আগে জোর করে এ থেকে আপনাকে নিবৃত্ত করব।'

তার মুখে একটা বিষাদ আর ভয়ের ছায়া নেমে এল। আমার দিকে সে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আমার মনে হল জোর দিয়ে বলা কথাগুলো শুনে সে ঘাবড়ে গেছে। আমি বুঝলাম যে লোকটা ভীতু। তা না হলে বউকে ধরে অমন পেটায় কেন?

'বড় সোজা লোক আপনি, কোনও ব্যাপারে নাক গলাবেন না—এ ভেবেই আপনাকে আমি আমার বাইরের ঘরে থাকতে দিয়েছি। যদি আপনি অকারণ আমার ব্যাপারে নাক গলান, তবে আপনাকে কাল সকালেই এ ঘর খালি করে দিতে হবে।'

'ঘর খালি করার কথাটা পরে ভাবা যাবে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আপনি ভেতরে যাবেন না।'

'আমায় অর্ডার দেবার তুমি কে হে?'

'আমি যে-ই হই না কেন, তাতে কি? এখন আমার কথামতোই আপনাকে সব করতে হবে। কথা না শুনলে ভালো হবে না।'

'আমায় ভয় দেখাচ্ছেন নাকি?'

'কেবল ভয় দেখানোই নয়, যা করার কার্যত করেই দেখাব আমার ঘরে আসুন। সেখানে শোব দুজনে। ভেতরের দিকে লক্ষ্য করে আমি বললাম, 'মা, ভেতর থেকে দরজার খিল এঁটে দিন।'

'সেটা সে করবে?'

'আমি এখানে থাকতে ওই মহিলার ওপর আঙুলও ছোঁয়াতে পারবেন না।'

সে সময় দরজাটা খুলে সাবিত্রী এদিকে এল। এ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলে নি।

আমায় সে বলল, 'দয়া করে আমাদের ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না' আর স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'এসো, ভেতরে চলো।'

সে চীৎকার করে উঠল, 'তুমি যাও। তোমায় এখানে কে ডেকেছে?'

আমি মেয়েটিকে বললাম, 'মা, বিষয়টা এখন আর আপনার বা আমার এক্তিয়ারে নেই। আমি এ ব্যাপারে না এসে থাকতে পারি না। পুলিশে খবর দিলে অনর্থক আপনাদের হয়রানি হবে। এসব ভেবে আমি জড়িয়ে পড়েছি এতে।'

মেয়েটি বলল, 'আমার কথা সব শোনা আর আমার ব্যাপারে আপনার জড়িয়ে পড়া, আমার পক্ষে খুব বিপজ্জনক।'

আমি বললাম, 'বেশ তবে দরজাটা খোলা থাকতে দিন। আপনি ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি বাইরের দরজা বন্ধ করে আসি। আমরা দুজনে এখানে শুয়ে থাকব।'

'আমি শুতে পারব না। আমায় বাইরে যেতে হবে। একটু কাজ রয়েছে' বলে লোকটি বেরোতে উদ্যোগী হল।

কি বিচিত্র লোক! এর ধরনটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

সাবিত্রী ভেতরের দিকে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। লোকটি বেরিয়ে গেল। আমি বাইরের দরজা বন্ধ করে আমার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম আসছিল না। আমার চোখের সামনে কেবল সাবিত্রীর চেহারাটা ভাসছিল। যৌবনদীপ্ত এই সুন্দরী মেয়েটির হৃদয়ের গভীরে কোথাও একটা গোপন বেদনা ছিল। বর্ষার ভরা নদীর মতো সেটা ছড়িয়ে ছিল তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। বয়স তার আনুমানিক আঠারো। গায়ের গৌর বর্ণটা খুবই নয়নাভিরাম। তার ঠোঁটে কচি আম পাতার একটা রক্তিম পেলবতা। বিজলীর আলোর নীচে সেই প্রথম আমি তাকে দেখলাম। সবুজ রং যে ধরনের একটা ঠাণ্ডা আমেজ এনে দেয়, ওর শরীর থেকে যেন সেরকমেরই একটা শীতলতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

'এহেন যুবতীকে এই লোকটা এভাবে...'

খিল খোলার আওয়াজ শোনা গেল।

আমি উঠে তাড়াতাড়ি বিছানায় বসলাম। আমার মনে হল যে সে আমার দরজার

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি উঠে বাতিটা জ্বালালাম।

সে বলল, 'বাতিটা জ্বালাবেন না। নিভিয়ে দিন ওটা।'

তাড়াতাড়ি বাতি বন্ধ করে এসে বিছানায় বসলাম। সে এসে আমার পায়ের কাছে বসল। 'স্বামী এক ধরনের আর স্ত্রী আরেক ধরনের,' এ কথা ভেবে আমি চমকে উঠলাম।

'এই অন্ধকারে আমি আপনার কাছে এভাবে একলা এসে সাহস করে কথা বলছি এটা মনে করে আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। কি জানি কেন, মনে হল আপনি আমায় ঘৃণা করবেন না। তাই আমি এলাম।'

'মা...।'

'আমার নাম সাবিত্রী।'

'এই লোকটার সঙ্গে কেন রয়েছেন আপনি? মায়ের কাছে কেন চলে যাচ্ছেন না? কি গোলমাল হবে এ-লোকটার সঙ্গে না থাকলে?'

'সমাজ মা-বাবার সঙ্গে থাকার এটা সীমা বেঁধে দিয়েছে। এখন মা-বাবার কাছে কেমন করে থাকা যায়? মা-বাবা-স্বামী সবই মিথ্যা। মানুষও কাক এবং অন্যান্য পাখির মতো। ডানা গজিয়ে যাওয়ার পর পাখি কি বাচ্চাকে বাসায় আর ঢুকতে দেয়?'

'স্বামী...'

'আপনি ভাবছেন যে এ-ধরনের কথাবার্তা এ কেন বলছে? ভাবতে থাকুন। যা-ই ভাবুন আপনি, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। স্বামী! স্বামীর কাছে যাওয়ার কিছুকাল পরে পর্যন্ত স্ত্রীর নতুনত্ব থাকে। স্বামীর উপভোগের পর বিশেষত্বহীন মনে হয়। যেন নতুন পানীয় পান করা হয়ে গেছে। খালি পাত্রটাই পড়ে রয়েছে।'

'আপনি এমন কেন...'

'আপনি আমায় 'আপনি' বলে কেন সম্বোধন করছেন? আপনি বয়সে বড়। হৃদয় আমার ক্ষত-বিক্ষত। অন্তরের একটা অত্যন্ত খাঁটি-সত্য আপনার সামনে খুলে ধরছি। আপনি কি বিবাহিত?'

'না।'

'বিয়ের পর কয়েক মাস স্ত্রীর সঙ্গে কাটালে তবে আমার কথা বুঝতে পারতেন।'

খুব চাপা স্বরে সে কথা বলছিল যাতে সেটা বাইরে শোনা না যায়, তবুও ওর কথায় একটা অসহনীয় মর্মবেদনা ফুটে উঠেছিল!

'মা,...সাবিত্রী, বোধহয় তোমার স্বামী আসছেন। তিনি আবার ভুল বোঝেন...।'

'আমার কি আর করবে? প্রাণে আমায় মারবে, তার বেশি আর কি করতে পারে?'

'তোমার কি এ কথা বলা উচিত? এখনও হয়তো তোমার স্বামীর হারানো মন ফিরতে পারে। ভেবে দেখো...'

'ওকে বোঝাব? ভাঙা মন জুড়ে যাবে? এই তিন বছরে সে রকম দেখলাম কই?'

'তাহলে কি করবে তুমি?'

'কি করব? আমি আত্মহত্যা করব স্থির করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মিথ্যা কথা আমি বলতে পারি না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ রয়েছে ততক্ষণ মার খেয়েই যাব।'

'হায় রে! এভাবে...'

'এ থেকে বাঁচার উপায় কিছু আছে কি?'

আমি তার এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি।

'কেন? আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন?' বলে সে হাসতে লাগল।

আমি চট করে বললাম, 'কি আর বলব...তবে একটা প্রশ্ন করব তোমায়?'

'আমি জানি কি প্রশ্ন আপনি করবেন। আপনার সঙ্গে আমায় পালিয়ে যেতে বলবেন আপনি। আপনিও কয়েক মাস বাদে এভাবে...'

'বলছ কি সাবিত্রী?'

'হয়তো আপনি আমায় মারধোর করবেন না। পশু-প্রবৃত্তি জাগলে সম্ভবত আমায় আদর করবেন। কিন্তু তার পরে মুখ ঘুরিয়ে বসে পড়বেন। নতুন রূপের খোঁজ শুরু করবেন।'

'তুমি খুব জোরের সঙ্গেই এসব কথা বলছ। আমি কি কিছু বলতে পারি?'

'অতি অবশ্য।'

'আমায় টেনে ধরে রাখার শক্তিটা তো তোমার নিজের কাছেই রয়েছে। তাই না?'

'এসবই শুধু কথার বুনুনি। সে কথা এর সঙ্গে মেলাবেন না। আমি নির্লজ্জের মতো আপনাকে একটা সত্যি কথা জিজ্ঞাসা করছি। আর আপনি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন। চিরন্তন সৌন্দর্য বলে এমন কিছু নেই যা মানুষকে সব সময়ের জন্য আনন্দ দিতে পারে।'

'তুমি এ-ধরনের সাধারণ সিদ্ধান্তে কিভাবে পৌঁছচ্ছো?'

'কি ভাবে? আমার স্বামী যেমন হাসতে হাসতে কথা বললেও তেমনি এমন কিছু দুষ্কর্ম নেই যা ও করতে পারে না। আমি কুশ্রী নই, বুড়ীও হয়ে পড়ি নি আর রোগগ্রস্তও নই। আরেকটা কথা। এমনও নয় যে তার পশু-প্রবৃত্তি উপশম করতে পারি না। এর বেশি আর কি চাই?'

'সাবিত্রী! তোমার হৃদয় ব্যথায় ভরে আছে। সে কারণে এভাবে কথা বলছ তুমি। কখনও কি তোমার অনুভূতি হয়েছে?'

'সুখ কি? অলংকার ব্যবহারে? এমন কোনও অলংকার নেই—যা আমি পরি নি। আমার বাবা নাগপট্টমের নামকরা উকিল। খুব পয়সাওয়ালা লোক। এমন কোনও

ধরনের শাড়ী আর ব্লাউজ নেই যা আমি ব্যবহার করি নি। খাওয়া-দাওয়া? তাতে আমার রুচি নেই। আর কি বাকী রইল। শারীরিক সুখ—সেটা আজ পর্যন্ত আমার কখনই মেলে নি।'

'এ কথার অর্থ?'

'আমার স্বামী আমায় উপভোগ করে আমার ধর্মনাশ করেছে। সুখ কখনই আমি পেলাম না।'

'তুমি সুখ বলো কাকে?'

'আমার মনের খবর আর কতটা খুলে বলব? তারও তো একটা সীমা রয়েছে। আপনি তো আমায় সেটা ছাড়িয়ে যেতে বলছেন।'

'তোমার স্বামী তোমায় কেন...?

'কারণ, আমার দেহের আকর্ষণ ফুরিয়ে গেছে আমার স্বামীর কাছে। টাকা দিয়ে সে অন্য মেয়ে কিনে নিয়েছে।'

'সাবিত্রী, সাহস করে একটা কাজ করতে পারবে তুমি?'

'আমি সব কিছু করতে রাজী আছি, কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। কিছুক্ষণ আপনাকে আমি আনন্দ দিতে পারি এই পর্যন্ত।'

'আমি তোমায় তুষ্ট করার চেষ্টা করব।'

'অনর্থক আপনি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আমার রূপ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য—আপনি বলছেন যে আমায় তৃপ্ত করবেন আপনি।'

'যা-ই বলি না কেন, তবুও...'

'কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। এখন বাতিটা জ্বালিয়ে দিন।'

আমি উঠে বাতিটা জ্বালিয়ে দিলাম।

'আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি?'

—'কেন? ঘুম পাচ্ছে?'

'ঘুম? এসময় ঘুম আসে না।'

'তবে বসো না, আরও কিছুক্ষণ।'

'আপনার ঘুমটা নষ্ট করার জন্য?'

'সাবিত্রী!...'

'আপনি কোনও কথা বলবেন না।'

'আমার মনে হচ্ছে—যা যা তুমি বলেছিলে সেসবই ঠিক।'

'সত্যি?' বলে সে আমার পাশে এসে বসল।

'মিথ্যা বললে তুমি চট করে আমায়...'

'হে ভগবান! এই অর্ধমৃত প্রাণীটি একটুখানি যেন শান্তি পেয়েছে।'

'সাবিত্রী! তোমার জন্য আমার চিন্তাধারা পুরো বদলে গেছে।'

'সে কথা এখন থাক। এ ব্যাপারেটা আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাকুক। সেরকম হলে আমার মৃত্যুর পর অন্য কাউকে বলবেন।'

'এমনভাবে কেন বলছ?'

'এখন এ-শরীর আর অন্য দুঃখ সইতে নারাজ। হ্যাঁ, কেমন যেন একধরনের শান্তি এখন পাচ্ছি।'

'কেমন? আমি বলছিলাম না?' বলতে বলতে কেমন একটা বেহুঁশ মতন অবস্থায় পতনোন্মুখ ওই মেয়েটির পাশে পৌঁছুলাম আর কেমন অজ্ঞাতসারেই তার কাঁধে আমার কাঁধটা লাগালাম।

আমায় সে কিছু বলল না বা বলার চেষ্টাও করল না। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সেই অবস্থায় পড়ে রইল।

যদিও কয়েক মাস বাদে খুব শান্তভাবে ঘটনাটার বর্ণনা দিচ্ছি, তবুও সাজিয়ে গুছিয়ে রং চং চড়িয়ে কিছু বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। একটি মেয়ে তার মন খুলে যা বলেছিল, তাই লিখছি। সেই বর্ণনায় একটি মিথ্যা কথাও আমি লিখতে পারি নি।

আস্তে আস্তে ওকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম...হ্যাঁ, আমার বিছানাতেই! তবুও সে কিছু বলল না। খোলা ঠোঁটে কোনও ওঠা-নামা ছিল না। ঠোঁট নিশ্চল হওয়ার কারণেই এতসব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ চোখ-বোঁজা অবস্থাতেই খুব ক্ষীণ-স্বরে সে বলে উঠল, 'হায়, মা, এবার ছেড়ে দাও।'

'কি হল সাবিত্রী?' জিজ্ঞাসা করতে করতে ঝুঁকে নিজের মুখ ওর মুখে লাগিয়ে দিলাম।

'ব্যস।'

'সাবিত্রী, বাতি...'

হঠাৎ সে উঠে বসল।

'হ্যাঁ, বাতি বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। অল্প কিছু যা প্রকাশ পেল, তাই অনেকখানি' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল।

'সাবিত্রী! তোমার সব কথা বুঝতে পারছি না।'

'এর চেয়ে বেশি কিছু খুলে বলতে আমি পারব না। আমি যাচ্ছি। থাকার জন্য কাল আরেকটা ঘর দেখে নিন।'

'কেন, দূরে কেন? আমি কোনও অপরাধ করেছি?'

'আপনি কোনও দোষ করেন নি। তবে এই বাড়িতে আমাদের দুজনের থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সেটা বিপজ্জনক ব্যাপার হবে' বলে সাবিত্রী আমার দিকে তাকাল আর বাতি নিভিয়ে সোজা ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার অন্তরে স্বল্পক্ষণের জন্য যে দীপ জ্বলে উঠেছিল সেটা সহসা নিভে গেল।

'ব্যস, এই অনেকখানি।'

সে একথা কেন বলেছিল?

তার নিজের জীবন, তার অপার বেদনা সম্পর্কে আমার সান্ত্বনা-সূচক কথার জন্যই; নাকি সেটা কেবল ক্ষণিকের আলোক উদ্ভাস...?

□

বি. এস. রাময়্যা

জন্ম ১৯০৫ সালে। গল্প ছাড়া নাটক রচনাতেও রাময়্যা সিদ্ধহস্ত। চলচ্চিত্রের জন্যও কাজ করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'মণিক্কোডির' সম্পাদক হিসাবে তাঁর সাহিত্য রচনা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তামিলনাড়ুর শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম।

পয়সা বেঁচে গেল

চার-পাঁচটা বাড়ি ছাড়িয়ে ওই গলিটা থেকে একটা কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। তখন রাত ৯টা বেজে গেছে। অরুণাচল মুদালিয়ারকে ঘিরে দাঁড়ানো সবাইকার মন কেঁপে উঠছিল কুকুরটার কান্নায়। স্বল্প-আলোকিত ঘরে সবাই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে বসা লোকজন, ঘরের ভেতরে ও হলঘরের ভেতরের মহিলারা খুব কষ্ট করে নীরব ছিল। সবাই ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বারান্দায় বসা একজন কুকুরটাকে তাড়াবার জন্য উঠল।

অরুণাচল মুদালিয়ার যে ঘরে শোয়া, সেঘরের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করছিল তাঁর ছোট ছেলে জগদীশন। অতি কষ্টে মাথাটা ঘুরিয়ে হাত নেড়ে কিছু ইশারা করলেন মুদালিয়ার। বড় ছেলে বৈদ্যলিঙ্গম আর শালা কন্দস্বামী পাশেই দাঁড়ানো। বৈদ্যলিঙ্গম জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, কি চাইছ?'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই জানালাটা বন্ধ করছ কেন?' যদিও খুব ক্ষীণ-কণ্ঠেই বলছিলেন, তবুও কথাটা জগদীশনের কানে গেল। সে বলল, 'ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে।' বৃদ্ধ বললেন, 'তাতে ক্ষতি নেই। ওটা বন্ধ কোরো না।' অন্য একটা বন্ধ দরজাও খুলে দেওয়া হল।

জগদীশন চাইছিল যাতে কুকুরটার আর্ত চীৎকার বৃদ্ধের কানে না পৌঁছায়। কিন্তু বুঝল তিনি শুনেছেন। ঘরের সবাই ভীত, চিন্তিতভাবে ওঁর দিকে তাকাল। বৃদ্ধ হাঁপিয়ে উঠে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

আবার কুকুরটার সকরুণ চীৎকার ভেসে এল। পরক্ষণেই কি জানি প্রস্তরাঘাতজনিত বেদনা বা অন্য কোনও কারণে কুকুরটা আরও জোর আরও তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে পালিয়ে গেল।

এখনও অরুণাচল মুদালিয়ারের চোখ বোঁজা। মৃত্যুভীতির একটা বেদানার ছাপ যেন সারা মুখে। আশা আর বিশ্বাসের একটা ভাব ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল। সেটা যেন কুকুরের আর্তনাদে সব সময়ের জন্য মিলিয়ে গেল। মনে মনে বলছিলেন,

'সকালেই মাদ্রাজের সবচেয়ে নামী ডাক্তার এসে যাবেন। আমার আয়ু তিনি বাড়িয়ে দেবেন।' কিন্তু মন সেই ডাক্তারের কথার চেয়ে সদ্য আগত যমরাজের চিন্তায় মগ্ন। একটা কথাই ঘুরে ফিরে ওঁর মনে আসছিল, 'আর বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে না। বিশ্বাসের কথা এখন ওঠে না।'

একমাস হল মুদালিয়ার মাদ্রাজ থেকে গাঁয়ে এসেছেন। মাদ্রাজে থাকাকালেই শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। কাজ করার তাঁর অসীম ক্ষমতা ক্রমেই যেন কমে আসছিল। প্রায়ই হাঁপ ধরে বসে পড়তেন। তাঁর নিজের কাছেই সব যেন নতুন।

চুল পাকে শারীরিক কারণে—কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা মনের ব্যাপার। আমাদের চিন্তা-ভাবনা ধরন-ধারণ আমাদের সেই অবস্থারই পরিচায়ক। মন যখন যুবাবস্থায় তখন কেউই বুড়ো হয়ে যেতে পারে না। এসব কথাই উনি বলাবলি করতেন। জীবনেও তার প্রয়োগ করতেন। নিজের মনে নিজে সর্বদা বলতেন, 'বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন অবশ্যই হবে। তবে বার্ধক্যের সঙ্গে হৃদয়ের কোনও যোগ নেই।

এ-ধরনের লোকের চিন্তাপ্রবাহে বাধা পড়লে স্বভাবতই ঘাবড়ে গিয়ে এরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার জানান 'নিজের ক্ষমতার চেয়ে বেশি কাজ করার ফল এটা। অন্য কিছু নয়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লে, মনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছুদিন বাইরে কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

অরুণাচল মুদালিয়ার ডাক্তারের কথা মেন নিলেন। ছেলেপিলে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে উনি কোদাইকানাল, কুদানল, নীলগিরি ইত্যাদি স্থান, এমন-কি নিজের গাঁয়েও একবার ঘুরে আসা স্থির করলেন।

গ্রামে উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃপুরুষের জায়গা-জমি উনি পেয়েছিলেন। স্বোপার্জিত অর্থের একাংশ দিয়েও কিছু জমি কিনে সে সম্পত্তিভুক্ত করেছিলেন। অনেকদিন থেকে মনে মনে ভেবেছিলেন যে একবার গাঁয়ে গিয়ে অন্ততঃ ছমাস নিজেই জায়গা-জমির দেখাশোনা করবেন। কিন্তু মাদ্রাজে চারিদিকের সব ঝামেলা, বিশেষ করে ছড়ানো সব টাকা-পয়সা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আর সুবিধা হয় নি।

এমন সময় ডাক্তারের এবম্বিধ পরামর্শের কারণে বহু দিনের ইচ্ছাপূরণের একটা সুযোগ মিলল। বিশ্রামের জন্য উনি গাঁয়ে গেলেন।

দুই

অরুণাচল মুদালিয়ারের আগমনে গাঁয়ে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। সেখানকার তিনি একজন বড় জমিদার। মাদ্রাজে তাঁর বিরাট ব্যবসা। তাঁর প্রতিষ্ঠানে লাখ-লাখ টাকার কাজকর্ম হয়। মুদালিয়ার যা কিছুতে হাত ছোঁয়ান তাই সোনা হয়ে যায়। এটাই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস। শুধু, তারা কেন, শহরের লোকেদেরও সে ধারণা।

কিয়দংশ কথাটা সত্যি। ব্যবসা-বুদ্ধিতে মুদালিয়ার কুশলতার চরমে পৌঁছেছিলেন। চট করে সব ব্যাপার এত সহজে বুঝতে পারতেন যে গোড়াতেই সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা কষে নিতে পারতেন। এই কারণে যে কাজে লাভ, কেবল সে-ধরনের কাজেই উনি হাত লাগাতেন। ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা কিছুতে থাকলে সেদিকে এগোতেন না।

পঁচিশ বছর বয়সে মুদালিয়ার মাদ্রাজে আসেন। সেখানে ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। দিনে দিনে উন্নতি করেছিলেন।

বছর বছর তাঁর ধনসম্পত্তি বেড়ে চলেছিল। এখন যখন গ্রামে ফিরলেন, তখন বার্ষিক এক ল্যাখের হিসাবে তাঁর এই সম্পত্তির পরিমাণ ত্রিশ লাখ টাকার ওপর।

নিছক বিশ্রামের জন্যই তিনি গ্রামে আসেন নি। ভেবেছিলেন বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জমি-জমার ও আদায়-পত্রের হিসাবটাও করতে থাকবেন। কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছানোর দু-তিনদিন বাদেই অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাড়াতাড়ি হয়তো মাদ্রাজে ফিরতে পারতেন, কিন্তু কটা দিন দেখতে চাইলেন। কিন্তু পরে অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে ডাক্তার গ্রাম ছেড়ে যেতে মানা করলেন।

মাদ্রাজ থেকে ডাক্তার আনা হল। বড় শখ করে মুদালিয়ার একটা বুইক গাড়ি কিনেছিলেন। ছেলে বৈদ্যলিঙ্গম নিজের জন্য নিয়েছিল আর্মস্ট্রং সিডলী। এদুটোই এখন মাদ্রাজ আর গ্রামের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে। ডাক্তার বললেন, 'আর ঘাবড়াবার কিছু নেই। সপ্তাহকালের মধ্যে মাদ্রাজ ফিরে যেতে পারবেন।' এই আনন্দে দুদিন সবাই খুশিতে মশগুল। এই খুশিই আবার উবে গেল যখন তৃতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন, 'অন্ততঃ পনেরো দিন আপনার বেশি কথাবার্তা বলা চলবে না।'

গত দুদিন ধরে সবারই ভরসা কমে আসছিল। সবারই মনে হল যে মাদ্রাজ থেকে নামী কোনো ডাক্তার আনা প্রয়োজন। ভাবল, মোটরে আসতে সময় বেশি লাগলে, প্লেনে এসে তিন মাইল দূরে নেমে, এ বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতেই চলে আসা যায়। পরের দিন সকালেই প্লেনে ডাক্তার এসে পৌঁছচ্ছেন।

কুকুরের আর্তনাদ যেন জানিয়ে দিল যে ওঁর আসার আগেই যমরাজ এসে যাচ্ছেন। মুদালিয়ারের চিন্তা দ্রুততর হল। বার বার মনে তাঁর এভাবনাই উঁকি দিল 'বিশ্বাসের আর ব্যাপার নয়। বিশ্বাসের কোন স্থান নেই আর।'

তিন

গোড়ায় গোড়ায় ব্যবসায়ী জীবনের শুরুতে মুদালিয়ার পুরো ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন। পরে নাস্তিক হয়ে পড়েন। মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। কিভাবে যেন ভগবান শব্দটাই তাঁর ভাবনারহিত হয়ে ছিটকে চলে যায়। তবে

বাড়িতে পালা-পার্বণে, উৎসবাদিতে পূজা হলে তাতে অংশগ্রহণ করতেন। বাইরে দান-ধ্যান, ধর্ম বা ভগবান সংক্রান্ত কর্মে টাকা-পয়সাও দিতেন। কিন্তু মন কখনও সেদিকে ধাবিত হয় নি।

তবে নিজে কোনও যুক্তি তর্ক, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এই ধারণায় আসেননি। অর্থ যে শক্তির আধার সেকথাটা সারা মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। অন্যান্য ধারণাও সে কারণে মন থেকে অন্তর্হিত হচ্ছিল। নিজেও বুঝতে পারেন নি।

গ্রামে আসার পর ওঁর শরীরের অবস্থা যখন উদ্বেগজনক হয়ে উঠল, তখন পয়সা-কড়ি সম্পর্কিত কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা তাঁর মনে এসে বার বার উঁকি দিতে লাগল। একটা চিন্তাই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল যে তাঁর মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তির কি গতি হবে। এটাও বুঝলেন যে এ ব্যাপারে সত্বর একটা কিছু করা দরকার। ছেলেকে ডেকে এবিষয়ে বললেন। ওঁর শালা কন্দস্বামী মুদালিয়ার বলল 'এসব চিন্তা এখন করছেন কেন? আমরা মাদ্রাজ থেকে নামকরা ডাক্তারকে আনাচ্ছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা মাদ্রাজ চলে যাব। তখন চিন্তা করা যাবে।' এসব কথা শুনে মনটা হালকা হল নিজের মৃত্যুর পর ধন-সম্পত্তির বণ্টন কি ভাবে হবে সে নিয়ে তাঁর ভাবনা হচ্ছিল, যখন এরা বলল যে বাঁটোয়ারার কথা এক্ষুণি ভাবার প্রয়োজন নেই, তখন এঁর মনে হল যে অন্য বিষয়ে চিন্তাও আপাতত নিষ্প্রয়োজন। এরা দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছে যে এসব কথার পর পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যা করণীয়, তাও অবশ্যই এরা করবে।

কুকুরটার আর্তনাদ শুনে এটা তিনি বুঝলেন যে নিজের ইচ্ছার সুনিশ্চিত রূপায়ণের অবকাশ আর তাঁর হবে না। মুদালিয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। হৃদয়ঙ্গম করলেন যে এজন্মে পূজা-আরাধনা যতটুকু যা করা উচিত ছিল সেটা না করে জীবনের কাজ শেষ করায় কোনওভাবে তৎপর হওয়া খুবই অন্যায়। নিজের অন্তর্যামীই তাঁকে একথা বলেছেন। বিড়-বিড় করে তিনি বলে উঠলেন, 'প্রভু, কেবল একটু অবকাশ আমায় দাও।'

বললেন, 'এর দরুন যা-কিছু মূল্য তুমি চাইবে, তাই দেব আমি। এই ধন-সম্পত্তি যা আমি অর্জন করেছি, তা থেকে যত লাখ টাকা তুমি চাও, তাই দেব।' ভগবানের সাড়া পাওয়া গেল না। 'কুকুরটা জানিয়ে দিল যে যমরাজ গাঁয়ের সীমানায় এসে গেছেন।' ঘুরে ফিরে এই একটা কথাই তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগল।

এক লাফে তাঁর মন যমরাজের দরবারে পৌঁছে গেল। 'কেবল একটা বছর সময় দাও। তার ভেতর যা কিছু করা দরকার, আমি করে নেব। ভগবানকে ডাকবার জন্য আমার এক বছর সময় যথেষ্ট।' কথাটা ভেবে নিয়ে ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনার উত্তর কিছু মিলল না।

'এসে তো গেল! খালি হাতে ফিরেও যাবে না। আমার বদলে অন্য কাউকে

নিয়ে যেতে রাজী হয় তো...তাহলে আর খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না। যদি তেমন যাওয়ার জন্য অন্য কেউ তৈরি থাকে তবে তার পরিবারকে দু'লাখ টাকা দেব আমি।' এধরনের সব কথা তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল।

চোখ খুললেন তিনি। দেখলেন সামনে কন্দস্বামী মুদালিয়ার, তার স্ত্রী, বাচ্চারা সব চিন্তান্বিতভাবে তাঁর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে দেখছে। কন্দস্বামী মুদালিয়ারের দিকে তাকিয়ে তিনি ঠোঁট নাড়লেন, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। কন্দস্বামী মুদালিয়ার ঝুঁকে পড়ে নিজের কান মুদালিয়ারের ঠোঁটের কাছে নিল।

অরুণাচল মুদালিয়ার বললেন, 'আমার চেক বইটা দাও।' তারপর উনি আবার চোখ বন্ধ করলেন।

মিনিট পাঁচেক পার হয়েছে। মুদালিয়ারের যেন মনে হল গ্রামের ডাক্তার এসে তাঁর নাড়ী টিপে দেখছেন। ডাক্তারের চোখে মুখে একটা প্রশ্নচিহ্ন ফুটে উঠছে কেন? জগদীশন ঘাবড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ওঁকে যেন কি জিজ্ঞাসা করছে না?

ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিলেন। ওঁর মনে হল বাঁ হাত হয়ে হৃদয় পর্যন্ত সেটা দপ দপিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখো, দেখো, যেন হৃদয়ের গভীরতম প্রান্তে গিয়ে সেটা পৌঁছেছে। সেখান থেকে আবার বেরিয়ে যেন সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

মুদালিয়ার কিছুটা শক্তিলাভ করলেন। ডাক্তার আবার নাড়ী টিপলেন। উনি বললেন, 'এক ঘণ্টা এভাবে থাকতে দিন। আমার জন্য বারান্দায় একটা আরাম কেদারা বিছিয়ে দিতে বলুন। আবার আরেকটা ইনজেকশন দিতে হবে।'

কন্দস্বামী মুদালিয়ার চেক বই নিয়ে এল। সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, উনি আমায় চেক বইটা আনতে বলেছেন।'

'এখন রেখে দিন। আবার উঠে যদি চান তখন দেখা যাবে। গোলমাল করলে আবার দুর্বলতা বাড়বে' এ কথা বলে ডাক্তার বাইরে চলে এলেন।

অরুণাচল মুদালিয়ার চোখ বোঁজা রেখেই এসব কাজকর্ম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অবলোকন করতে লাগলেন।

'ইনজেকশনের ফলে নাড়ীতে বলসঞ্চার হয়েছে। আমার তো তাই মনে হচ্ছে...। যমরাজের আসতে আরও একঘণ্টা দেরি। আবার আর-একটা ইনজেকশন...আবার আরও একঘণ্টা পাওয়া যাবে। এভাবে কাল পর্যন্ত...তারপরেই বড় ডাক্তার এসে যাবেন উড়ো জাহাজে—নইলে তো সবই ভেস্তে যাবে। ইনজেকশনের ভরসায় আমি থাকতে পারি না। এই ইনজেকশন দিয়ে যমরাজের সামনাসামনি হওয়া কি সম্ভব? আমার জন্য প্রাণ দিতে কেউ প্রস্তুত থাকলে, তার পরিবারকে একটা চেক দিয়ে দেব...আমার শালাকে কথাটা বলে দিলেই যথেষ্ট হবে।'

অরুণাচল মুদালিয়ারের ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল। চোখ বোঁজাই ছিল। আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। জগদীশন কাছে এসে ঝুঁকে কথা শোনার চেষ্টা করল। সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সে মামাকে বলল, 'কি জানি কি দুলাখ টাকার কথা বলছেন।' উৎকণ্ঠাভরে সে দাঁড়িয়ে রইল যদি মুদালিয়ারের ঠোঁট আবার নড়ে। কিন্তু সেটা আর নড়ল না।

অরুণাচল মুদালিয়ারের শরীর আর স্ব-বশে ছিল না। তবে এটুকু উনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে শরীর ইচ্ছামত এপাশ-ওপাশ করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।

তাঁর মনে হল একঘণ্টা বাদের সেই দ্বিতীয় ইনজেকশনটা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারই তাঁর যেন মনে হচ্ছিল যে ওষুধের প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবুও যেন শরীরের ওপর তাঁর নিজের বশ কিছুই থাকছে না।

দ্বিতীয় দফায় সূচের মুখে শরীরে ওষুধটা ছড়িয়ে যাবার পর নাড়ী দেখে ডাক্তার বললেন, 'নাড়ীর গতি পুরোপুরি ঠিক হয়ে এসেছে। এখন আর ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। তবুও আমি বাইরে বসে রইলাম।' ডাক্তারের কথা স্পষ্টভাবেই সব ওঁর কানে পৌঁছল।

এর পরে ঘরে আর কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। দু-একবার কারো খুব ধীর পদক্ষেপে আসা-যাওয়ার শব্দ একটু কানে এল। ফিসফিস কথাবার্তাও একটু শোনা গেল, 'আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি এখন থাকছি।'

নিস্তব্ধতায় ঘরটা ছেয়ে গেল। কতক্ষণ যে এই নিস্তব্ধ ভাবটা ছিল সেটা বোঝা গেল না। রাতের এই স্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা গেল, 'হায় রে, হায়, এই এসে গেছে।' আরও অনেক চীৎকার ভেসে এল। কিন্তু মুদালিয়ার সে সব আর শুনতে পেলেন না।

'এই এসে গেছে! কে? এখানে! আমার বদলে অন্য কারো ব্যবস্থা হয়ে গেছে? আমি কন্দস্বামী মুদালিয়ারকে বলে দিয়েছি দুলাখ টাকা দিয়ে দেবার জন্য। লোক তবে পাওয়া গেছে? কিন্তু একথা বোধ হয় আমি বলে দিইনি যে যদি ও-টাকায় রাজী না হয় তবে তার চেয়ে বেশি দিতে পেছপা হোয়ো না। দিয়ে দিয়ো। আর ওই ওখানে চেঁচামেচি কিসের শোনা যাচ্ছে? যমরাজের পদধ্বনি? খোকা, মামাকে বল। লোক কি পাওয়া গেছে? বলেছ কি একটা দুলাখ টাকার চেক দিচ্ছি?' ডাক্তারবাবু, নাড়ীর গতি কি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে? তা হলে এক বছরই যথেষ্ট। আমার বদলে একজনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওর পরিবারকে দুলাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

কাবেরী নদীর জলের ঘূর্ণির মতো মুদালিয়ারের মন দ্রুত পাক খেতে লাগল। একই চিন্তা থেকে থেকে তাঁর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল...'দুলাখ টাকা...আমার বদলে আরেক জন...এক বছর সময়।'

দূরাগত ভয়ানক চীৎকার-চেঁচামেচিতে খেই হারিয়ে গেল। মনে মনে চিন্তাটা বাদ দিয়ে দূরের শব্দ কোলাহল শুনে ব্যাপারটা তিনি বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। গলিতে অনেক লোক দৌড়চ্ছিল। কি জানি কি বলে ওরা চীৎকার করছে। বাড়িতেও

লোক দৌড়াদৌড়ি করছে। যে ঘরে উনি শুয়েছিলেন সেখানেও লোক চলাফেরা করছিল। কিন্তু উনি স্পষ্ট কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে শরীর আর তাঁর বশে নেই। ভাবলেন সম্ভবতঃ শারীরিক ক্রিয়া-কর্ম লুপ্ত হবার আগে এমনই হয়।

গলিতে কথাবার্তা শোনা গেল। বক্তার কথা বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। মুদালিয়ার উৎকণ্ঠাভরে ওই কথা শোনার ও তার মর্ম উদ্ধারে মন দিলেন।

মুনিরত্নম নায়ুডুর বাড়িতে চোর এসেছিল। সে সময় নায়ুডু বাড়ীতে ছিলেন না। কেবল স্ত্রী ও বাচ্চারা। যখন চোর ভেতরে ঢুকে অলংকারের বাক্স খোলার চেষ্টা করছিল, তখন নায়ুডু-পত্নীর ঘুম ভেঙে যায় এবং চীৎকার করে ওঠে, 'হায় রে, চোর এসেছে।' চোরদের একজন ছোরা দেখিয়ে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করে। অন্যেরা বাক্স নিয়ে চলে যায়।

ওর চীৎকার শুনে আশেপাশের লোকজনেরা চারিদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তাই লোকেরা কিছু করে উঠতে পারছে না।

দক্ষিণ দিকের গলির কিছু লোক চীৎকার শুনে দৌড়ে আসে। নায়ুডুর বড় বোনের বাড়ি ঠিক পিছনেই। তাই নায়ুডুর বড় দিদির ছেলে বেঙ্কটস্বামী বাড়ির পিছন দিক থেকে পড়ি-মরি হয়ে ছুটে আসে।

এসময় নায়ুডুর স্ত্রীকে ছোরা দেখিয়ে লোকটা দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করছিল। বেঙ্কটস্বামী লাফিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। ভেঙ্কটস্বামীর চিৎকারে আরও কিছু লোক দৌড়ে সেদিকে আসে। ওদিকে আরও লোককে আসতে দেখে চোরটা বেঙ্কটস্বামীকে ছোরার আঘাত করে পালিয়ে গেল। সবাই গিয়ে চোরের পেছনে ধাওয়া করা সত্ত্বেও সে পালালো।

'ছোরাটা বেঙ্কটস্বামীর বুকের মধ্যে দু'ইঞ্চি ঢুকে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। সবাই বলছে ছেলেটাকে বাঁচানো কঠিন হবে।' এ পর্যন্ত বলে বক্তা থামল।

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন? বেঁচে যাবে তো?'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ছোরাতে তার হৃৎপিণ্ড টুকরো হয়ে গেছে।'

তৃতীয় জন বলল, 'ও মরে গেল? হায় বেচারা! গত মাসেই তার বিয়ে হয়েছে। খুবই ভালো ছিল ছেলেটা। আর খুব সেয়ানা। ধৈর্যও ছিল খুব...। আমায় বলেছিল 'আমি পুলিশে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিচ্ছি।' ইন্সপেক্টারের কাজ সে সহজেই পেতে পারত।'

মুদালিয়ারের মনে হল তাঁর নতুন করে বল সঞ্চার হচ্ছে। চিন্তাধারা নতুন খাতে আরও দ্রুতবেগে বইছে। মনে মনে বলল, 'ভালোই হল! কুকুরটা তবে আমার জন্য

চেঁচাচ্ছিল না। যমরাজ এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমার জন্য নয়। মুনিরত্নম নায়ুডুর বাড়ির পেছনের লোককে দেখে কুকুরটা চেঁচিয়েছিল। আমার কথা হয়তো ভাবেও নি।'

উনি চোখ খোলার চেষ্টা করলেন। কি আশ্চর্যের কথা! চোখ খুলে গেল। কথাও খুব স্পষ্ট শোনা গেল। ওর শালা আর দুই ছেলে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ানো।

'ঘাম হচ্ছে,' বলে জগদীশন বাবার মাথার ঘামটা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল।

মুদালিয়ার শালাকে বললেন, 'চেকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

শালা বলল, 'আপনার সেই চেক তো এখনও কাটা হয়নি। আপনি শুধু আমায় চেক বইটা আনতে বলেছিলেন।'

অরুণাচল মুদালিয়ার মাঝখানে বলে উঠলেন, 'এখনও লেখ নি চেক? তা হলে চেক বইটা ভেতরে নিয়ে রেখে দাও।'

ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এমন কোনও কাজে উনি কখনই হাত দেন নি।

□

মৌনী

১৯০৭ সালে জন্ম। গল্পকার হিসাবে 'মণিক্কোডি' পত্রিকার মাধ্যমে তামিল পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত হন। নিজস্ব এবং নতুন শৈলী তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কেবল পাঠকই নয়, বহু লেখকও তাঁর রচনা-শৈলীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লঘু কাহিনীর আকারে জীবনের অখণ্ডতাকে ব্যক্ত করার বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।

চেতনার দ্বারপ্রান্তে

শেখর বলল, 'একটু ঐ মেয়েটাকে দেখ।'

তার সঙ্গের বন্ধু কিট্টু হাসতে হাসতে কথাটা সংশোধন করে দিল, 'মেয়েটাকে নয়, মেয়েগুলোকে...।' দুজনে রেতীলে ময়দানটা পার হয়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। এদিক-সেদিক লোক বসে। সন্ধ্যার ধোঁয়াটে সমুদ্রটা চমৎকার। সমুদ্রতীরে লোকজনের বিশেষ ভিড় নেই। কিছুটা দূরে জলের ধার ঘেঁষে তিনটি মেয়ে বসেছিল। ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে আর বন্ধু কিট্টুর সঙ্গে চলতে চলতে শেখর আবার বলল, 'মেয়েদের দিকে তাকানো আমার অভ্যাস নয়। আমি ওই মেয়েটির কথাই বলছি।' কিট্টু সঠিক বুঝে উঠতে পারল না, চোখের চাহনিতে শেখর তিনজনের ঠিক কোন জনকে ইঙ্গিত করছে। শেখর গাঁ থেকে, গাঁয়ের জীবন ভুলতে, দিনকয়েক শহরে কাটিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে এসেছে। তার সব কথাবার্তা, তার ছোটবেলার এই বন্ধু কিট্টুও সবসময় বুঝে উঠতে পারে না। গত কদিন যাবৎই কিট্টুর কাছে শেখরের ব্যবহার বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে।

'তুই কোনজনের কথা বলছিস...? মুখের ভেতরে বেরিয়ে পড়া দাঁত যে চেপে রেখেছে সে মেয়েটার কথা বলছিস...না পাকানো চুলের গোছা সামলানোর জন্য যে দুটো বেণী বেঁধেছে তার কথা বলছিস...?' কথাটা বলতে বলতে কিট্টু থেমে গেল। তার কথাটা উপহাসমাত্র। তার কল্পনা স্পষ্ট করে প্রকাশের জন্যে নয়। উপর উপর কথাগুলো শ্রোতাকে হাসানোর জন্যই বলা।

তৃতীয় মেয়েটির বর্ণনায় কল্পনাশক্তির অন্য কোনও রকম ভাব প্রয়োগে সে অপারগ। কিংবা, হয়তো সে শহুরে ঢঙে প্রকাশ করার মতো উপমা আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। যে কারণেই হোক সে চুপ করে গেল।

শেখর বলল, 'কিট্টু, তোর ইঙ্গিতমতো মেয়েগুলোকে আমি দেখলাম! আমি কিন্তু ওদের সম্বন্ধে বলি নি বা ওদের দিকে তখন তাকাইও নি। এখন তুই বল, ওদের দুজনের মাঝখানের মেয়েটি সম্পর্কে তোর কি মনে হচ্ছে। শহুরে ভাষায় বর্ণনা করতে না পারলে, তোর তামিল পণ্ডিতী ভাষায় বর্ণনার চেষ্টাই কর...।'

সে বলল, 'ভাই, আমি পারব না...আমার দ্বারা হবে না। তামিল ভাষাটা আমি ভালো করে শিখি নি।'

শেখর বলল, 'এটা ভালোই করেছিস...নইলে লিখে আর বক্তৃতা দিয়ে তুই পাগল হয়ে যেতিস। ভালোই হয়েছে, তুই সেটা করিসনি।...হ্যাঁ, আমি যেন কি বলছিলাম। তুই অন্য কিছু বলে আমার বক্তব্য ঘুরিয়ে দিলি। ঠিক আছে, কিছু এসে যাবে না। তাতে। তুই ওই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখে কি মনে হচ্ছে তোর? আমি দেখব তোর বর্ণনা বা উপমা ওর সম্বন্ধে কতটা মেলে!' কিট্টু মেয়েটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তেমন কিছু তার নজরে পড়ল না। তার রূপ, আকৃতি, আকর্ষণী-শক্তি ওকে হতচকিত করে দিল। অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। সংক্ষেপে বলা যায়, এক সজীব মৌন প্রতিমার মতো তাকে দেখতে। একবার দেখলে কেউ তাকে ভুলতে বা আবার না দেখে থাকতে পারে না। যে দেখছে তার মনের সব কল্পনাই যেন ওর সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। এমন সুন্দরী মেয়ে যে সংসারে থাকতে পারে ভেবে কিট্টু কুলকিনারা পেল না। ওদিকে তাকিয়ে জড়বৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে সচেতন করার জন্যই শেখর তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এর মতন আমি কাউকে দেখিনি'—এ কথা ভাবতেই তুই চমকে উঠে জড়ের মতন দাঁড়িয়ে পড়লি! তোর মনে সব রকম কল্পনা কিভাবে উদয় হবে বল? আমি কত সময়, কত জায়গায় কত রূপ দেখেছি। সেগুলো মনের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সব খুঁজছি। আজ একে দেখে মনে জাগছে, এ-ই তো সে-ই রূপ! মনের আনন্দ চোখে নয়, সারা-শরীর মন জুড়ে ব্যক্ত। অতি বিচিত্র রূপ কারো কখনও দেখলে চমকে উঠি না, আমি আনন্দিত হই। তোকে আমি খুব পরিষ্কার বোঝাতে পারছি না। আমার সময়ও নেই...' কথাগুলো বলে শেখর কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে রইল। মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে আবার সে বলল, 'ওকে এভাবে দেখে নেবার পর, ও শুধু তোর কল্পনাতেই নয়, শরীরের নাড়ীতে, হৃৎস্পন্দনে গাঁথা হয়ে যাবে...।'

কিট্টু করুণ স্বরে বলল, 'শেখর, আমি তোর বুদ্ধির উর্বরতা আর ভাবনার তীব্রতা সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল। কল্পনা-প্রবাহ তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ চিন্তা-স্রোতে তুই যে কোথায় পৌঁছে যাস, তা অবশ্য আমি বলতে পারব না।'

'কিট্টু, এক হিসেবে তোর কথাটা ঠিক। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ কোন কোন কথা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।...তুই সুশীলাকে ভালো করে চিনিস? আমার পরম সৌভাগ্য যে তাকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। এক গোলমেলে কারণে সুশীলা এ দুনিয়ায় জন্মেছে। সে সৌভাগ্যবতীও বটে। আমায় সে স্বামীরূপে পেয়েছে। যখনই তাকে দেখি আমার মনে না জানি কত চিন্তার উদয় হয়। স্বামী হিসাবে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আমার কেন জানি অসীম আনন্দ হয়। কিছুদিন যাবৎ একটা সীমাহীন প্রেম জেগে উঠেছে...। মনে একধরনের ভয়ও...ভয় হয়তো ঠিক বলা চলে না।

একটা কৃত্রিম ভীতি জেঁকে বসেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে সব কিছুর ওপর একটা আকর্ষণ বাড়ছে। আবার ধাক্কা দিয়ে দূরেও ঠেলে দিচ্ছে। এসব-কিছুরই দায় সামলাতে হচ্ছে আমার স্ত্রী সুশীলাকে।...ঘরের কাজকর্ম করতে করতে রেগে উঠছে, বিরক্তি প্রকাশ করছে। এখানে এলে মন কিছুটা হালকা হবে...সে কথা ভেবেই এলাম...। এখানে ওই মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমি ওকেই দেখছি।' দশ পা'ও হয়তো এগোয়নি, এরই মধ্যে উত্তেজিত হয়ে সে এতগুলো কথা বলে ফেলল। এই উত্তেজনার সঙ্গে একটা স্থির ভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। হেসে শেখর কিট্টুকে বলল, 'আমি বকবক করে চলেছি। মন্দ কিছু ভাবছিস না তো...যে মেয়েটা মাঝখানে বসে, আমি তার কথাই বলছি। বলছি কিছুদিন যাবৎ সুশীলাকে দেখে আমার একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগছে! একে দেখে সেই অনুভূতি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবশ্য পরিষ্কার ভাবে সে অনুভূতিটা আমি বুঝতে পারিনি। সেই বিষয়টাই তোর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। তুই হয়তো আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবি। তোকে না বলে যদি অন্য কাউকে এ কথটা বলি, তবে বিষয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে উল্টে আমায় মন্দ বলবে।...ওর দিকে তাকিয়ে দেখ...সৌন্দর্যটা কেমন আকৃষ্ট করে রাখে, যেন জোর করে টেনে রয়েছে। মেয়েটি অবিবাহিতা। তার মধ্যে নারীত্বের এক প্রতিচ্ছবি। তুই তো জানিস নারীত্ব কি রকম প্রচণ্ড একটা শক্তি! নারীকেও কোন পুরুষের স্ত্রী হতে হয়। নারীত্বের ছবি বিশাল চিত্রপটে আঁকা যেতে পারে। বিধির বিধানে ছোট আকারে আবদ্ধ লঘু চিত্রপটেই পত্নীর প্রতিচ্ছবি দেখে স্বামীকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই গণ্ডীর মধ্যে নারীত্বের বিপুল বিস্তার দেখে তার মনে আবার ভীতির ভাবও জাগে।' শেখর হাসতে হাসতে কিট্টুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে কিট্টু, বউকে দেখে তুই ভয়ে ঘাবড়ে গেছিস নাকি?'

কথা বলতে বলতে ওরা মেয়েদের কাছে পৌঁছে গেল। কথাবার্তা সব ওদের কানে পৌঁছে থাকবে—মনে এই সন্দেহের উদয় হওয়ায় ওরা কথা বন্ধ করে দিল। ছেলেরা চুপ করে যাওয়ায়, এদিকের বার্তালাপের মধুর ধ্বনি যেটা ওদের কথার আওয়াজে মিশে গিয়েছিল, সেটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাক্যালাপরত মেয়েরাও যখন এ দুজনকে তাদের কাছাকাছি দেখল তখন তারা কথা বলা বন্ধ করে দিল। প্রত্যেকের মনেই সন্দেহ যে তাদের কথা বোধহয় অন্যে শুনে ফেলল। তখন মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে বারবার এরা ওদের দিকে তাকাতে লাগল। যখন একই সময়ে একই ভাব দুজনের মনে জাগে তখন ওদের অজ্ঞাতেই একটা কোমল সম্পর্ক পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরবর্তী ঘটনা অনুযায়ী কখনও সে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। কখনও বা ভেঙে যায়। এটা আরও অনেকভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

পরের দিন দুপুরে একটা নাগাদ কফি খাওয়ার জন্য শেখর হোটেলের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে ওই মেয়েটিকে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। চমকে উঠে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শেখর বলল, 'আরে..?' মেয়েটিও সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বলল, 'আরে...? এটা তো সন্ধ্যার সময় নয় আর সমুদ্রতীরও নয় যে কথা বলতে বলতে সময় কাটানো যায়।'

শেখর বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। একটু কফি খেয়ে চলে যাওয়া যাবে...।'

মেয়েটি বলল, 'এখন ইচ্ছা করছে না...পরে দেখা যাবে।'

সে মাথাটা হেলিয়ে বলল 'আচ্ছা বিকেলে দেখা হবে।' মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ শেখর স্থির-নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে হল একটা মধুর স্বপ্ন দেখল।

সেদিন বিকালে শেখরকে একাই সমুদ্রতীরে যেতে হল। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সে দেখল যে প্রথম দিন যেখানে দেখেছিল সেখানেই ওরা বসে কথাবার্তা বলছে। সে জায়গায় পৌঁছেই 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা...' বলে সে নিজের কথা শুরু করে দিল। কিছুটা থেমে আবার 'অনেকক্ষণ হল এসেছেন কি...?' বলে কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিল। মেয়েরা খুব চমকে উঠল। সেই মেয়েটি বলল, 'এসেছি কিছুক্ষণ হল।' ওদের থেকে কিছুটা দূরে সে বসল। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভাবনাহীন স্বরে সে বলল, 'দুপুরে এর সঙ্গে শহরে আমার দেখা হয়েছিল।' যেন একটা দড়িতেই দুজনে বাঁধা এমনভাবে মেয়েটি পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেল আর ঘুরে ফিরে এই দুজনের দিকে ওরা দেখতে লাগল।

ভানু, সুশীলা আর সুমতি তিনজনেই এরা বিত্তশালী আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর এরা কি করবে, নিজেরা তো বটেই, এদের বাবা-মায়েরা কেউই স্থিরকরে উঠতে পারেন নি। বিকেলবেলাটা সমুদ্রতীরে কাটানো এদের নিয়মে দাঁড়িয়েছে। শেখর ওদের দলের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আর বৈকালিক কথাবার্তায় অংশ নেওয়ায় সময়টা ওদের বেশ সহজভাবেই কেটে যাচ্ছে। শেখরের কথাবার্তা খুব মজার। ওর স্বভাবও ওদের ভালোই লাগছে। অজ্ঞাতে ওদের তিনজনের মনেই ওর প্রতি একটা প্রেমের ভাব জেগেছে। অল্পদিনের পরিচয়েই এরা তাকে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে মনে করতে শুরু করেছে। এখনও এরা একে অন্যের পরিচয় জানতে পারেনি, নামধামও কেউ কারো জিজ্ঞেস করেনি। প্রথম সাক্ষাতে সে সুযোগ না হওয়ায় এতদিন বাদে এ-ধরনের প্রশ্ন করাটা খুবই অসমীচীন।

একদিন শেখরকে দেখে কিছুটা বিচলিত মনে হল। সুশীলাকে সে কিছু বলতে চেয়েছিল। 'শোনা, সুশীলা' বলে ঘাবড়ে গিয়ে কথা বন্ধ করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। বাকী মেয়ে দুজন একে অন্যের দিকে তাকাল। খুবই চমকে উঠল এরা দুজনে।

দুষ্টুমীর হাসি হেসে ভানু শেখরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম কি?' ওর দিকে ঘুরে শেখর বলল, 'শেখর।' তাকেই আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটির

নাম কি?' সে মেয়ে বলল, 'এখুনি আমায় আপনি সুশীলা বলে ডাকছিলেন না?' সে বলল, 'আমি আপনার নাম জানতাম না।'

কিছুক্ষণ বাদে সে শান্তভাবে বলল, 'দোলনায় আপনি দোলেন? ছোটবয়সে একজনকে বসিয়ে দোলনায় দুলেছেন হয়তো-বা। জোরে যে দুলছে সে কাছের আর দূরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে। যদি দোলনায় চড়া কেউ দূর ও নিকটের আমাদের এক রকমই দেখে তবে সে খেলাটা কেমন মজাদার হয়। যেমন একই ধরনের দুজনে ঝুলেছিল আর এখন একই নামে দুজন ঝুলছে...' এটুকু বলে সে হেসে ফেলল। সম্মোহনী হাসি, তারপর সে বলল, 'এত স্বল্প কালের পরিচয়েই আমি এভাবে কথা বলছি। প্রগলভতার জন্য মাপ চাইছি। আমার খুবই পরিচিত ও প্রিয় এক মহিলার নাম সুশীলা। আপনার নাম সুশীলা জেনে আর দুই নামের অপূর্ব সাদৃশ্য দেখে মন—কেন জানি কি এক আনন্দে বিভোর!'

□

এক মাস হয়ে গেল শেখর গ্রাম ছেড়ে এসেছে। গোড়ায় কিছুদিন সে কিট্টুর সঙ্গে ছিল। গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি বলে এক ধর্মশালায় এসে উঠেছে। সম্ভবত শহর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তবে কিছুদিন যাবৎই তার গাঁয়ের কথা থেকে থেকে মনে পড়ছিল। প্রতিদিন বিকালে সে ওই মেয়েদের গিয়ে বলত, 'আমি হয়তো কাল গাঁয়ে চলে যাব।' কিন্তু পরের দিনও সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছুত।

সেদিন শেখর ভাবল, মেয়েগুলো নিশ্চই ভাবছে 'আজ সে চলে গেছে।' ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা খুবই চমকে উঠবে। সেদিন সে সমুদ্রতীরে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে গিয়েই পৌঁছবে ভাবলো। একদিকে ভাবছে এবারে গ্রামে চলে যাওয়া দরকার। অন্যদিকে মেয়েগুলোর সঙ্গে কথা বলার আনন্দ এখানে থেকে যেতে বাধা দিচ্ছে। দুই বিপরীতমুখী চিন্তায় আন্দোলিত হতে হতে শেখর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে তার এখন কি করা উচিত। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূন্য চেতনার এক দ্বারপ্রান্তে শেখর যেন এখন ধাক্কা খাচ্ছে। নিদ্রা আর জাগরণের অর্ধ-চেতন অবস্থায় যেন সে দুনিয়ার সব কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে। এই অবস্থায় মায়াজালে ঘেরা সংসারের সবকিছু যেন বাস্তব মনে হয়। নিদ্রাকালে সবই বিলুপ্ত আর জাগ্রত অবস্থায় সব-কিছুই বিস্মৃত।

কোনও রকমে সেদিন সে সময়টা কাটিয়ে দিল। বিকালে সমুদ্রতীরে যাওয়ার জন্য সে একটু আগেই গিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল, প্রচুর ভিড়। ভিড় কাটিয়ে এগোতে না পারার দরুন দুটো বাস চলে গেছে। ওকে ফেলে বাসটাকে চলে যেতে দেখে মনে হল যেন সংসারের সবাই ওকে একলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাসটা সমুদ্রের ধারে মেয়েদের নামিয়ে দিয়ে যাবে না—এরকম ভাবতে ভাবতে পরের বাসটাও চলে গেল।

মনে হল যেন রাস্তার দুধারে গাছের সারি দুপাশের বাংলোগুলোর পরোয়া না করে পূর্ব-পশ্চিমে টানা সড়ক ছোট হতে হতে সেই আকাশ আর মাটির মিলনবিন্দু পর্যন্ত চলে গেছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছ। দুদিকে নানা ধরন ও নানা রঙের বাড়ি আর বাংলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

শেখর দেখল যে তারই মতো বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ায় রাস্তার ধারের গাছ আর বাড়িঘর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে; এগোতে পারেনি। মৃদুমন্দ বাতাসে আলোড়িত ফুলের গুচ্ছ মনোহর। সামনের বাংলো থেকে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল। তার প্রতিধ্বনি শুনে মনে হচ্ছিল যেন বাংলোগুলোই কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করছে। কিছু দূরে খাড়া একটা নির্জীব চীড় গাছ। তার মাথায় একটা ঝাণ্ডা বেঁধে কোনও রাজনৈতিক নেতা আনন্দে নৃত্যপর হলে সেটা কেমন হাসির ব্যাপার হবে! পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, তার গেরুয়া রঙের ছোপ লেগে সারা বিশ্বই যেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করেছে। শেখরের মন নানা চিন্তায় বিভোর। প্রকাশের পথ না পেয়ে ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠছে। মুখে একটা কঠোর ভাব, কিন্তু ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। মন্দিরের দেবতা যেমন ভক্তদের কৃত্রিম ভক্তিভাব দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, শেখরও তেমনি শহরবাসীদের কৃত্রিম ব্যবহার দেখে মুচকি মুচকি হাসছে।

শহরের রাস্তায় কাতর চীৎকার শুনেও কেউ তাকায় না। যেমন গর্জন করতে করতে সব গাড়িগুলো ছুটে আসে, তেমনি আবার হুট করে মিলিয়ে যায়। অশরীরী সব প্রাণীর মতো কিছু লোকজন রাস্তায় চলাফেরা করেছে। আর কিছু লোক যেন প্রাণ হাতে করেই দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট-অস্পষ্ট আওয়াজ। পরিষ্কার ও ঝাপসা নানান চেহারা। শহরের সবাই যেন শশব্যস্ত, সব কিছুই অস্পষ্ট এবং সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এর আকার, ধ্বনি, নাম, স্বরূপ সব পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাই এদের আলাদা আলাদা সত্তা-নিরূপণ অসম্ভব। একটা থেকে অন্যটা পৃথক করে দেখার কোনও ইচ্ছাও ওর হল না।

দূর থেকে সিনেমার গান ভেসে আসছিল। সুরটা মধুর কিন্তু বড় চড়া সুরে বাঁধা। একজন চা-ওয়ালা তার ব্যবসা জমানোর চেষ্টা করছে। এই সোরগোলটা নয়া-সভ্যতারই অবদান। সে বাসের জন্য চেষ্টা না করে দাঁড়িয়ে নানান জিনিস দেখছিল। তার মনে হল দুনিয়ার বহু কিছুরই ঘাটতি রয়েছে। নানা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। শক্তি ও জন-বলের মূলধনেই বিশ্বের সব কারবারের সূত্রপাত। সময়ের পরিবর্তনে নানা পালা-বদল ঘটে আর মানুষের মূল্য কমতে থাকে। এখন এই ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার মূলধনেও টান পড়েছে।

শেখর তাড়াতাড়ি সমুদ্রতীরে পৌঁছুতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পৌঁছুল অন্য দিনের চেয়ে দেরিতে। দূর থেকে দেখতে পেল মেয়েরা নিজেদের জায়গায় বসে গল্প করছে। ওদের কাছে পৌঁছুতেই ভানু হেসে স্বাগত জানাল 'কি শেখর, আজ এত দেরি

যে...নিজের গ্রাম থেকেই তো সোজা আসছ, না?' সুশীলা মৃদু স্বরে বলল, 'আজও গ্রামে যাওনি?' তার কথা বলার ভঙ্গীতে প্রশ্ন আর বিস্ময়। ভানু বলল, 'না বলে যায় কি করে...!'

শেখর বলল, 'বাড়ির কেউ জানে না আমি এখানে।'

'আচ্ছা, তবে কি শেখর রাগ করে বাড়ির লোককে না বলেই এখানে এসেছে?' ভানু হাসতে লাগল।

শেখর সুশীলার দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি সুশীলা...ভানু মিথ্যে বলছে—তাই না?'

সুশীলার কথায় ক্ষোভ প্রকাশ পেল, 'আমি কি করে জানব, শেখর...আজ তোমার কথাবার্তা ঠিক অন্য দিনের মতো নয়, কেমন যেন উদাস মনে হচ্ছে।'

কিছুদিন যাবৎ শেখরের কথাবার্তা সুশীলার কাছে উল্টোপাল্টা ঠেকছে। সে জানে না অন্য মেয়েরা কি ভাবছে। কখনও কখনও ওর কথা তার ভলো লাগে না। নিজে সজাগ বলে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ওর বিষয়ে কথা বলাটা উচিত মনে করে না। কখনও-বা শেখরের দার্শনিক কথাবার্তা আকর্ষণীয় মনে হয়। গত দু'দিন ধরে শেখরের কথা শুনে সুশীলার মনে হয়েছে সে বেশ সতর্ক এবং কিছুটা বিচলিত। কারণ খুঁজে পায়নি। আপাতত কোন্ চিন্তা ও ভাবনা শেখরের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে ও ভেবে পাচ্ছে না। বারবারই ভাবে হয়তো ভয়, দয়া, ঘৃণার ভাবই শেখরের মনে রয়েছে। ভাবতে ভাবতে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কখনও-বা দুঃখ হয়।

নিজের স্ত্রী, বাচ্চা ও গ্রাম ছেড়ে শেখরের শহরে একা থাকাটা মেয়েদের ভালো লাগেনি। ওরা জানে ওদের জন্য ওদের বাবারাও যোগ্য পাত্র খুঁজছেন। স্বামীর জন্যে স্ত্রীর চিন্তা ও তার প্রতীক্ষায় থাকা আর এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্যে অনূঢ়া কন্যার ভাবনা ও প্রতীক্ষা একই জিনিস নয়। কুমারী মেয়ে ও বিবাহিত মহিলা দুই আলাদা, তাই দুয়ের ধরনও ভিন্ন। নারী হিসেবে ওর এটা যুক্তিযুক্ত মনে হল। গ্রামে ওর স্ত্রী প্রতীক্ষারত এসব কথা ওদের ভালো লাগেনি। ওদের মনে হয়েছে এখানে থাকাটা শেখরের পক্ষে অনুচিত। ওকে একথাটা বলাও হয়তো ঠিক হবে না। কখনও কখনও সুশীলার মনে হয়েছে যে ওর গ্রামে না ফেরার কারণ হয়তো নিজেই। ভাবল তাকে সামনে দাঁড়ানো দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে শেখরের একধরনের আনন্দ হয় এবং সে কারণেই হয়তো গ্রামে ফিরে যেতে ওর ইচ্ছা হয় না। সুশীলা কিন্তু নিজের মনকে বশে আনতে সক্ষম হল না। নিজের মনের যুক্তিতর্কও সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। একটা কথা খোলসা হবার আগেই অন্য কথায় মন চলে যেতে চায়। তারই কারণে তারই সঙ্গে অদৃশ্য বন্ধনের জন্য শেখর গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে না, এ কথা সুশীলা মানতেও চাইল না। সে নিষ্ঠুরহৃদয়া বা বিচারবুদ্ধিতে অপটু নয়। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করা কি নিষ্ঠুর নয়। যদি কোনও মেয়ে সেটা করে তবে? ভাবল, যদি

তাই হয়, তবে আমি কি? কেন এরকম করছি? আমি, আমার গুণ, আমার স্বভাব, সেসব তবে কি? যে কাজটা অনুচিত, তা উচিত ভেবে বার বার করলে সেটা কি সত্য প্রতিপন্ন হয়? আমি কি তাই করতে চাইছি? যে কথা মিথ্যা, সেটা সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যই কি আমি এসব করছি? বাস্তবে ব্যাপারটা যে কি সুশীলা স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারেনি। অহংবোধ স্বভাব কুরে খাচ্ছে তাকে। আর সেই নাম-রূপকে আপন করার নানা প্রতিবন্ধক খাড়া হচ্ছে। যদি সে সেই নাম আর রূপ গ্রহণ করে, তবে? সুশীলার মনে এধরনের বিচিত্র সব চিন্তার উদয় হল। সে কি এক অশিক্ষিত মেয়ে। মনে মনে সে কি খুব বুড়ীয়ে গেছে?

শেখরকে ছেড়ে আসার সময় সুশীলা ভানুকে জিজ্ঞাসা করল 'ভানু, ওর এখানে থাকা কি ঠিক, না গাঁয়ে চলে যাওয়া উচিত? তুই কি মনে করিস।...তোর যেমন মনে হবে, তাই করিস। তুই এই বলিব এখানে থেকে গিয়ে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সে একটা ভুল করেছে। তার কাজের স্পষ্ট দুটো ভাগ রয়েছে—জেনে আর না জেনে করা। আমরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিজেদের ওপর কতগুলো দায়িত্ব ন্যস্ত করি। অবশ্য দায়িত্ব, ঠিক, ভুল ইত্যাদি কথার হয়তো অনেক অর্থই হয়। কথা বলে তোদের শুনিয়ে দিতে পারি। এও জানি যে জীবন আর সমাজ আলাদা। এ সম্বন্ধে সব যথাযথ বলতেও পারব না। যদি বলার চেষ্টাও করি, তোর কাছে সব বাজে কথার মতো শোনাবে।'

কিছুক্ষণ বাদে সে আবার বলল, 'পুরুষ হিসেবে শেখরের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করিনি। পুরুষ...পুরুষত্ব দুটোই আমি ভালোরকম জানি। পালাবার জন্য খুঁজে পেছনের রাস্তা খোলা রেখে বাইরের দরজায় খাড়া হয়ে যে মুরগী চীৎকার করে, পুরুষ তারই মতো। পুরুষত্ব ডানাহীন মুরগীর মতো। আমি শেখরকে মেয়ে মনে করেই কথা বলেছি। একটা মেয়ে সে পুরুষের মধ্যে নারীর শক্তি কি করে প্রত্যক্ষ করবে? এ কারণে তার প্রতি আমার প্রেমও রয়েছে আবার ঘৃণাও। ওর স্ত্রীর নাম তো আমার যা-নাম তাই। আমি কি শেখরের মধ্যে তাকে দেখি? তার নারীত্বকে কি শেখর প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে মেনে নিয়েছে? আমার প্রিয় সখী ভানু, আমি জানি, তুই আমাকে হেলাফেলা করবি না। আমি কাউকে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদতে চাই', বলতে বলতে সে ভানুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সুমতি যে পেছন পেছন আসছিল সেটা ওরা জানত না। সেও গভীর চিন্তায় তন্ময় হয়ে মূক জন্তুর মতো চলছিল।

সেদিন শেখরের কথাবার্তা সুশীলার স্বাভাবিক মনে হয়নি। সুশীলা খুব সরল মনে আর উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিল। এধরনের কথাবার্তার কারণেই যেন শেখরের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা বাধা পড়েছিল। সুশীলা ভাবল পুরুষ কখনও কখনও নিজের উৎসাহ ও কথায় ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। পুরুষের সঙ্গে কোনও মেয়ে—তার স্ত্রী একত্রে থাকে কি করে?...তাকে দেখে এর মনে আনন্দ বা প্রেমের

অনুভূতিই বা জাগে কি করে? মনে যে ঘৃণা জাগায় তার সঙ্গে থাকা সত্যি কি কঠিন! জীবনধারনের জন্য ধর্মের নামে কত কর্মই না করতে হয়। যদি স্বামী চোখের সামনে থেকে সরে যায়, তবেই সম্ভবত স্ত্রী তার প্রতীক্ষায় থেকে আনন্দের অনুভূতি লাভ করতে পারে। সে নিজেকে শেখরের পত্নী সুশীলার জীবনের আধার কল্পনা করে নিল। আর তাই তাকে গাঁয়ে ফেরা থেকে নিরস্ত করতে লাগল। তার মনে হল নির্জন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষটার একটা আশ্রয় হয়তো-বা মিলল। গোড়ায় যে কাজটা তার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল, এখন সেটাই তাকে একটা তৃপ্তির আস্বাদ দিচ্ছে।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সমুদ্রের তীরে-বসা অনেকেই উঠে যাচ্ছে। কিছু লোকের ওঠার তোড়জোড়। শেখর আর মেয়েরা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তেরাস্তা পার হয়ে সামনের সড়ক ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা গলি। সেখানে পৌঁছে শেখর ওদের থেকে আলাদা হয়ে চলতে লাগল। রাস্তা পার হবার সময় বাঁ দিক থেকে একটা মোটরের আওয়াজ এল। ওকে একলা ফেলে মেয়েরা পিছিয়ে এসে ফুটপাথে উঠে পড়ল। রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়ানো শেখর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না এগিয়ে যাবে, না পিছিয়ে আসবে। ভয়ে চকিত হয়ে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ড্রাইভারের অনেক কৌশল সত্ত্বেও গাড়িটা শেখরকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। কেউ তাকে দেখে নি ভেবেই হয়তো ড্রাইভার গাড়ি না থামিয়ে চলে গেল। শেখর গোড়ায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে নিজে আর সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কেউ শেখরকে ধরে ফেলার আগেই 'মৃত্যু' এসে তাকে অধিকার করল...শেখর মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

শেখরের কাছে গিয়ে ভানু ঝুঁকে তার শরীরে হাত বোলাল আর ডুকরে কেঁদে উঠল 'হায়, আমাদের শেখর! বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে।' সুশীলা ধীর স্বরে বলল, 'হায়, আমাদের শেখর!' তারপর সে ভানুকে টেনে দাঁড় করাল আর আস্তে আস্তে বলল, 'আয় ভানু, চল ভিড় বাড়বার আগেই এখান থেকে চলে যাই।' তারপর ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল। সুশীলা স্থির নিশ্চয় হয়েছিল যে শেখর মরে গেছে। 'হায়, রাম', অনাথের মতো ওকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি।' মনের এই ভাবনাটা ভানু ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারল না। চলতে চলতে বুকের মধ্যে গুমরে-ওটা সব চিন্তা সুশীলা ব্যক্ত করতে পারল না। গভীর দুঃখভারে পীড়িত সুমতি ওদের পিছনে পিছনে হাঁটছিল।

সুশীলার মনে হল যেখানটায় তারা দাঁড়িয়েছিল, ক্ষণিকের মধ্যেই সে জায়গাটা শূন্য হয়ে গেছে। এই শূন্যতার পরিবেশে সুশীলা এক প্রাণহীন জীবের মতো হেঁটে চলেছিল। পতি-পত্নীর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়ে এসে দাঁড়াল 'কন্যা সুশীলা।' তাকে 'মৃত্যু' এসে একটা নিদারুণ ঘা দিয়েছে।

□

কিছুদিন হল মেয়েরা সমুদ্রতীরে আর আসছে না। সুশীলা বিকালবেলায় বাড়ির ওপরতলার এক ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোড়ায় তার নিজের চিন্তাভাবই অসহ্য মনে হত। কিন্তু তার অপরিসীম শোক আর অপার আনন্দের অনুভূতিও হত। তার মনে হত নাম-পরিচয়-বিশিষ্ট তার যে রূপ সেটা থেকে তার নাম খসে গেছে আর সেই পরিবেশে সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে। তার মনে হত সেটা যদি আবার সুশীলা নাম গ্রহণ করে তবে কি দাঁড়াবে তার অস্তিত্ব? অন্ধকারে শরীর থেকে পৃথক হয়ে যদি ছায়া পড়ে তবে নিজেই সেটা সেই শরীরেই আত্মগোপন করবে। সুশীলা যখন নিজের নাম আলাদা করে দিয়েছে তখন কি সেই নাম শেখরের স্ত্রীর রূপ নিয়ে তার মনে ঘাঁটি করেছে?

গ্রামের লোকেরা সকাল-সাঁঝে কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। অন্ধকার থাকতে উঠে ঘরের বাইরে জল-ছিটে, ঝাড়ু-লাগানো, আলপনা-আঁকা ইত্যাদি সারতে হয়। রাতে ভালো করে শুতে না পারায় আলপনা ভালো করে দেওয়া যায় নি। পূর্বাকাশে সূর্যকিরণ প্রথম উদয়ের দিকটায় ভালো করে তাকালেও সব দেখা যায় না। রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। সূর্যোদয়ের পূর্বে চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। সে নিজের স্বামীকে দেখতে পাচ্ছিল না। দীর্ঘ দিন শেষ হওয়ার পর রাত আসে। বাচ্চা যখন পা' থেকে না নেমে শুয়ে পড়ে, তখন দিনটা আরো দীর্ঘায়িত হয়ে আসে। যেন দিনের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্যই রাত আসে। সন্ধ্যার কোলে সূর্য লুকিয়ে পড়ে। রাত হলে সে দীপ জ্বালিয়ে দেয় আর বারান্দার কোণায় ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চিমে যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, সে দিকে দৃষ্টিটা প্রসারিত করে দেয়। দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে কিছু দেখতে পায় না। বারান্দা থেকে নেমে এসে সুশীলা সামনের মন্দিরে যায় আর দেবদর্শন সেরে ফেরার সময় দীপটা নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।...এরপর দীর্ঘ রাতের অবসান ঘটে। যদি দুঃখী মন নিদ্রায় ঢলে পড়ে তো সুখ-স্বপ্নের আশা থাকে...তবে ওর এই জীবনে তো বেদনার সুখই সে পেয়েছে।

পশ্চিম দিককার ওপরের ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় কন্যা সুশীলা। নিজেকে দেখে সে নিজের মধ্যেই শেখরের স্ত্রী সুশীলার দর্শন পায়।

স্ত্রী সুশীলা হিসাবে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে প্রেমিক সুশীলা। কন্যা সুশীলা দাঁড়িয়ে থাকে উপর তলায় ঘরের জানালার ধারে।

যদি তা-ই হয়, আর শেখরের ভালোবাসা যদি পেয়েই থাকে, তবে বিয়ের আগেই বিধবা হয়ে যাওয়াটা কি বিড়ম্বনা নয়!

□

ত. না. কুমারস্বামী

১৯০৭ সালে জন্ম। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভাষাতেই তার দখল ছিল। অনুবাদকর্মেও সিদ্ধহস্ত। 'আনন্দ বিকেতন' সাপ্তাহিক তামিল পত্রিকার মাধ্যমে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন।

আংটি

আমার শালা পরশুর বিয়েতে আমি যাই নি। এ নিয়ে আমার স্ত্রী মরকতমের মনে খুব দুঃখ ছিল। তা আমি কি করতে পারি? ঐ গ্রামটাই আমার পছন্দ নয়। ওখানকার বিচিত্র ধরনের সব লোকেদের দেখে আমার মনে ঘৃণারই উদ্রেক হয়। মনে হয় অত্যন্ত অসভ্য ওরা। আমার শালাই এর প্রমাণ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশায় এরা অভ্যস্ত নয়। এদের রসিকতাও খুব নিচু ধরনের। এটা ঠিক যে ঐ জায়গারই একটি মেয়ে বেছে বাবা আমার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছেন। এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, সব বুঝে-শুনেই পরশুর বোন মরকতমকে আমি বিয়ে করেছি। নিয়তি আমার চোখে ধূলো দিয়েছে।

আমার অকাট শালাটির লেখাপড়ার কোনো বালাই-ই ছিল না। হয়তো সাত ক্লাস অবধি পড়েছিল। সে ছিল কিষাণ। আর এ-হেন ব্যক্তি স্ত্রী হিসাবে পেয়েছিল সুন্দরী অম্বুজমকে। অত্যন্ত চালাক চতুর মেয়ে। আপনাদের কাছে গোপন আর কি করব? একে দেখে শালার প্রতি আমার ঈর্ষা হয়েছিল।

পরশুর বিয়ের এক বছর বাদে আমায় শ্বশুর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। এমন একটা সময়ে গিয়েছিলাম যে কেউই তখন আমায় ওখানে আশা করে নি। যখন আমি ঘরে ঢুকছি সে সময় বাইরের বারান্দায় পরশু বসে একটি পাকা কাঁঠাল ছাড়াচ্ছিল। এক হাতে তার তেল আর অন্য হাতে কাঁঠালের ছিবড়ে। আমায় হঠাৎ দেখে সে চমকে উঠেছিল। ছুরিটা উল্টে রেখে সে ভিতরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মা, মা, দেখো কে এসেছে।' মনে হল যেন সে আশেপাশের ক্ষেতের লোকদের কিছু বলছে। আমি বড়ো ঘরের থামের আড়ালে সোনার প্রতিমার মতো এক সুন্দরীকে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। একটু পরে পরশু এসে হেসে বলল, 'বিয়েতে আসেন নি আপনি। যা হোক এখন তো এলেন।' থামের আড়ালের যুবতীটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'অম্বুজা, এঁকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ নাকি? এ তো জামাইবাবু। লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বলেছিলে না একটা গল্প লিখেছ। ওঁকে দেখাও। ইনি এক পত্রিকায় কাজ করেন, ছেড়ো না এঁকে।'

কোন এক শিল্পী দেবতা যেন এই সৌন্দর্য প্রতিমা গড়েছেন। এ ঠিক এ সংসারের জন্য নয়। ওকে সামনে দাঁড়ানো দেখে মনে অদ্ভুত একটা বেদনা বোধ করলাম।

কিছুক্ষণ বাদে আমার শাশুড়ী সেখানে এলেন আর বললেন, 'এতো, শেষ অবধি যা হোক তুমি আমাদের এখানে আসতে রাজী হয়েছ। এতে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। মরকতম আর ছেলেপিলেরা সব ভালো আছে তো? বিয়েতে তুমি না আসায় আমাদের খুব দুঃখ হয়েছিল। তুমি এলে আমাদের কত ভালো লাগত।'

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে 'অনেক কাজ ছিল, ফুরসৎ হয় নি' বলে ওঁর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

এই সময় পাকা কাঁঠালের দুটো কোয়া নিয়ে পরশু এসে দাঁড়াল।

এ-সব দেখে শাশুড়ী বললেন, 'আরে, এগুলো এখন থাকুক। এখনো তো ওর হাতমুখ ধোওয়া হয় নি। পরে দিস।'

শাশুড়ীর কথা শুনে অম্বুজম কুয়োর দিকে ছুটল। আমার জন্যে সাবান আর তোয়ালে রেখে যখন সে ফিরে আসছিল, আমি তখন ওদিকে যাচ্ছিলাম। আমায় দেখে সসংকোচে হঠাৎ সে বলল, 'ওখানে সাবান, তোয়ালে সব-কিছুই রাখা আছে।' মনে খুব তীব্র আকাঙক্ষা জাগল যে ভালো করে ওকে দেখি। কিন্তু কুলীন ঘরের বউ তো, আবার আমার শালার বউও বটে!

আমার কাছে আসার পর বছর দু-তিন মরকতম তার মায়ের কাছে যায় নি। অর্থাৎ আমিই ওকে যেতে দিই নি। ফলটা ভালোই হয়েছিল। নিরক্ষর ও গাঁইয়া বউ লেখাপড়াটা শিখে নিয়েছিল। কাজকর্মেও আমায় সাহায্য করতে শুরু করেছিল। টানা হাতে কিছু লেখা থাকলে পরিষ্কার করে লিখে সে আমায় তা নকল করে দিত। আমার কাছে পর্যালোচনার জন্য যে-সব গল্প আসত সেগুলো পড়ে সার-সংক্ষেপ বানিয়ে রাখত। এভাবে হয়ে উঠেছিল যোগ্য ও শিষ্ট।

পরশুর বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি ও নিমন্ত্রণ দুই-ই আমার কাছে এসেছিল। চিঠিতে অনুরোধ ছিল যেন আমি সবাইকে নিয়ে ঈশ্বর-পূজা আর সোহাগ-পূজার দশ দিন আগেই পৌঁছে যাই।

বিয়ের ব্যাপারে মরকতমের সঙ্গে আমি কোনো কথাই বলি নি। মনে মনে ভেবেছি, 'পরশুর তার নিজের মতোই আর-এক গাঁইয়া বউ জুটবে। এতে উৎফুল্ল হবার কিছুই নেই।'

অনেক রাত অবধি আমি বাইরের বারান্দায় বসে বসে লিখছিলাম। ভিতরে এসে শুয়ে চোখ বুজতেই মনে হল মরকতম আমার মাথায় হাত রেখেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার মরকতম?' আমার হাতটা ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাঁদছ কেন?'

'না, কিছু না।'

'কি বলতে চাইছ আর কাঁদছই বা কেন? ভাইয়ের বিয়েতে কি যেতেই হবে?'

সে কোনো জবাব দিল না। আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'বোকা কোথাকার! বাচ্চাদের নিয়ে তুমি যাও তোমার ভাইয়ের বিয়েতে। নতুন বউয়ের ননদ তুমি। উপহার দেবার জন্য একশোটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু যেতে পারব না, অনেক কাজ রয়েছে। এসময় আমার চৈত্রের বিশেষ সংখ্যা বের করতে হবে। তুমি বেশ মজা করে ঘুরে এসো।'

'তুমি যাবে না? তুমি গেলে কনেপক্ষের সামনে আমি বেশ গর্বভরে মাথা উঁচু করে চলতে পারতাম।'

আমি জবাব দিলাম, 'আমি যেতে পারছি না। তুমি যাও।'

আমার কথামতো ভাইয়ের বিয়েতে মরকতম বেচারী একাই গেল আর ফিরে এল।

আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিয়ে ঠিকঠাক মতো হল তো? কনে ভালো দেখতে?'

মরকতম উত্তর দিল, 'তুমি গেলে না তাতে মার খুব দুঃখ হয়েছে। এ মেয়ের মতো সুন্দরী আমি আজ পর্যন্ত আর দেখি নি। ও ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি পড়েছে। পরশু সত্যিই খুব ভাগ্যবান।'

'সত্যি? খুব সুন্দর দেখতে? আবার লেখাপড়াও জানে?'

'অম্বুজম কেবল সুন্দর-ই নয়, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার মতো মেয়েও বটে।'

'তবে তো একবার গিয়ে ওকে দেখতে হয়।'

'হ্যাঁ, যাব যাব' এ-সব কথা বলতে বলতেই চলে গেল এক বছর। তারপর হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হলাম। অম্বুজমকে দেখে আমার মনে হল যে মরকতমের বর্ণনাই সত্যি, খুবই রূপবতী সে। মন বিচলিত করার মতোই সৌন্দর্য। ওর স্বামী পরশু একেবারেই ওর যোগ্য নয়। আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকা যেন বহুমূল্য মণিমুক্তা।

দুবিঘা জমিতে বীজ বোনার কাজ ছিল। তাই পরশু আমায় বলল, 'জামাইবাবু, আপনি কোনো সংকোচ করবেন না। আমার ফিরতে দেরি হবে। আপনি আর আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি বিনা সংকোচে অম্বুজমের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। ও একটা গল্প লিখেছে। আজকের রান্নাও ওই করেছে। আয়োজনও প্রচুর। আজ ভোজ না?' এ-সব বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্নানের পর বাইরের চাতালে এসে বসলাম। বেলা প্রায় দশটা। থামের পাশে দাঁড়িয়ে অম্বুজম বলল, 'আসন দেওয়া হয়েছে, খেতে আসুন' বলে আমায় উঠে আসার ইঙ্গিত করল।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেণ্ডার দেখার ভান করে আমি বললাম, 'যাক-না আরো কিছুক্ষণ,' মনে হল অম্বুজম পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই আমি মুখটা ঘুরিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, সে ওখানেই ছিল। ঘরে কোনো আওয়াজ নেই। কাছেই কোনো গাছে বসা কাঠ-ঠোকরার কুক্-কুক্ আওয়াজ অবিরাম কানে আসছিল। আবার আমি ওর দিকে তাকালাম। একটু কেশে নিয়ে আমি বললাম, 'পরশু বলছিল যে তুমি নাকি গল্প লেখো। সাহিত্যে রুচি আছে মনে হচ্ছে।'

লজ্জায় তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। লজ্জামিশ্রিত মধুর স্বরে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সব গল্প-উপন্যাসই পড়েছি। দিদি বিয়েতে এসে আমাকে আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত বইটা দিয়েছিলেন। স্কুলে পারিতোষিক হিসেবে আমি একবার আপনার বই পেয়েছিলাম। আমার খুব ইচ্ছা হয় যে আমিও গল্প লিখি। দুটো লিখেওছি। জানি না কেমন হয়েছে। আপনাকে দেখাতে আমার লজ্জা হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এতে লজ্জার কী আছে? নিয়ে এসো ওগুলো।'

অম্বুজম চট করে নিজের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজের একটা বাণ্ডিল নিয়ে এল। সেটা আমার হাতে দেবার সময় ওর হাতের আঁচল আমার আঙুল ছুঁয়ে গেল। মনে হল শরীরের মধ্যে একটা বিদুৎ-শিহরণ জাগল। মনকে কঠিনভাবে বশ করলাম। নিজেকে বোঝালাম যে এ কুলীন ঘরের বউ। আমার শালা-বউ। আমি ওর লেখা পড়লাম। বেশ ভালোই। আমি বললাম, 'সাবাস্। তোমার লেখার ধরনটা খুব সুন্দর। আমার মনে হচ্ছে আজকালকার ছাত্রদের মতো তুমিও প্রেমের গল্প লিখেছ। তুমি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম্য পরিবার জীবনের বড়ো সুন্দর বর্ণনা দিয়েছ।'

এই অবোধ বালিকা লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। পরক্ষণেই মাথা তুলে, সুন্দর দাঁত দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এ-সব গল্প কি পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত?'

সে-সময় আমার শাশুড়ী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। 'কি অম্বুজম, খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?' বলে ওকে সচেতন করে দিলেন।

'সব তৈরি আছে,' বলে অম্বুজম ভেতরে চলে গেল।

আমার শাশুড়ী বললেন, 'তুমি খেতে চলো। পরশুর ফিরতে আরো দেরি আছে।'

অম্বুজম পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির সঙ্গে আমায় খাওয়াল। ওপাশে শাশুড়ী—'এটা দেখো, ওটা করো, বলে নানা আদেশ দিচ্ছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমায় ফিরতে হল শহরে। যদিও সে গ্রাম আমার পছন্দের নয়, তবুও আরো দুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। ফেরার সময় মনটা ভার হয়ে রইল।

সেইদিনের পর আজ তিন বছর বাদে আবার অম্বুজমকে দেখছি। মাঝের এসময়টুকুর মধ্যে কত কী যে পরিবর্তন ঘটে গেল! ইতিমধ্যে হঠাৎ বিষম জ্বরে পীড়িত হয়ে পরশু মারা গেছে। আমার অবোধ, নির্দোষ শালা অত্যন্ত স্বল্পায়ু ছিল।

যে বিধাতা অম্বুজমকে এত সৌন্দর্য আর জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু ওকে সুখ দেন নি। ভাগ্য হেনেছে ভয়ংকর এক আঘাত।

বড়ো ভাইয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে মরকতম মুষড়ে পড়েছিল। মা আর ভাই-বউকে সান্ত্বনা দিতে সে নিজের গাঁয়ে গিয়েছিল। এবারে সত্যি সত্যি কিছু জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় আর আমি যেতে পারি নি।

মরকতমের ফেরার পর আমি গিয়েছিলাম গাঁয়ে। ঘরে পা দিতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে কেঁপে উঠলাম।

অম্বুজম ভেতরের বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে ছিল। কপালে কুঙ্কুমের টিপ ছিল না। শরীর অনেক ঝরে গিয়েছিল। আমায় দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার চোখও জলে ভরে উঠল।

আমি বললাম, 'কি ভয়ানক অবিচার এটা! আমি কখনো ভাবি নি যে এমন একটা কিছু ঘটবে।'

অম্বুজম আমার সামনে দাঁড়াতে পারল না। ভেতরে চলে গেল। সেখান থেকে তার ফুলে ফুলে কান্নার আওয়াজ আসছিল। কিছুক্ষণ বাদে পুত্রহারা জননী, আমার শোকাতুরা শাশুড়ী এলেন আমাব সামনে। 'আমার ছেলে পরশু আমায় ধোঁকা দিয়েছে। সোনার প্রতিমার মতো অম্বুজমকে ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে গেল। কী জানি কী কাল-রোগে তাকে ধরেছিল। দুদিনে তার ধরন-ধারণ সব বিগড়ে গেল আর চলে গেল।' এই বলে আবার তিনি কাঁদতে লাগলেন।

আমি ভেবে পেলাম না এদের কী বলে সান্ত্বনা দেব। আমার চোখের সামনে থেকে থেকে অম্বুজমের সেই প্রথমবারের রূপটাই ভেসে উঠছিল।

সেদিন বিকালে সাড়ে চারটার গাড়িতে শহরে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। হাঁটতে শুরু করেছি এমন সময় পাশের বাড়ির একটি ছোটো মেয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'মামাবাবু, অম্বুজম মাসী আপনাকে একটু দাঁড়াতে বলেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই কোথায়?'

ওই মেয়েটি বলল, 'ওই বাইরের ঘরে রয়েছে।' খুব শঙ্কিত চিত্তে সে ঘরে ঢুকলাম। অম্বুজম চৌকাঠের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আমায় দেখে সে বলল, 'আমায় একটু সাহায্য করবেন? ঘরে পয়সার টানাটানি চলেছে। আপনার কাছে চাইতে লজ্জা করছে। একশোটা টাকার এখন দরকার। এই আংটিটা বন্ধক রেখে আমায় টাকাটা দিন,' ওর চোখ জলে ভরে উঠল।

কথা বলতে বলতে যখন সে নিজের আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলছিল, তখন আমি বললাম, 'আংটির কী প্রয়োজন? যে টাকা তোমার দরকার, তার অর্ধেক আজ দিয়ে দিচ্ছি, বাকীটা কাল মনিঅর্ডার করে তোমার নামে পাঠিয়ে দেব।' আমি বটুয়া থেকে পাঁচ টাকার দশখানা নোট বার করে ওকে দিলাম।

'না, এই আংটিটা আপনিই রাখুন' বলেই আমার হাতে সে গুঁজে দিল সেটা। আমি আমার পকেটে সেটা রাখলাম। এর পর আর সে দাঁড়াল না সেখানে। ওর ফেরার অপেক্ষায় অনর্থক কিছুক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিকাল সাড়ে চারটার গাড়িটা চলে গেল। পরের গাড়ি সাড়ে ছটায়। সেটায় যাবার জন্য তৈরি হতে শাশুড়ী এসে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া করে কাল সকালের গাড়িতে যেয়ো।'

আমি জবাব দিলাম, 'না, আমার আজ যাওয়া খুবই দরকার।'

আমার শাশুড়ী বললেন, 'অম্বুজম বোধহয় তোমাকে সব বলেছে। বড়ো কষ্টে আছি আমরা আজকাল। সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।'

আমি উত্তর দিলাম, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা তবে রয়েছি কেন, মা?'

আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। বিষয়ান্তরে মনটা ফিরছিল। ঘুম আসছিল না। অম্বুজমের আংটিটা আমার কড়ে আঙুলে ঠিক হয়েছে। ওজনে হয়তো সেটা আধ গিনির মতো কিন্তু টাকায় দাম নিরূপণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেটার ওপর খোদাই করা 'অ' অক্ষরটা যেন আমার হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন পঞ্চাশের বদলে একশোটা টাকা অম্বুজমের নামে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। একশো কেন এক হাজার টাকা পাঠাতে মন চাইছিল।

এক সপ্তাহ বাদে আমার কাছে অম্বুজমের একটা চিঠি :

> **নমস্কার।**
>
> **সময়ে আপনি আমায় সাহায্য করেছিলেন। সেজন্য ধন্যবাদ। আধা একর জমি বিক্রি করেছি। টাকা পেলে আপনারটা পাঠিয়ে দেব।**
>
> আপনাদের
> অভাগিনী
> অম্বুজম।

চিঠিতে আংটির কোনো উল্লেখ ছিল না।

আমি কী করি? আমার কাছেই সেটা রাখব না ফেরত পাঠিয়ে দেব? আবার গিয়ে কি ওর সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে? কোনো কিছুই আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

□

তুরণ (এম. পি. পৈরিয়স্বামী)

১৯০৮ সালে জন্ম। বহু বছর স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পর 'কলৈক্কলনিজ্যয়ম' নামক তামিল বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক পদে কাজ করেন। এসময় ছোটদের জন্যও সেরকমেরই একটা বিশ্বকোষ প্রস্তুত-কর্মে লিপ্ত হন। তামিল ভাষায় অসংখ্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, শিশু সাহিত্য তথা গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বদখত জানোয়ার

ভীষণ গরম পড়েছিল। পীচ-ঢালা এই চওড়া সড়কটা যেন অগ্নি বর্ষণ করছিল। সড়কের ধারেই এক বিশাল তেঁতুল গাছ চুপচাপ সটান দাঁড়িয়ে। গরমে এর ছায়াটুকুও যেন তেতে উঠেছিল। তবে এই ভয়ংকর গরম এড়াতে এখানে এই গাছের ছায়াটুকুর চেয়ে ঠাণ্ডা আর কোনো জায়গা ছিল না। নিজ নিজ গোরু এই গাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রাখালেরাও গাছের তলায় শুয়ে ছিল। ওদের শরীর থেকে ঝরছে দরদর ধারায় ঘাম। খাড়া-শিং-ওয়ালা এই বলদটাও চুপ করে বসে ছিল। গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেবার পরেও এর চোখের জলের বিরাম নেই। এর সারা শরীর জুড়ে চাবুকের দাগ।

চোখা-শিং-ওয়ালা এই বলদটা বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছিল। শিং দুটো এর খুবই তীক্ষ্ণ হওয়ায় কিষানেরা এর এই নাম দিয়েছিল। জন্ম থেকেই এটা এ অঞ্চলে সুপরিচিত। এই জায়গাটায় পৌঁছে হঠাৎ হাম্বা রব ছেড়ে বলদটা বসে পড়ল। এর সাথী বলদ লম্বু কাছে কোথাও দাঁড়িয়ে এই আওয়াজটা শুনতে পেল। জমির আল পেরিয়ে পড়ি-মরি হয়ে সে ওর পাশে এসে পৌঁছল। আর চাবুকের চোটে ফুলে-ওঠা ওর পিঠটা সে জিভ দিয়ে আস্তে আস্তে চাটতে শুরু করল।

এপাশে ওপাশে গোটা বিশ-ত্রিশ বুড়ো বলদ আর দুধ শেষ হয়ে যাওয়া গোরুও ছিল। ওদের কারোরই রাস্তা জানা ছিল না। রাখালদের চাবুকের ভয়ে, যে দিকে যাওয়ার ইশারা, সেদিকেই এরা চলেছিল। যেতে যেতে রাস্তায় যা-কিছু মিলছিল, সে-সবই এরা তাড়াতাড়ি মুখে পুরে দিচ্ছিল। পরে এখানে বসে সব জাবর কাটতে লাগল। মানুষের পেট বাচ্চাদের মতোই বোঝাই, কিন্তু বলা যেতে পারে গোরুর পেট গোটা শরীর জুড়ে। তাই তারা কিছু পেলেই তা খেয়ে ফেলে।

'এই লম্বু! আমরা দুজনে সামনের এই ক্ষেতটায় কাজে এসেছিলাম, চিন্তা করে মনটা কেমন আনন্দ-ভাবনায় ভরে ওঠে। তোর মনে আছে একদিন রাত্রে একটা মজুর আখ ক্ষেতে জল সিচাই করতে করতে ঘুম জড়ানো চোখে তোর ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তোর ভয় হল পা উঠিয়ে নিলে, মজুরটা পড়ে যাবে। তুই ওর ভার

সহ্য করে সেই বিশাল জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলি। তাই না?' ক্লান্তি-জড়তা সত্বেও চোখা-শিং-ওয়ালা বলদটা সোৎসাহে প্রশ্ন করল সঙ্গীটিকে।

লম্বু ক্লান্তভাবে বলল, 'এসময় ওসব-কথা কী বলছিস? তোকে এখন দেখে আমার যা আনন্দ হচ্ছে তা আর বলতে পারি না। তবে এখন ফালতু কথা বলে আর সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'হ্যাঁরে, আচ্ছা তুই আমায় খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে গেলি কি করে?'

'আমার কিষানের ক্ষেতটা কাছেই না? সেখানে দাঁড়িয়ে তোর আহ্বান শুনতে পেলাম। তা এখানে না এসে কি থাকতে পারি? আল ভেঙে দৌড়ে চলে এলাম।'

কন্দপ্পন পুদ্দুর শহরের সমীপবর্তী এই বড়ো সড়কের ওপর, খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া দুই বলদের যাবাতীয় ভাবনা নীরব ভাষায় প্রকাশ পেল। এই শহরটি, মাদ্রাজের সন্নিহিত ইরোড থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহরের এক কিষান এ বলদটিকে আগের দিন ইরোডের বিষ্যুৎবারের হাটে এনে বেচে দিয়েছিল। কসাইয়ের সম্পত্তি হিসাবে এটি আপাতত অন্যান্য গাই-বলদের সঙ্গে এই বড়ো সড়ক ধরে কেরল অভিমুখে যাচ্ছিল। গো-পালকের বিশ্রামহেতু হঠাৎ এরা এই তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

চোখা-শিং-ওয়ালা বলদটা আড়মোড়া ভেঙে মুখ ঘষে শুয়ে পড়ল। লম্বু গা চেটে দেওয়াতে মন তার এক সুখানুভূতিতে ভরে উঠল।

'ভাই, এরা না জানি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? কতদূরই বা যেতে হবে কে জানে? চাবুকের বাড়িগুলো বড়ো লাগে। আমাকেই সবচেয়ে বেশি মার খেতে হয়।'

'হ্যাঁ, তুই খোঁড়া কিনা। আর মারের হাত থেকে বাঁচার জন্য এগিয়েই বা যাবি কি করে?' এ কথা বলতে বলতে লম্বুর চোখও জলে ভরে এল।

অন্য কোনো চিন্তা না করে, বলদের এই জোড়াটি কয়েক বছর একটানা অহোরাত্র তারা তাদের কিষানদের সেবা করেছে। চোখা-শিং-ওয়ালার বাঁ দিকের পেছনের পায়ে একবার একটা পেরেক ঢুকে গিয়েছিল। মালিক তো গোড়ায় ব্যাপারটা আমলই দেয় নি। অনেক দেরিতে চিকিৎসা করানোর দরুন পা-টা সারে নি আর সেটি খোঁড়া হয়ে যায়। তাই সেই কিষান ইরোডের হাটে গিয়ে কেরলাগত কসাইয়ের কাছে একশো টাকায় এই বলদটিকে বেচে দেয়।

কেরল যাবার রাস্তাটা কন্দপ্পন পুদ্দুরের ধার দিয়ে গেছে। সে কারণে আবার দেখাসাক্ষাতের একটা সুযোগ হল।

লম্বু জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি মনে আছে গত বছর চার একর জমিতে মালিক হলদীর চাষ করেছিল?' একটু আগে সে নিজেই বলেছিল যে এ-ধরনের কথাবার্তা না বলাই ভালো। তবে বলদদের কথাবার্তার অন্য বিষয়ই বা কি থাকতে পারে?

'সে কথা কি এত শীগগিরই ভুলে যেতে পারি? হলদীর জন্য তো অনেক জলের দরকার হয়—আমি তো সেই সিচাই-র কাজই করেছিলাম।'

'আমি তো গাড়ি বোঝাই করে সার এনে ফেলেছিলাম। তাতেই তো প্রচুর হলদী হল।'

'সে বছর হলদীর দামও চড়া ছিল। তাতে আমাদের কিষানের অনেক টাকা উপার্জন হল', নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে চোখা-শিং-ওয়ালা বলদটা বলল।

'তুই তো সিচাইয়ে কিষানকে সাহায্য করলি', চোখা-শিং-ওয়ালাটা এ কথা বলতেই লম্বু বলতে লাগল, 'তুইও তো আমার সঙ্গে থেকে কাজ করলি। তাই না? আমাদের মেহনৎ-এর দরুনই তো কিষানের বটুয়ায় বেশ সহজেই অনেকগুলো একশো টাকার নোট জমা হল।'

এমন সময় গো-পালকদের মধ্যে দুজন জেগে গেল। এরা বিড়ি গুঁজল মুখে। তারপর ওদের কথাবার্তা শুরু হল।

'তুই এ লোকটাকে দেখেছিস? সে পরের বছর এই দ্বিতীয় বলদটাকে বেচবে বলেছিল।'

'কোন্ লোকটা?'

'ওই যে নিজের গাড়ি নিয়ে হাটে এসেছিল। গাড়িতে একটা বলদই জুতেছিল। সে বলেছিল আরো এক বছর ওই বলদটাকে দিয়ে কাজ করাবে, তারপর ওটাকে বেচে দেবে।'

'ওই বলদটার জন্য পঞ্চাশ টাকা দামটা একটু বেশি নয় কি?

'আরে, লোকটা খুব চালাক। তখন বলেছিল যে পরের বছর পঁচিশ পেলেই অনেক হবে।'

'সামনের বছর অবধি বলদটাকে কাজ করিয়ে দুশো টাকা আরো কামিয়ে নিয়ে তারপর ওটাকে বেচবার মতলবে আছে।'

'হিসাবকড়ির ব্যাপারে লোকটা তো খুব দড়। বলদ ঘেমে নেয়ে একাকার, এমন কি নির্জীব হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেও, ও কিন্তু ঠিক কাজ করিয়ে নেবে। তারপর বলদের দাম যা-ই পাওয়া যায় তাতে কি? সে ওই পয়াসাটুকুও ছাড়বে না।'

লোকগুলো সেই গাই-বলদের পালকে কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ও বলদগুলোর উপর নির্দয়ভাবে চাবুক চালাচ্ছিল। লোকদুটির কথাবার্তা যদি চোখা-শিং-ওয়ালা আর লম্বু বুঝতে পারতো তবে সব শুনে নিশ্চয়ই এরা খুব চমকে উঠত। সংসারে একজনের কথা আর-একজন বুঝতে পারে না। তা যদি হত, তা হলে নানাকথা স্পষ্টভাবে বলা বা তাতে নিষেধ আরোপ, বিস্তারিত আলোচনা এবং সে প্রসঙ্গে যাবতীয় বাদ-বিসম্বাদের অবকাশ আর থাকত কোথায়? যদি মানুষেরই এই অবস্থা হয়, তবে মানুষ সম্পর্কে বলদের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করা তো আরো দূরের

ব্যাপার। এক হিসাবে দেখতে গেলে এটাই ভালো। পথ চলার শেষ পরিণাম আগে জানা থাকলে সেটা কি ভালো?

চোখা-শিং-ওয়ালা আর লম্বুর আগেকার কথাবার্তার বিষয়ে কিছুই এদের জানা ছিল না, দুজনে দুজনের অজ্ঞাতেই একে অন্যকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মানুষই সব কথার খবর পায় না, তা বলদ জানবে কি করে?

বিড়ি জ্বলে জ্বলে তাড়াতাড়ি ফুরয়ে এল। আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখা বিড়িতে হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই এরা বিড়ির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল।

চোখা-শিং-ওয়ালা লম্বুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'পক্ষাঘাত হওয়ায়, কিষানের বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল না?'

'হ্যাঁ, সেসময় আমি সেই সওয়ারী নিয়ে রোজ দশ মাইল দূরের হাসপাতালে যেতাম আর নিয়ে আসতাম। তিন বছর একটানা সে কাজ আমি করেছি। একদিনও কাজে কামাই করি নি...।'

'ভোরে ক্ষেতে অনেক কাজ করতে হত। আর বিকেলে সবাইকে নিয়ে দশ মাইল দূরে হাসপাতালে যেতে হত। ফেরার সময়ও দশ মাইল।'

'পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবাকে কিষান আপ্রাণ সেবা করেছিল। কিন্তু রোগী আর চলাফেরা করতে সক্ষম হল না। কাবেরী নদীতে তার অস্থি বিসর্জনের জন্য তো আমার গড়িতে চড়েই গিয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ায় বেচারা কিষান ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল।'

যখন বলদটা এ-সব কথা বলছিল, তখন শ্রান্ত ক্লান্ত মালিক কিষানটি এখানে পৌঁছুল। ভেবেছিল সেদিন এই লম্বুর সঙ্গে অন্য একটা বলদ হালে জুতে ক্ষেতের কাজ সেরে নেবে। জুতবার সময় গোয়ালঘরে এটাকে পাওয়া গেল না। হালের কাছাকাছিও দেখা গেল না। খুঁজবার জন্য কিষান চারিদিকে নিজের লোক পাঠাল। রাস্তার ধারে এই তেঁতুলতলায় কিছু বলদ দাঁড়ানো দেখা গেল। শেষে পান চিবুতে চিবুতে সে এদিকে ধীরে ধীরে এল। এখানে পৌঁছেই তার নজর পড়ল লম্বুর ওপর।

'আচ্ছা, ওই ল্যাংড়াটার সঙ্গে তোর এত ভাব কেন? এদিকে তোকে আমি কোথায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোর জন্যে মজুরদের কাজ বন্ধ। তোকে আচ্ছা করে পিটতে হবে।' এই বলে সামনের ঝাড় থেকে মোটা একটা ডাণ্ডা ভেঙে নিল। সেটা নিয়ে সে তেঁতুল গাছের কাছে লম্বুর দিকে উঁচিয়ে গেল।

এমন সময় সেখানে কোথা থেকে একটা কুকুর এল। কিষানকে তেড়ে কামড়াতে গেল। দেখে মনে হল পাগলা কুকুর। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিষান নিজেকে সামলে সরে যেতে পারল না।

তাড়াতাড়ি চোখা-শিং-ওয়লা বলদটা কুকুরটাকে তেড়ে এল। কুকুরের কামড়-জনিত ঘায়ের কথা না ভেবেই, কুকুরটার দিকে এগিয়ে সে এক টুঁ মারল তার চোখা

শিং দিয়ে। কে জানে এ সময় তার এত শক্তি জোগাল কোত্থেকে? পাগলা কুকুরটার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় দৌড়ঝাঁপ করার দরুন, সে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিল। লম্বা শ্বাস নিতে নিতে সেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। পাগলা কুকুরটার কামড়ে ওর পায়ে যে ঘা হয়েছিল সেটা লম্বু এসে জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল। এভাবেই সে তার ঘায়ের যন্ত্রণায় আরাম নিতে চাইছিল।

কিষান বুঝতে পেরেছিল যে পাগলা কুকুরের কামড়ানো ঘা চেটে লম্বু নিজেও পাগল হয়ে যাবে।

এখন এ-বলদটাও আর কাজের রইল না।

পাগলা কুকুর আর বলদের লড়াইয়ে আর চিৎকারে প্রায় সব গো-পালকেরাই জেগে গেল!

কিষান ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাই চোখা-শিং-ওয়ালাটার জোড়া তোমাদেরই চাই?'

'আমরা তো কালও চেয়েছিলাম। তুমি মানা করে দিলে।'

'আজি ঠিক করেছি বেচব। কী দাম দেবে?'

'ওই একশোই দেব। ওই একই জোড়ের তো!'

'আচ্ছা, তাই দাও' বলে কিষান টাকাটা ধুতির খুঁটে বাঁধল।

এই বলদ-জোড়া অন্যান্যগুলোর সঙ্গে কেরলের দিকে চলল। চাবুকের মার দিয়ে যাত্রার সূচনা হল।

লম্বু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে পাগলা কুকুরের হাত থেকে মালিককে রক্ষাকারী চোখা-শিং-ওয়ালার সঙ্গে চলতে পেরে তার খুব আনন্দ! এই গো-পালের সঙ্গে ওকেও কেন ছেড়ে দিল, সেটা সে জানতে পারল না। এবিষয়ে ভাববার আগেই পিঠে চাবুকের বাড়ি পড়ল একটা। চোখা-শিং-ওয়ালার ওপর পাঁচ-ছ'বার।

'কেমন বদমাইস এই বলদটা! কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে কেমন দৌড়েছে আর এখন খোঁড়া হয়ে পড়েছে! পাজী কোথাকার!' বলতে বলতে এক গো-পালক বলদগুলোর পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

তি. জ. রঙ্গনাথন

জন্ম ১৯০১ সালে। লবণ সত্যাগ্রহের জন্য ১৯৩৩ সালে কারাবরণ করেন। বহু পত্রিকায় লিখেছেন। 'মঞ্জুরীর' সম্পাদক ছিলেন। তাঁর গল্প বহু তরুণ লেখককে প্রভাবিত করেছে।

গোরুর গাড়ি

তেঁতুল গাছটার ছায়ায় পড়ে থাকা জরাজীর্ণ ওই গোরুর গাড়িটা রত্নস্বামীকে না জানি কত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গাড়িটা ছিল ছোটো আকারের...বলা হত 'মাইনর গাড়ি'। মাইনর অর্থে কম বয়সের নয়। বড়ো ঘরের অল্পবয়স্ক স্ফূর্তিবাজ ছেলেদের কি মাইনর বলা হয় না? তেমনি এক মাইনরের জন্য তৈরী করা হয়েছিল গাড়িখানা। ক্রমে 'মাইনর গাড়ি' নামেই এটা পরিচিত হয়ে উঠল।

এটার দিকে তাকিয়ে কোমলাক্ষী এক রূপবতী যুবতীর চেহারা চোখমুখ আর চোখের উজ্জ্বলতার কথা ওর মনে পড়ে গেল। আর এ কথা মনে হতেই এক অপরিসীম বেদনায় মনটা ভরে উঠল। বেদনা ছাড়া অন্য কোনো ভাব মনে জাগল না।

হায়, এ-গাড়ি এখনো এখানে পড়ে রয়েছে কেন? কেন এটা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেল না? এটা যে বানিয়েছিল সে মরে গেছে, এটার মালিক মরে গেছে...সে মেয়েও মরে গেছে। পৃথিবীর বুক থেকে সব চিহ্নই মিলিয়ে কিংবা ঝাপসা হয়ে যায়। জলে অথবা হাওয়ায় সব মিশে যায়। সেদিনের সব চিহ্নের মধ্যে আজ দুটো হারিয়ে যাওয়ার পথে—একটা এই গাড়ি আর অন্যটা রত্নস্বামী স্বয়ং। ধরণীর পরে চিহ্নটা কি। যদি সেটা দৃশ্যমান, তবে কি সেটা সদাসর্বদার জন্য? আমরা সবাই সংসারে আসি অজ্ঞান বা অন্ধবিশ্বাসীরূপে। আর এসে মায়ায় জড়িয়ে পড়ি। আমরা সব আসি কোথা থেকে? নিশ্চিতভাবে কি বলতে পারি আমাদের আগমন কোথা থেকে? তবে কি মানুষও হাওয়ায় ভেসে যাওয়া জলধারা উদ্ভূত গল্পের সেই বুল্‌বুলি পাখির মতো? বোঝা কঠিন। যে এই কথা জানে বা জানে বলে দাবী করে তার বক্তব্যও বিশ্বাস করা কঠিন। সংসারের এই মায়া কি বাজে কথা, না সত্যি? মিথ্যা কথায় কলঙ্ক আরোপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেটা কলঙ্কজনক ব্যাপার। মিথ্যার ওপর দাগ লাগে না। তবুও তার একটা পূর্ণ চেহারা পাওয়া যায়। সংসারই কি সত্য? সত্য সর্বদাই কলঙ্কমুক্ত। এ জগতে সত্যও রয়েছে, মিথ্যাও। সত্য মিথ্যা মিলিয়ে দুনিয়া। সংসারে যা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়, সেটা মিথ্যা। আর যা অস্পষ্ট সেটাই সত্য।

এই ভাঙাচোরা গাড়িটাকে দেখে এক দিকে যেমন রত্নস্বামীর মন বেদনায় ভরে

উঠল, অন্যদিকে একটা দার্শনিক চিন্তায়ও যেন তাকে পেয়ে বসল। গাড়ির ওপর ছায়া বিস্তার করেছে যে তেঁতুল গাছটা সেটাও এক সময় কত বস্তা বোঝাই তেঁতুল দিয়েছে। এ গাছেরও আজ বার্ধক্য দশা। এখন এ-গাছে কেবলমাত্র জ্বালানীর কাজই হয়। এই তো মায়ার রহস্য আশ্চর্যজনক তত্ত্ব! সেই যে হাসিখুশি মেয়েটা সকালে এসে ঝরে পড়া তেঁতুল থেকে কিছু বাছাই করে নিয়ে যেত, তাকে তো সে অনেকবার দেখেছে। কখনো কখনো সে নিজেও তাকে সেই বাছাইয়ে সাহায্য করেছে। তখন সে জানত না যে ভবিষ্যতে তাকে আরো ঘটনায় এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। ও কি তবে বিষয়টা জানত? সে কি গোড়া থেকেই ঘটনা কি কি ঘটবে জানতে পেরেছিল? কিন্তু জানবে কি করে সব কথা? না, কখনোই কিছু জানত না। এ কথা নিশ্চয় করেই বলা যায়। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাছুর যেমন ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে মায়ের পেছনে পেছনে যায়, তেমনি বাচ্চা মেয়ে সরযূও শাড়ীর আঁচল দাঁতে কামড়ে ধরে মার পিছু পিছু যেত। এ দৃশ্য কি ভুলবার? সেই সরযূ আজ কোথায়। কেমন আছে? কিছুই জানা নেই। লোককে জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানা যায় নি। আশেপাশে যারা থাকত এখানে আজ তারা কেউই নেই। প্রায় ত্রিশ বছর বাদে গাঁয়ে ফিরলে তো এই অবস্থাই হয়। তাই না?...পূর্বের পরিচিত কোনও চেহারাই আর আজ দেখা যাচ্ছে না! হ্যাঁ,...এই তো সংসার!

সুন্দর জিনিসে আমরা সব সময় আনন্দ পাই। তা বলে কি সেটা অবিনশ্বর? দেবীপ্রতিমার মতো ওই যুবতী তবে মরে গেল কেন? রাস্তার শোভা, রথের মতো দেখতে ওই গাড়িটি কেন তবে জীর্ণ-দশায় পড়ে রয়েছে এভাবে? একদা সবুজ পাতায় ছাওয়া ফুল-ফলে ভরা এই তেঁতুল গাছ আজ ঠুঁটো হয়ে ভূমিশয্যা নেবার দশায় কেন? সৌন্দর্য কিভাবে চিরন্তন? না, এ কথা বলা ভুল, একেবারেই মিথ্যা।

শান্তপ্পন নামে এক কুঁড়ে ছুতোর এই ছোটো গোরুর গাড়িটা বানিয়েছিল এই তেঁতল গাছের নীচেই। গাঁয়ের ব্যবসায়ী কি আজও পুরাতন ধারা-পরম্পরা আঁকড়ে রয়েছে কিংবা নয়—রত্নস্বামী এ বিষয়ে কিছুই জানে না। আজই সে এখানে এল। সবাইকেই তার অচেনা মনে হচ্ছে। আগে গ্রামসুদ্ধ সবাই তাকে জানত। তাই এ কথা বললে ভুল হবে না যে সে গ্রামের সবার আদরের ধন ছিল। সবাই রত্নুকে ঘরের ছেলে মনে করত। তারপর পদস্খলিত এক দেবদূতের মতো এ-গ্রাম ছেড়ে সে চলে যায়। নিশ্চয় এদিক-ওদিক আনাচে কানাচে কোনো পরিচিত ব্যক্তি—হয়তো বা আজ বার্ধক্য দশায় উপনীত—কাউকে দেখা যাবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কেউ নজরে পড়ল না। এর পর হয়তো দেখা হয়ে যাবে।

গ্রামে ছুতোর, কামার, স্যাকরা প্রভৃতি, এমন কি ধোপা-নাপিতদেরও কাজের বদলে পারিশ্রমিক টাকায় দেবার রেওয়াজ ছিল না। ক্ষেতের কাটা ফসল, পাকুর-সব্জীর একটা ভাগ দেওয়া হত। নানা পালা-পার্বণ, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া-কাণ্ড, উৎসব ও

অন্যান্য উপলক্ষেও ওদের কিছু প্রাপ্তিযোগ হত। লাঙলের ফলা বদলানো, জোড়া লাগানো, সারের গাড়িতে পট্টি মারা ইত্যাদি সাধারণ কাজ ছুতোরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ছোটো-খাটো কাজের বাইরে একটা সম্পূর্ণ গাড়ি তৈরির কাজের জন্য ওদের আলাদা পারিশ্রমিক দিতে হত। নিজের কাজই করুক, কি ফসল কাটতেই যাক, শান্তপ্পনের সব কাজেই আলসেমি। সব কাজই সে নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করত। কাজের বদলা সব্জী আনতেও সে নিজে যেত না। ওর স্ত্রী-বাচ্চা গিয়ে চেয়ে আনত। কাজটা যেন তার হিসেবে ভিক্ষা চাওয়ার সামিল। গাঁয়ের জমিতেও ওর পরিবারের একটা ছোটো অংশ ছিল। সে জমি উর্বর হওয়ায় তা থেকে ওর পরিবারের দুবেলার অন্ন-সংস্থান হয়ে যেত।

একবার গুরুমূর্তি শান্তপ্পনকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। আসলে জমিদার গুরুমূর্তি জানতেন যে শান্তপ্পনকে দিয়ে কাজ করানোর ওটাই প্রশস্ত উপায়। অবশ্য জমিদার কথার মানে এই নয় যে ওর কাছে অনেক বেলী[1] জমি ছিল। ওঁর ছিল কুল্লে আড়াই বেলী জমি, অবশ্য গ্রামে কারোরই এক বেলীর বেশি জমি ছিল না। তাই সবাই গুরুমূর্তিকে খাতির করত। সেটাও বড়ো জমিদার বলে নয়, ওঁর আচার-ব্যবহারের জন্যই। উনি কাউকে কখনো গাল-মন্দ করতেন না। তিনি একজন পরম ভক্ত, দার্শনিক ব্যক্তি ছিলেন। তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নি তিনি। মাত্র দুই শ্রেণীর বেশি তিনি পড়েন নি, কিন্তু আলমারী বোঝাই বই। তার মধ্যে বেশির ভাগই ভগবৎ স্তুতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক। নীরস নিরর্থক কথা তাঁর ভালো লাগত না। পড়াশুনা করে নানা কলা সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা গড়ে তোলার কোনো অসুবিধা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি কলাচর্চা নিতান্ত অসার বলে মনে করতেন। সেই কারণে কলা বিষয়ক বই সংগ্রহ করেন নি। আঠারো সিদ্ধাই[2], তায়ুমানবর[3] পট্টিনডার[4] ইত্যাদির পদ-সংগ্রহ, হনুমান পরাক্রম, বিনায়ক মাহাত্ম্য, তিরুবিলৈয়াত্তল পুরাণম[5] প্রভৃতি পুস্তক এবং অন্য অনেক কাব্য-সংগ্রহ তাঁর কাছে ছিল। এগুলোর মধ্যে জনৈক তাঞ্জোর-বাসী রচিত 'মদভাগবদ্ গীতা ব্যাখ্যা' নামক পুস্তকখানি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। অনেকবার তিনি এই বইটা পড়েছিলেন। একবার একজন সে বইটি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু ফেরত দেবার আর নাম নেই। এ বইটা হারানো তাঁর খুবই দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছিল।

শান্তপ্পন, পয়সা চাইলে গোড়ায় মানা করেও পরে কিছু দিতেন গুরুস্বামী। সর্বদাই

---

[1]এক বেলী=পৌনে সাত একর জমি।

[2] তামিলনাড়ুর আঠারো জন রহস্যবাদী কবি।

[3] তামিলনাড়ুর এক সন্ত কবি।

[4] তামিলনাড়ুর শিবভক্ত কবিদের অন্যতম।

[5] এক তামিল পুরাণ। এতে শিবাজীর অনেক আলৌকিক কর্মের বর্ণনা রয়েছে।

তিনি এভাবে তার সঙ্গে একটু মজা করতেন।

শান্তপ্পন ওঁর বাড়ির মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপনের জন্য সুন্দর কারুকার্যময় আসন বানিয়ে দিয়েছে। পরিবারের কল্যাণার্থে গুরুমূর্তি আসনের নীচে নবরত্ন খোদাই করিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শান্তপ্পন জানত না, কিন্তু রত্নস্বামীর জানা ছিল। শান্তপ্পন কোনো পলিটেকনিকে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। তখনকার দিনে এরকম শিক্ষার সুযোগই বা ছিল কোথায়? একবার যেটা দেখে নিত, সেটা সে নিজ হাতে বানাতে পারত। চোখে দেখে যদি বুঝত কোনো একটা জিনিসের কমতি আছে তা হলে নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্যে তার কিছু পরিপূরক জিনিস তৈরি করার ক্ষমতা তার ছিল।

একদিন গুরুমূর্তি বললেন, 'কুঁড়ে শান্তপ্পন কী করতে পারবে? শুধু কাঠের খড়মই সে বানাতে পারে। টেরাঁ-বাঁকা কাঠ কেটেও সে খড়ম বানায়। জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'এতো খুব সোজা কাজ। এ কাজে চোখের আরাম।' পারবে কি একটা ছোটো গোরুর গাড়ি বানাতে? হ্যাঁ, বেশ হালকা, পাতলা হবে সেটা। পারবে বানাতে?'

তাঁর এ কথাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরে নিয়ে কাজে লেগে গেল শান্তপ্পন।

গুরুমূর্তি একে একে কাঠ, পেরেক, বেত, মোম, কাপড়, চট, ধনুক, জ্যা ইত্যাদি জিনিস কিনে ফেললেন। কাঠের কাজে সহায়তা করার জন্য কয়েকজনকে নিযুক্ত করা হল। এদের সবারই মজুরী নির্ধারিত হল। কিন্তু শান্তপ্পনের নিজের মজুরীর ব্যাপারে কিছুই স্থির হল না। গুরুমূর্তির কাছে থেকে কি মজুরী নেওয়া যায়? তিনিই তো তার আশ্রয়দাতা আর কলাবৃত্তির পৃষ্ঠ-পোষক। শান্তপ্পনের কাছে গুরুমূর্তির তরফে প্রশংসাসূচক দুটি কথা 'সাবাস্ শান্তপ্পন' মজুরীর চেয়ে অনেকখানি বেশি।

গুরুমূর্তির গৃহে শান্তপ্পনের যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন জুটত। কাজের দিনে তো কথাই নেই, তখন কফি, সকালের জলখাবার, ভোজন সবই। কিন্তু কি সকালের জলখাবার, কি দুপুরের ভোজন কোনো কিছুই সে তারিয়ে তারিয়ে খেতে পারত না, কারণ খালি পেটে কাজ করতেই সে ভালোবাসত। গরম গরম কিছু খাওয়া তার দ্বারা হত না। হাতের কাজে সেরে একটু দম নিয়ে সে খেত। ফলে বিলম্ব হওয়ায় খাবার সব কিছুই ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

হালকা ধরনের এই গোরুর গাড়িটা সে তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলল। চার-পাঁচ মাস বাদে পাশেই এক গাঁয়ে একটা বিয়ে। শান্তপ্পন বলল, 'গুরুমূর্তিবাবু, আমার বানানো এই গড়িতে চড়েই বিয়েতে যাবেন। তাই এটা তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেললাম।'

সবচেয়ে আগে বানাল গাড়ির ওপরের অংশটা। তারপর তিন বার রঙ লাগাল। জায়গায় জায়গায় লাল, হলদে, নীল আর বেগুনী রঙের কাঁচ সেঁটে দেওয়া হল। একেবারে ওপরের দিকে নিজেই সে কিছু সুন্দর নকশা-চিত্র বানাল। শান্তপ্পন ছবিও আঁকতে পারত।

গাড়ি দেখে গুরুমূর্তি বললেন, 'সাবাস! জব্বর বানিয়েছ এই গোরুর গাড়িখানা। শান্তপ্পন, তুমি খুব পাকা কারিগর।'

শান্তপ্পনের গোঁফ ছিল না। কিন্তু সে গোঁফে তা দেবার ভাণ করল।

গাড়ি যে সময় তৈরি হল তখন সরযূ আর ছোট্টটি নেই. অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে। আরো আটটি বাচ্চা হতে পারত তার মার। সরযূ এগারো পেরিয়েছিল। কিন্তু তার মায়ের আর কোনো সন্তান হয় নি। হায়, একটা ছেলে হল না কেন? বিধাতা বড়ো নিষ্ঠুর। চোখ তার অন্ধ। এই অভাব তার জীবনে বিধাতা রাখল কেন? এ ভাবেই তো...এ ভাবেই তো...হায়! সে কথা কল্পনাও করা যায় না।

যদি রত্নমের বাবা এই গ্রামে মাস্টারী নিয়ে না আসতেন তা হলে কি ভালো হত না? আশেপাশে কোনো গ্রামে পাঠশালা ছিল না। এ গ্রামে না থাকলেই বা কি ক্ষতি ছিল? না হলেই কত ভালো হত! বাবা এখানে মাস্টার ছিলেন, তাই রত্নস্বামীকেও এসে এখানেই থাকতে হল। সেকারণেই গুরুমূর্তির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল আর তার সঙ্গে ভাইয়ের মতো ব্যবহার শুরু হল। দার্শনিক ছিলেন তিনি। তা ছাড়া রত্নস্বামীর তর্ক বিচার শুনে আর সেসবের সমাধানেই তাঁর বিশেষ আনন্দ হত। খেলাচ্ছলে গুরুমূর্তি অসম্মান করতেন না। তাস খেলতে বসেও, তিনি রত্নমের বুদ্ধি কৌশল দেখে আনন্দিত হতেন। তাঁর ধারণায় রত্নম বুদ্ধিমান এবং এক হিসেবে তার মধ্যে কোনো নীচতা ছিল না। তাই কোনো কঠিন ব্যাপার কিছু হলেই রত্নমকে খবর দিতেন। এমন-কি ওঁর স্ত্রী শিবকামীও প্রতি কাজে ওকেই ডাকত। কোনো সাহায্য ছাড়া কুয়োয় পড়ে যাওয়া ঘটি তোলানো, নারকেল গাছে চড়ে নারকেল পেড়ে দেওয়া, আড়িয়ল বলদ-জোতা গাড়ি সোজা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, নিত্যকার সব কাজের জন্য রত্নম সর্বদা তৈরি। এভাবেই গাড়ি চালানোর ব্যাপার নিয়ে তার এই দুর্দশা হল।

নুতন গাড়ি নিয়ে রত্নস্বামী তৈরি। বিয়ের পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ শিবকামী কাঁখে কলসী নিয়ে কুয়ো থেকে জল আনতে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য কুয়োর সম্প্রতি একটা হ্যাণ্ডপাম্প লাগানো হয়েছে। তাই শিকল-দড়ি ছাড়াই কুয়োয় যাচ্ছিল। এক হাতে কলসীটা অন্য হাতটা তার সঙ্গে তাল রেখে দুলছে। আস্তে আস্তে চলেছে।

'রত্নু, আমাদের বৌদিকে দেখেছিস? কাঁখে কলসী নিয়ে যাওয়ার সময় শিবকামীকে দেখে মনে হয় যেন বালক কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে মা যশোদা যাচ্ছেন। এ যশোদার ছেলে না হওয়ায় বড়ো দুঃখ মনে', এ কথা বলে গুরুমূর্তি পত্নীকে একটু চটিয়ে দিলেন।

স্ত্রীর সঙ্গে এভাবে খুনসুটিতে তাঁর বেশ মজা লাগত। তার পুত্রহীনতার গভীর বেদনা তিনি কখনো বুঝতে পারেন নি। পর্বতশীর্ষের জ্বালামুখীকে কি কখনো শান্ত শীতল সমভূমির মানুষ বুঝতে পারে?

একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যেন শিব এসে বলছেন, 'আর তোর ছেলে হবে না।'

এই ভেবে গুরুমূর্তি খুশি হলেন যে খুব স্পষ্ট ভাবেই শিবকামীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। খুব দুর্ভাগ্যের কথা! এটা তিনি বোঝেন নি যে হতাশা ঠিক নিভে যাওয়া আগুনের মতো নয়, বরং বলা যায় ছাই-চাপা আগুনের সমান। আর একটু হাওয়া পেলে সেটা ধিকি ধিকি জ্বলে। ঠিক হলও তাই! যে আগুন তিনি জ্বালিয়েছিলেন, সেটা এখনো জ্বলছে।

সবার সঙ্গে একত্রিত হবার জন্য গুরুমূর্তি সেই বিয়েতে চললেন। পাড়ারই বাসিন্দা আরো দু-তিন পরিবারও নিজেদের গাড়িতে চলল। পরস্পরের মধ্যে এদের আত্মীয়তাও ছিল। রত্নমের সঙ্গে এদের কোনো আত্মীয়তা নেই। তবে সে গুরুমূর্তির পরিবারের সুহৃদ। তাই না? গুরুমূর্তির দরবারের শিল্পী শান্তপ্পন আর রত্নস্বামী বিদ্বান। এরা দুজনেই তাঁর সঙ্গে চলল।

তার বাবার দৃষ্টিতে রত্নম ছিল কাজ-এড়ানো হদ্দ কুঁড়ে। সব সময় তিনি তার পেছনে পেছনে চিৎকার করতেন আর বলতেন, যে ছেলে কথা শোনে না, তাকে মেরে ফেললেও কোনো পাপ নেই। রত্নম সামনে এসে পড়লে, উনি কিন্তু তাকে কিছুই বলতেন না। কোনো প্রকার শাসন তার ওপর ছিল না। মাথায় তার একটা ছোট ঝুঁটি। একসময় ছিল মোটা আকারের। ঝুঁটির চুল এসে মাথার সামনের দিকে পড়ত। কখনো সে ঝুঁটি ছিল খুব হালকা ধরনের। ছেলের এই ঝুঁটি দেখে বাবা বেজায় চটে উঠতেন। ওর লম্বা চুল আর জুলফী দেখে দীর্ঘশ্বাস পড়ত তার। পাতলা ঝুঁটি জুলফীতে ব্যবধান কীই-বা। আর রত্নম তখন যুবক, আনুমানিক পঁচিশ বছর। সব সময় সে সুগন্ধ কেশতৈল ব্যবহার করছে। মাথায় সামান্য চুল। এমনভাবে চুলটা টেনে রাখত যে ঝুঁটিটা বেশ বড়োসড় দেখাত। পিন আটকে সেটা উঁচু রাখত। কখনো-বা মেয়েদের মতো খোঁপা করত। আচ্ছা করে কাঁধের ওপর ঘুরিয়ে নিলে চুল সব এক জায়গায় জমে যেত। আবার তাতে গোল ডালা লাগিয়ে নিত। মনে হত যেন সাজসজ্জার অনেক অলংকার, মলমলের কুর্তা, রেশমী দোশালা, কোমরে চৌখুজী লুঙ্গী, মাথায় সুগন্ধিত কুঙ্কুম বিন্দু পানের রসে রাঙানো ঠোঁট—এই ছিল তার বেশভূষা। মুখে তামাক গুঁজে যখন সে গাড়ির লাগাম ধরত, মনে হত আড়িয়ল বলদেরও যেন পাখা গজিয়েছে। আর ঘোড়ার মতো সেটা দৌড়াত। সেদিন রত্নস্বামীই সেই গোরুর গাড়িটা চালাচ্ছিল। এ-সবই তার অপরিণামদর্শিতার ফল।

এই হালকা গোরুর গাড়িটাতে জোতার জন্য গুরুমূর্তি গোড়ায় সুন্দর এক জোড়া বলদ কিনেছিলেন। বলদ দুটোকে ঘণ্টা, পায়জার মোতির মালা ইত্যাদিতে সাজিয়েছিলেন। বলদগুলো চালাবার যোগ্যতা রত্নস্বামীর ছিল। তার কাছে নানা ধরনের ছড়ি-চাবুক ছিল। আর কিছু ছিল মোতির মালা, কিছু তারের মতো সরু, কিছু-বা বেণীর গোছার মতো। নানা ধরনের সব চাবুকের সঙ্গে একটা ছাতাও সে নিজের কাছে রেখেছিল। ছাতা দেখে ভীতচকিত বলদগুলোকে দেখে তার বেশ মজা লাগত। ছড়ি-চাবুকের

মার সত্বেও কথা না শুনলে ছাতাটা খুলে সে বলদগুলোর দিকে ধরত। এসময় তার এত মজা লাগত যেন প্যারাশুটে উড়ছে। ও ভাবত নতুন বলদগুলোকে বশ করার জন্য গোছাওয়ালা চাবুক ছাড়াও ছাতা প্রয়োজন। তাই সে এটা সঙ্গে নিয়ে চলেছিল।

রওনা হবার মুখে গুরুমূর্তি ওকে উস্কে দিলেন, 'আরে রত্নম! তারের বাড়ি মেরে বলদগুলোর গায়ে ঘা করে দিস না। সামলিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাবি।'

রত্নম জোরের সঙ্গে জবাব দিল, আপনার কোনো চিন্তা করার দরকার নেই।

রত্নম জানত বলদের শরীরে তার দিয়ে জোরে মারতে নেই। আস্তে খোঁচা দিয়ে সেটা ধীরে টেনে নিলে শরীর থেকে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরবে না। যদি একটু রক্ত বেরোয়, তবে একটু গোবর লাগিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

গাড়ি চালিয়ে দিল রত্নম। বলদে টানা এই গাড়িটা ছোটো আর সুন্দর। তার মধ্যে সুন্দরী রমণীরা বসে। গুরুমূর্তি পেছনের গাড়ীতে। হালকা গাড়িটায় যাতে সব ওজন এক জায়গায় গিয়ে না পড়ে তার জন্য শিবকামীকে এগিয়ে এসে রত্নমের সঙ্গে বসতে হল। সেই গাড়িতে কিছু বিছানা-পেটরার সঙ্গে ছিলেন অন্য দুজন মহিলাও। একজন শিবকামীর পিসতুতো বোন, একটু মোটাসোটা ধরনের মহিলা। গাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় উনি বসেছিলেন। বয়স তাঁর শিবকামীর মতোই, তবে একটু বাক্যবাগীশ।

গাড়িতে বসা মহিলা তিনজনের মধ্যে শিবকামীই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। গোলগাল মুখখানা যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো। শরীরে যেন একটা বিশেষ লালিত্য ছিল। হঠাৎ তকিয়ে দেখলে মনে হত কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি। বয়স বেশি নয়, সাতাশ-আঠাশ, চুলগুলো টেনে খোঁপা করা আর তাতে ফুল-গোঁজা। ভুরু দুটোর মাঝখানে উল্কির চিহ্ন। তারই নীচে গাঢ় লাল রঙের কুঙ্কুমের টিপ ছিল। তার পরনে জরিদার লাল চোলী আর কালো রেশমী শাড়ী। গায়ে অলংকার বেশি নেই। গলায় সোনার দুলহরী চেন হার আর হাতে কঙ্কণ। নাকে-কানেও যৎসামান্য অলংকার।

চাবুক উচিয়ে রত্নম বাঁ ধারের বলদটাকে মারল। একটু জোরে চললে বাঁ দিকে গাড়ি কেমন টেনে চলে না? গোড়ায় ওই বলদটা আস্তে চলছিল। রত্নম ডান বাঁয়ের বলদ এদিক ওদিকে করতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে সব ঠিক চলতে লাগল। নতুন লোক সম্পর্কে আপত্তি সম্ভবত আস্তে আস্তে মিলিয়ে গিয়েছিল।

সব গাড়িই চলছে। ছোটো গোরুর গাড়িখানাই আগে আগে। রত্নমকে বারবারই লাগাম চেপে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল যাতে অন্যান্য গাড়িগুলো তার কাছে পৌঁছুতে পারে। গাড়িগুলো ছোটো ছোটো আকারের আর রাস্তাও ছিল পাথুরে চাঁইয়ে ভরা। এই রাস্তায় বলদগুলোর চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। গাড়ি এদিক ওদিক ঝাঁকুনিতে ভেতরে বসা যাত্রীদের বেশ মজা লাগছিল। মহিলা যাত্রীরা অনবরত কথা বলে চলেছিলেন। রত্নম তাদের সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল।

শিবকামীর সেই মোটাসোটা পিসতুতো বোন বারবার তার পেছনে লাগছিল।

শিবকামীর একটিই মেয়ে। তাই ওকে বাঁজা বানাচ্ছিল। ওর বক্তব্য ছিল যে সব বৃক্ষে পুষ্প হয় না। সেরকম সব বাচ্চাকে হিসাবে ধরা চলে না। কমপক্ষে একটি মেয়ে ও একটি ছেলের জন্ম দিলে, তবেই কোনো নারীর নারীত্ব সার্থক বলা যায়। মেয়ে আর ছেলে কেমন হবে?

'মেয়ে হবে গোলাপের মতো আর ছেলে এই রত্নমের মতো।'

রত্নস্বামীর চমক লাগল। বুঝেশুনেই কি তবে ও কিছু ইঙ্গিত করছে? এ তো খুব গোলমেলে মেয়ে!

এসময় শিবকামীর হাত এসে লাগল ওর শরীরে। অজ্ঞাতে এসে হাতটা রত্নমের শরীর স্পর্শ করেছে, কিন্তু তাতেই যেন তার একটা কাঁপন ধরল শরীরে। তার পিঠেলাগা হাত থেকেই যেন সেই স্পর্শ শিহরণ সে অনুভব করল।

একটু বাদে সে হাতটা সরিয়ে নিল। মনে হল আগুন ছুঁয়ে গেল। কিন্তু—কিন্তু সেই থেকেই যেন বন্ধুত্বের শুরু।

আর একটু বাদে আবার ওর হাতটা আস্তে আস্তে কাছে ফিরে এল এবং একটু ছুঁয়ে যেন দূরে মিলিয়ে গেল। কয়েকবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটল। সে যেন ভাবাবেগে ক্ষেপে উঠল। সংসারে ঠিক-বেঠিক কৃতজ্ঞতা-কৃতঘ্নতা, ভালো-মন্দ সব কিছুরই দুদিক রয়েছে। দুয়ের তফাতটা বুঝতে পারে। তার তখন এতটুকু বিবেক বুদ্ধি ছিল না। পাখা গজালে পাখি যেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, উড়ে বেড়ায় তেমনি তার মনও বিচরণ করতে লাগল।

তার পরের সব কথাই যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। এই ঘটনার দু-পাঁচ দিন পরে তার ব্যবহার সংসারের সাধারণ লোকের মতো ছিল না। তার মনে হচ্ছিল সে যেন মেঘের মতো আকাশবিহারী এক স্বচ্ছন্দচারী আত্মা। সে অবস্থায় তার পক্ষে কি ছিন্নভিন্ন সব স্বপ্ন আবার দেখা সম্ভব?

বিয়ের পর সবাই বাড়ি ফিরে এল। হাওয়ায় ওড়া পতঙ্গের মতো রত্নমও অনায়াসে ঘরে এসে পৌঁছুল।

রত্নস্বামী নিজের বাড়ীতে কখনো শুত না। গুরুমূর্তির ঘরের বারান্দাতেই শুয়ে থাকত। সাত-আট বছর যাবৎ এই ব্যবস্থা চলছে। ওর বিছানা-পত্রও বারান্দায় এক কোণে পড়ে থাকত। কেউ খুলত না, সরাতও না।

একদিন সন্ধ্যায় ঘুরে ফিরে রত্নস্বামী সেখানে এল। গুরুমূর্তি বারান্দায় বসে ছিলেন। সব সময়ই তিনি হাসিঠাট্টা করে তাকে স্বাগত জানাতেন কিন্তু সেদিন কেন জানি গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। কাছে উঠে আসার পর, তাঁর চেহারায় কেমন যেন একটা কঠোরতা দেখা দিল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে রত্নমের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বারান্দায় পড়ে থাকা রত্নস্বামীর বিছানাটায় এক লাথি মারলেন। বিছানাটা ঘর থেকে ছিটকে দু গজ দূরে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

রত্নম স্তম্ভিত হয়ে গেল। চুপচাপ ঘরের বাইরে এক গাছের নীচে সে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে রইল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গুরুমূর্তি চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে রত্নমের চেতনা ফিরে এল। লোকটা একটা জানোয়ার! জানোয়ার একটা! বলতে বলতে সে চলে গেল। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া বিছানাটা উঠিয়ে সে ঠিক করল। মনে নানা চিন্তা। মানুষের ক্ষিদে পায়, পিপাসা লাগে। প্রকৃতি চালিত হয়ে নানা কাজ করে। আগুন, হাওয়া, বাষ্প, বিদ্যুতের মধ্যে যেমন নানা ধরনের তৎপরতা দেখা যায়, তেমনি ভাবাবেগে চালিত হয়ে অথবা চঞ্চলবশত, না জানি মানুষ কত কি কাজ করে। ন্যায়, ধর্ম, সত্য, পাপ, পুণ্য ইত্যাদির উৎপত্তি কেবল কথারই জন্য। ভাবনা-তাড়িত হলে এ-সবের কোনো মুল্যই আর থাকে না।

সত্য কি? এই বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল যেটা রত্নমের আজীবন বেদনার একটা কারণ হয়ে রইল। সেই ঘটনা নিয়ে লোকে ফিসফাস করতে শুরু করল, কিন্তু গুরুমূর্তিকে বলার কারোর সাহস হল না। গ্রামে ফিরে আসার পর কোনো ক্রমে কথাটা তিনি জানতে পারেন। আমার নিজের পালা-পোষা গাই-বলদ যদি আমার দিকেই তেড়ে আসে, তবে কেমন লাগে? তখন গুরুমূর্তি যা ইচ্ছা করতে পারতেন, কিন্তু কিছুই করলেন না। কারণ তিনি ছিলেন দার্শনিক আর শান্ত স্বভাবের লোক। শান্তির পাথরে অনবরত ঘা-মারা, তেড়ে ফুরে যাওয়া ক্রোধের প্রবাহকে কি কখনো গঙ্গার বেগবতী ধারার সমান বলা যায়। তখন সেটা খরস্রোতা, ঝর্নাধারার রূপ ধারণ করেছে।

সেদিন থেকে গুরুমূর্তির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিষধর সাপের মতো রত্নমেরও কারোর সামনে আসার সাহস ছিল না। তাই সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

এই ঘটনার পর বেশিদিন শিবকামী জীবিত ছিল না। কিছু ঘটনা আর উড়ো উড়ো খবর জুড়ে তার শেষের দিনগুলো কেমন কেটেছিল রত্নম কল্পনা করে নিতে পেরেছিল।

গুরুমূর্তি তাকে একটা কথাও বলেন নি। তাকে বাড়ি থেকে দূর করেও দেন নি। পদ্মপাতায় জলের মতো, সেও বাড়িতে থেকে বাড়ির সঙ্গে মিশে যায় নি একেবারে। রাজর্ষির মতোই সে গৃহী রইল, কিন্তু জীবনযাপন করতে লাগল সন্ন্যাসীর মতো।

শিবকামীর কি হল? কথাটা যখন গুরুমূর্তির কানে পৌঁছুল, তখন প্রাণ যেন তাঁর শরীর থেকে ছেড়ে গেল। জীবিত শবের মতো দেখাত তাকে। সেদিন যে জ্বর এল তার, সেটা আর কমল না। দিনে দিনে সেই জ্বর বেড়ে চলল। শেষ অবধি মৃত্যুর কারণ হয়ে সেটি তার প্রাণ হরণ করল।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শশ্মানে গিয়ে তাকে আগুন দেওয়ার পর, গুরুমূর্তি

অনায়াসে যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, সেই বাক্যগুলো যেন রত্নমের বুকে শূলের মতো এখনো বিঁধছে।

'তুই এখন পবিত্র হলি। নিজের ভুলের তুই এখন প্রায়শ্চিত্ত করলি। সৌভাগ্যবতীর পরিচয় নিয়ে সংসার ছাড়ছিস তুই—আচ্ছা যা...। কিন্তু ওই...ওই অবোধ যুবক!...'

আর কিছু তিনি বলেন নি। তাঁর আর বলারই বা কী ছিল? না-বলা সেই কথাটা জানার কি কোনো উপায় আছে? মুনি-ঋষিদের মতো যিনি জীবন অতিবাহিত করলেন, সেই মহাপ্রয়াণের মৃত্যুর পরও আজ ছ'মাস কেটে গেছে।

এখন কেবল গোরুর গাড়িটাই রয়ে গেছে। মৃত্যুকালে উনি বলে গেছেন যে শান্তপ্পন ছাড়া অন্য কেউ এ গাড়িতে হাত দেবে না। সেও কিছুদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এসে গাড়িটায় বসত, শুয়ে থাকত। কিন্তু কয়েক বছর হল সে-ও মারা গেছে। এ-সবই কেমন আশ্চর্যের ব্যাপার!

তাঁর মৃত্যুর পর রত্নম চুপচাপ একদিন গ্রাম ছেড়ে এদিক-ওদির ঘুরে বেড়াল। টাকাপয়সা সে অনেক কামিয়েছে। কিন্তু মনের ভার তার হালকা হল না। তার মনে হল সে ভার বহনে সে অসমর্থ। বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে অনেক মেয়ে তার কাছে এসেছে, কিন্তু কাউকে বিয়ে করতে তার আগ্রহ জাগে নি। বারবারই কোঙ্গেশ্বরী গ্রামে ফিরে আসার ইচ্ছা তার মনে উঁকি দিয়েছে। শেষ অবধি ভয় বিসর্জন দিয়ে গ্রামে এসেছে। এই দৃশ্য দেখার জন্যই কি এখানে সে এসেছে? কখনোই নয়। স্বপ্নেও সে এ দৃশ্য দেখবে বলে ভাবে নি।

জীবিতকালে রত্নমকে উনি ক্ষমা করেন নি। সে পাপক্ষালনের উপায় কি? সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? থেকে থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মন কি জীবনের অন্তিমকাল অবধি শান্তি পাবে না?

সে এক দৃঢ় সংকল্প নিল। গুরুমূর্তির বাড়ি হয়তো আজ অন্যের অধিকারে। যদি তার জন্য প্রচুর অর্থ দিতে হয়, তা দিয়েও সে সেটা কিনে নেবে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন গুরুমূর্তির মতোই গোরুর গাড়িটার দেখাশোনা করবে। তারপর? ঘরের ভেতর তাঁদের দুজনের ছবি টাঙিয়ে রোজ কি ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে? তারপর কি রাতে বিনা ব্যাঘাতে নিদ্রা যেতে পারবে? না কখনোই নয়। তারপর এমনভাবে থাকবে যাতে আরো কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারে। সংকল্প বিচ্যুত সে হবে না। আজ থেকেই সেই কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করবে।

চিন্তার মধ্যপথেই রত্নম ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর ঘোর পরিশ্রমের ফলে সে পুরাণো বারান্দাতেই ধপ করে থামের গায়ে মাথা হেলিয়ে পড়ল। আর এভাবেই সে সদাসর্বদা শুয়ে থাকবে, কিন্তু তার শোয়ার জন্য কোনো বিছানা থাকবে না, কিছুই মিলবে না।

□

তো. জানকীরামন

জন্ম ১৯২১ সালে। বি.এ. পাশ করার পর শিক্ষকতা করেন। আকাশবাণীর স্কুল ব্রডকাষ্ট কার্যক্রমের প্রযোজক ছিলেন। মনোভাবনার সূক্ষ্ম ও সজীব বিশ্লেষণ তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য।

আঙুল

আদরণীয় ও প্রীতিভাজন শ্রী অ. অ. আয়ারকে আমার অনেক নমস্কার। প্রকৃত আদর আর আন্তরিক প্রীতিবশতই এভাবে আপনাকে আমি সম্বোধন করছি। আপনার গৌরবর্ণ চেহারা, বিশাল আকার, প্রখর দৃষ্টি, লম্বা-চওড়া গড়ন, তীক্ষ্ণ নাসা, চওড়া ছাতি, গলা-বন্ধ কোট, কোট-পকেটের ঘড়ি, বোতামে বাঁধা সোনার চেন, কপালে সোনারঙা সুগন্ধী চন্দনের তিনিটি রেখা, মাঝখানে কুঙ্কুম বিন্দু আর সবচেয়ে প্রাধান্য মাথার সাদা পাগড়ীর। পাগড়ীটা যথাস্থানে রাখার জন্য জায়গায় জায়গায় আলপিন গোঁজা। তার কিছু দৃশ্য কিছু বা অদৃশ্য। পায়ে লাল জুতো, মুখে এলাচি, লবঙ্গ আর তামাক মিশ্রিত, গন্ধে ভুর ভুর কুম্ভকোণামের পান। এই সুগন্ধের সঙ্গে রয়েছে আপনার সুন্দর কথাবার্তা। এ সব কাকে না প্রভাবিত করে? হাজার লোকের, তাই-বা কেন, ষোলো হাজার লোকের ভিড়, সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনার কথাবার্তাও তেমনি। আপনি সে সময়কার বি. এ. পাশ। প্রতি শুক্রবার যখন সব চাপরাশী আর করণিকদের একত্রিত করে দশ মিনিট কিছু বলেন, তখন আপনার ইংরাজী বলা শুনে বার্ক, মেকলে, কিপ্লন প্রভৃতির কথা স্মরণ হয় আর লোক আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে। আমি আর কতটুকু জানি—মোটে তো ম্যাট্রিক পাশ। আপনার ইংরাজী জ্ঞান বা বলার ক্ষমতা এদেশে আর মেলা ভার। এই ভেবে আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি। আপনার কি ভাগবৎ-গীতা পুরোটাই জানা আছে? কিংবা সবটাই জানেন কুরুলের[1]? কম্বরামায়ণের সব পদই কি আবৃত্তি করতে পারেন; ভাগবৎ-র এতগুলি শ্লোক কি করে শিখলেন আপনি? কালমেঘম[2], ইরট্রেয়র[3] ইত্যাদি যে-সব কাব্যগাথা শুনিয়ে আপনি আমাদের আনন্দ দান করেন, সেগুলি কোথায় শিখলেন? এতসব পড়ার সময়ই-বা কখন আপনি পেলেন? বিধিব্যবস্থা, হিসাবপত্র, বেতন, নিয়মকানুন, ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকার মোটা মোটা বই প্রকাশ করে আর মাঝে মাঝে তার নানা সংশোধনও করা

---

[1]তামিল ভাষায় রচিত বিখ্যাত নীতি-মালা, রচয়িতা তিরুবল্লুবর।

[2] ভক্ত কবি।

[3] দুজন তামিল কবি যৌথভাবে কাব্য রচনা করার ফলে ইরট্রেয়র অর্থাৎ কবি যুগল নামেই এঁরা খ্যাত।

হয়। এ-সব নিয়ম আর তার যাবতীয় সংশোধনের খবর সব আপনার খেয়াল থাকে। এ-সবের জন্য আপনার সময় মেলে কখন? সত্যি কি সময় আছে আপনার?...এ বিষয়ে বেশি কিছু বলা আমার সম্ভব নয়। একজন সরকারী কর্মচারী প্রসঙ্গে কিছু বর্ণনার জন্য আলাদা বই লেখা নিষ্প্রয়োজন। তার জন্য আলাদা স্থানই বা কই? আপনাকে এক মাস দেখে নিলেই যথেষ্ট।

কেবল দফতরেই নয়, দফতরেরর বাইরে, ঘরে বা সামাজিক মেলামেশায় কেমনভাবে কী করতে হয় সেটা আপনার কাছে খুব ভালো শেখা যেতে পারে। বাড়ি ফিরে আপনি কী করেন? তিন-দুই-পাঁচ খেলেন? লাদ খেলেন? রামী (তাস) খেলেন? ক্লাবে গিয়ে গল্পসল্প করেন কি? ভালো মন্দ নির্বিচারে সব নাটক আর ছবিই দেখেন কি? আর সে-সব দেখে হৈ চৈ করে হাসি-হল্লায় সময় নষ্ট করেন কি? নিশ্চয়ই নয়। বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে উপময়[1], বাজ্জী[2], সোজ্জী[3] খেয়ে আচ্ছা করে এক কাপ কফি খান। তারপর ছেলেকে ডেকে ইনসুলিন ইনজেকশন লাগাতে বলেন। বহুমুত্র রোগাক্রান্ত হওয়ার পর ভয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়ার দলে তো আপনি নন! আপনাকে অন্যতম ভোজন-রসিক হিসেবে গণ্য করা চলে, এই কারণে আমার দৃষ্টিতে আপনার মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। এ-সবের পর সন্ধ্যা-আহ্নিক করে পূজার ঘরে বসে বসে আপনি বীণা বাজান। সেখানে বড়ো বড়ো তাঞ্জোর-চিত্র রাম আর কৃষ্ণের। বীণা বজিয়ে সময় সময় গানও করেন আপনি। সাত বছর হল এই পরিবর্তন এসেছে। আপনি বীণা বাজাতে পারেন, গানও জানেন, কিন্তু কাউকে বলেন নি সে কথা। আপনার এই রকম সব বিষয়ে জ্ঞান ও সংযম-এর মূল্যায়ন আমার মতো সাধারণ মানুষ কি করে করতে পারে?

তিন বছর আগে রামনবমীর দিন 'এই খোকা, এদিকে এসো' বলে আমায় ডেকেছিলেন। আমি তো শুগুল[4], শরবৎ[5] আর পয়সা পাওয়ার আশায় গিয়েছিলাম। আমি কী করে জানব যে আমার জন্য 'বীণা গানের' ভোজ আয়োজনও রয়েছে। আমি তো বি. এ. পাশ নই। তিনটি সভার সভ্য হিসেবে অবশ্য নানা সংগীত সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ হয়েছে। তবে সেদিন আপনার সেই গান আর বীণা-বাদন শুনে মনটা খুবই ভরে উঠেছিল। আমার চাপা কান্না শুনে আমার পাশে বসা তিরুমল আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি মশায়, কি হচ্ছে?' আমার লজ্জা হল। পায়ের রক্তাক্ত ঘায়ের দিকে ইসারা করে অবস্থাটা সামলেছিলাম। আপনার গায়কী রীতিটাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বিনা তালেই আপনি ত্যাগরাজ, গোপালকৃষ্ণ, ভারতী প্রভৃতির ভজন-

---

[1, 2, 3] দক্ষিণ-ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের রান্না কার খাবার।

[4] কাঁচা মুগের তৈরি খাবার।

[5] রামনবমীর দিন নারকেল সহযোগে ভাজা মুগের তৈরি শরবৎ আর পাখা দানের রেওয়াজ আছে।

গান বড়ো সুন্দর ঢঙে গেয়েছিলেন। অনুভূতির এক অদ্ভুত প্রবাহে ভেসে গিয়েছিলাম। ভাবে বিভোর হয়ে হৃদয় আপনার বিগলিত হয়ে পড়েছিল। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ফলে সি. ও. এ. বলেছিল যে বিখ্যাত এক সংগীত ঘরানার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রয়েছে। ষাট-বছর আগেকার কথা। আপনার ঠাকুরমা ভোরে উঠে কাবেরী নদীত স্নানে যাবার সময় 'উররে রাঁমৈয়া' গানটা জোরে গাইতেন। সে-গান শুনে বাতাস আর গাছপালা সব চমকে যেত। খাঁটি ভাবমগ্ন কোনো সংগীতজ্ঞের হৃদয়ের স্বতোৎসারিত গান যদি কেউ শুনতে চাইত, তবে মহিলার কাছে তারা অনুরোধ জানাত। এ-সব কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, ভাবের বেশি কিছু হলে আমার হৃদয় ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। নেহাত-ই ফাইল, রেকর্ড ইত্যাদি ব্যাপারে একজনের অধীনে কাজ করছি তা নয়, বরং এক গুণীর সংস্পর্শে থেকে কাজ করছি—এ-চিন্তাই মনে বেশি উদয় হত। ন'টাকার চাকরি করে ভালো ভালো কাপড়-চোপড় পরা—তাদের দলে আপনি নন। আপনি মহান এক সংস্কৃতি-পরম্পরার ধারক। আজকাল আপনাকে দেখলে মনে হয় কাবেরী তীরের এক ছায়াঘন কুঞ্জে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আপনার কথা শুনলে মনে হয় নদী-কুঞ্জের চারিপাশে জমায়েৎ সব কোয়েল আর নীচী পাখির ডাক শুনছি। মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারের বেশি আর আপনাকে কি করতে পারি?

আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহেতুই নীচের বিষয়টার অবতারণা করছি।

সহায়ক করণিক মহালিঙ্গম গত চার-পাঁচ দিন যাবৎ কী যে সব বলছে। সে বলছে অ. অ. আয়ারের অর্থ আসল আগুবরী (ধোঁকাবাজ) আয়ার। এ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। 'এই মহালিঙ্গম, বড়োদের সম্বন্ধে এ-ধরনের কথাবার্তা বলবি না। আয়ার সদাশয় ব্যক্তি। সাধারণ একজন গভর্ণমেণ্ট অফিসার মাত্র নন। তিনি পরম জ্ঞানী ও বিদ্বান। তাঁর নিন্দা করলে তোর মুখে পোকা পড়বে,' আমি ওকে বলেছি।

'তুই যা যা বলছিস, ঠিক সেই-সব কারণেই আমি তাঁর নিন্দা করছি, সে বলল। যা সে বলে গেল তাই সংক্ষেপে বলছি।

প্রতিবারেই কখনো কোচিন কখনো কোয়েম্বাটুর, কোনো সময় তিরুচী, কখনো বা তিরুবন্তপুরম, কোনো কোনো সময় মাদুরাই কিংবা কখনো মহীশূর আপনি যান। এ সব জায়গা থেকে ফেরার সময় রেলের টিকিট আপনি কখনোই কাটেন না। গাড়ি ছাড়ার সময় হলে প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসেন। জায়গাটা ঝেড়ে-পুছে বিছানাটা বিছিয়ে ফেলেন। জানালা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে রাখেন, সাবধানতা হিসেবে সেফটি-ক্যাচও লাগিয়ে দিয়ে শান্তিতে নিদ্রা যান।

'আমাদের কাউকে এ অবস্থায় এসে জাগালে মনে হবে যেন টিকিট চেকার ভিখারিদের ওঠাচ্ছে। আমরা সব থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার কি-না? কিন্তু ওই মহান ব্যক্তিকে কে জাগাবে? উনি তো ফার্স্ট-ক্লাসের প্যাসেঞ্জার। কখনো কখনো রাত দুটো বা তিনটের সময় ওঁর চোখ খুলে যায়। কিন্তু ফার্স্ট-ক্লাসের যাত্রীর কাছে? কে যাবে

সে সময়। আবার তিনি আরাম করে শুয়ে পড়েন। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশন পৌঁছে কুলীকে বিছানা নামাতে বলে, নীচে নেমে তিনি দাঁড়ান। বি সেকশনের ক্লার্ক আয়াদ্দুরাইকে একটি প্লাটফর্ম টিকিট নিয়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ভীড়ের মধ্যে তাঁর বিছানা ইত্যাদি বাইরে চলে আসে। আর ওরা দুজনে ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পৌঁছে যায়।

'এই মহালিঙ্গম, কি বক বক করছিস?'

'আমি বক বক করছি? আমার কাছে প্রমাণ-পত্র রয়েছে। প্রমাণ! জন্মে এ লোক কখনো টিকিট কাটে নি...কোনো দিন গোলমালে টিকিট চাইলে বলে, 'আমার কাগজ-পত্র, পাস, টিকিট ইত্যাদি আমার পার্সোন্যাল ক্লার্কের কাছে রয়েছে। ওই দেখুন, সে আসছে...' আর চুপি চুপি সে সরে পড়ে। থোড়াই সে তোমার-আমার মতো সাধারণ মানুষ। আমাদের চেহারায় ছাপ রয়েছে যে আমরা কেরানী। তাঁকে দেখে মনে হয় না কি যে কোনো জায়গার দেওয়ান? কী চেহারা-ছবি? কেমন দাপটভরা তার দৃষ্টি? এহেন লোক যদি কিছু বলে বা ইশারা করে, তা হলে আবার মুখ খুলে কারুর কি কিছু বলা সম্ভব?

'হ্যাঁ, ওসব আমি বিশ্বাস-ই করি না।'

'তোর বিশ্বাস করা না-করায় আমার কি যায় আসে। আমি সব প্রমাণ একত্র করে রেখেছি। একটা কাগজে সব লিখে তাঁর ও তাঁর অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

প্রমাণ! তোর কাছে তা এল কি ভাবে?

'সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে অ. অ. আয়ার কোচিন থেকে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চড়েছিল। তাই নয়? পোনেরো তারিখে সীট রিজার্ভ করার কথা। কিন্তু লিস্টে তার নাম নেই। আর হিসাবের বাইরেও কোনো টিকিট বিক্রি হয় নি। কিন্তু সেই ট্রেন থেকে সে নামল। কি করে হল? গত বছর মে মাসের ছ' তারিখে যে গাড়িতে এসে সে পৌঁছল, তাতে কুড্ডুলুর স্টেশন থেকে ফার্স্ট ক্লাসের কোনো টিকিট বিক্রি হয় নি। তবে সে এল কি করে? কিন্তু তার তরফে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে যে সে সেই গাড়িতেই এসেছে আর পয়সাও নিয়েছে সেই হিসেবে। এ ধরনের কাজ কে করে? পরমজ্ঞানী? না আণ্ডাবরী (ধোঁকাবাজ)?...একে এখান থেকে তাড়িয়ে তবে অন্য কাজ করব। আমি সব স্টেশন মাস্টারদের কাছ থেকে দিন তারিখ অনুযায়ী সব খবরাদি লিখিতভাবে নিয়েছি মশায়। এ কথা ভাবিস না যে খালি টিনের কৌটোর মতো অকারণ আওয়াজ করছি।

'ঠিক আছে, জোরে চিৎকার কর—মানা করব না। তবে প্রশ্নের জবাব দিয়ে চেঁচামেচি কর।'

'বল কী প্রশ্ন করবি?'

'মেনে নিচ্ছি, যা বলছিস, আমার সাহেব সে-সব করেছে।'

'মানছি? এ-সব যে করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে।'

'ঠিক আছে, করেছে, কিন্তু তাতে তোর কি?'

'কি? এতে আমার কি? খুব ন্যায়ের কথা হল এটা? এই পয়সাটা কার? সরকারের অর্থাৎ আমাদেরই, কারণ সেটা আমরা কর হিসাবে দিচ্ছি। একটা আধলাও খরচ না করে প্রতি দফাতেই সে রাহা-খরচ হিসাবে দুশো টাকা করে নিচ্ছে। এতগুলো টাকা যে পাচ্ছে, সে, সব সময়েই যে প্লাটফর্ম টিকিট নিয়ে এসে বড়ো বড়ো বিপত্তির হাত থেকে বাঁচাচ্ছে, তাকে পাঁচ-দশটা টাকা দিতে পারে না? আর ও তো একেবারেই গো-বেচারা। এ শুধু ধোঁকাবাজই নয়, পরের উপকার অস্বীকার করে। একেবারে জানোয়ার। যতই সংগীত শিখুক, যত শাস্ত্রই পাঠ করুক, তাতে কি?'

'যেন ল্যাঙট কষে লড়তে নেমেছিস? এত তম্বি কেন? তোকে কি সে কোনো দুঃখ দিয়েছে?'

'এ-সবই কি যথেষ্ট নয়? আমায় দুঃখ দেবার আর কি প্রয়োজন? গত বছর তোর এই পরমজ্ঞানী লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে দফতরের নানা কাগজপত্র পরীক্ষার জন্য মেলবারমে বিশ দিনের জন্য গিয়ে খোঁজখবর ও লেখাপত্রের ব্যাপার সারতে হবে। সেই হিসেবে ভাড়াও নিয়েছিল। কিন্তু সে সেখানে ছিল মাত্র দুদিন। ওর ক্লার্ক ছিল বিশ দিন। এরকম কত চার দিন কাটিয়ে ষোলো দিনের পয়সা আর তিন দিন থেকে দশ দিনের পয়সা নিয়েছে।'

'তোর এত রাগ কেন ওর ওপর?'

'সে চুপ করে থাকলে আমার এত রাগ হত না। শুক্রবার আমাদের সবাইকে ডেকে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন কেন? উপদেশ কেন দিতে যায়? লেখাপড়া জানে সেটা অফিসারদের দেখাতে চায়। ভালো ভাষণ দিতে পারে তো চাকুরি ছেড়ে নির্বাচনে নেমে পড়ুক। আমাদের সবাইকে ডেকে উপদেশ দান, যারা আসে নি তাদের নাম লিখে রাখা, পরে তাদের বলা তোমরা সব বড়ো তাই না? আমার কথা তো শুনবে না বলে সুর ধরা আর যোগ করা, 'রাজনীতি আর মহর্ষিদের ভাষণই কেবল শুনবে।' এই টিপ্পনী কেটে হাসা আর খারাপ রিপোর্ট লেখা—এ কোনো কিছুই আমার পছন্দ নয়। এখান থেকে ওকে না সরানো পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেব না। সব প্রমাণপত্র নিয়ে এর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এক আরজি লিখছি। আগামী মাসে ওকে কাজ থেকে ডিসমিস করিয়ে জেলে না পাঠাই তো দেখিস।'

আমার আর মহালিঙ্গমের মধ্যে এটুকু কথাবার্তাই হয়েছিল। তার নালিশপত্র আর প্রমাণও দেখেছি। ছেলেটা মিথ্যে কথা বলে নি। বাস্তবিকই সে নিজের বক্তব্য জোরদার করার জন্য অনেক প্রমাণাদি একত্র করেছিল। কিন্তু সেই গোঁয়ার এতেও সন্তুষ্ট হয় নি। আর এক গল্পও সে শুনিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এই ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ছ'টি দোকান থেকে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস, কেরোসিন তেল, ইত্যাদি কিনেছিল।

স্বাভাবিক সময়ে যেমন জীবন কাটায় তার চেয়েও আরামে সে দিন কাটিয়েছিল। সে সময় সে ধরা পড়ে আর দেবদাস নামে এক কেরানী তাকে বাঁচায়। সেই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ দেবদাসের তিন বছরের ইনক্রিমেণ্ট সে বন্ধ করিয়ে দেয়। আমি সত্যি কথা বলছি—সাধারণত এ-সব কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তবে কথাটা প্রমাণযুক্ত, না হলে অবিশ্বাস করতাম। এই বদমাইসের সব প্রমাণই তার কথা বিশ্বাস করাতে আমায় বাধ্য করেছে। এর জন্য আমায় মাপ করবেন।

এটুকু আমি বলতে পারি যে, সব কথা শুনে আর নিজের চোখে দেখার পর আমার চোখের ঘুম চলে গেছে, আপনার আঙুল আমার চোখের সামনে ভাসছে। বাঁ হাতের আঙুল বীণার তারের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন 'দাশরথে' সম্বোধন করে রামের গায়ে আপনি হাতে বুলোচ্ছেন। 'সভাপতিক্কু বেরু' সুর-সংগতের সময় আপনার আঙুল-চালনায় মনে হয় যেন তিল্লের শিবকে ছুঁয়ে পুলক শিহরণ জাগছে আপনার। আপনার সেই পরম আনন্দ আমাদের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য আপনার বাঁ হাতের আঙুল তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে মধুর সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। আমি তাতে এক পরম আনন্দের আস্বাদন লাভ করেছি। এতে আবার মনে এক সন্দেহ জেগেছে যে, এই আঙুলেই কি মিথ্যা হিসাবপত্রে হস্তাক্ষর দিয়ে যাচ্ছে? তন্ত্রল্লাসে দুদিন কাটিয়ে বিশ দিন কি করে লেখে? টিকিট কাটতে যে আঙুল পয়সা নাড়ে না, তা মিথ্যা কি করে লেখে যে এত পয়সা খরচ হয়েছে, আর তা গ্রহণই বা করে কিভাবে? বীণায় যে হাত খেলা করে বেড়ায় সেটা আবার এই নীচ কর্মেই বা লিপ্ত হয় কেমন করে? বীণার তারের ওপর বাঁ হাতের আঙুল চলে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু ডান হাতের আঙুল তার টেনে টেনে চলে। এই দুই হাতেরই কাজ একটা মাথাই তো করাচ্ছে। সেই এক মনই তো করছে। তাই না? সেটা কি করে সম্ভব? এই প্রশ্নটাই মনে ঘুরে ঘুরে আসছিল, আমার ঘুম নষ্ট করে দিয়েছিল। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি সেই আঙুল দিয়েই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে এক তুচ্ছ ব্যক্তির আকুলতা দূর করবেন। আংটি-পরা সেই সুন্দর পবিত্র আঙুল আমি স্বপ্নেও দেখি।'

আমার যা বিচার, সে যুক্তির দ্বারাই আপাতত মহালিঙ্গমকে শান্ত করলাম। পরিবার তার বড়ো। আমি তাকে বোঝালাম যে তার নিজের সাতটি পুত্র-কন্যা ছাড়াও দুটি বিধবা বোনের ভরণ-পোষণ তাকে করতে হয়। সঙ্গে যোগ করলাম, 'ওরে মূঢ়, এরকম নীচ কাজে লিপ্ত হোস না।' এই বলে ওকে নিরস্ত করলাম। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে এখানে আসার পর ওকে একলা ডেকে সব বুঝিয়ে বলবেন আর এই আত্মিক সঙ্কট থেকে আপনি মুক্ত হোন। আমার ডান হাতের আঙুল যদি কোনো অপরাধ করে তবুও দিব্য-ধ্বনি সৃষ্টিকারী এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে মোহিত করে যে বাঁ হাতের আঙুল সেটা তাকে উপহাস করবে। সেই বাঁ হাতের আঙুলের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সময় সময় দক্ষিণ হস্তের আঙুলও তার চেপে

ধরে আর সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে নেয়। 'এতে আমাতে কোনো দোষ বর্তাবে না। মনে হচ্ছে যেন আপনার এধরনের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনাকে অনেক প্রণাম—আপনার বন্ধু ক, খ, গ।'

□

নোট—নিজের নাম কেন লিখছি না, তার কারণ উল্লেখের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

অ. অ. আয়ার দু-তিনবার চিঠিখানা পড়ল। অন্ধকারের বুক চিরে তার ট্রেন ছুটে চলেছিল। ফার্স্ট ক্লাসের ওই কামরায় দুটোই মোটে সীট। সামনের সীটে এক সর্দারজী পাগড়ীটা খুলে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে।

এ চিঠি কার পক্ষে লেখা সম্ভব? হয়তো ওই মহালিঙ্গম লিখেছে...শয়তান কোথাকার! আর এই চিঠিখানা হাতে এসে পৌঁছানোর ব্যাপারেও একটা রহস্য রয়ে গেছে। একটা চাপরাশি বিছানাটা কামরায় এনে রেখেছিল। গাড়ি ছাড়ার সময় হঠাৎ জামার পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিয়ে বলল, 'আরে আমার ভুল হয়ে গেছে! বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় এক ভদ্রলোক এসে আমায় এটা দিয়েছেন আর বলেছেন, 'সাহেবকে দিয়ে দিয়ো। তাঁকে এখন বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই। রাত্রে যখন বেরোবেন তখন তাঁকে দিয়ে দিয়ো।' সেটা সন্ধ্যার সময়, আর আপনি তখন পূজায় বসেছিলেন। আমি মনে করে রেখেছিলাম যে খামটা আপনাকে দিয়ে দেব, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। আমি সর্দারজীকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে 'মাদ্রাজ যাচ্ছি' বলে নিজের বিছানা বিছিয়ে তাতে গা এলিয়ে দিল। তারপর সর্দারজী নিজের মাথার দিককার বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অ. অ. আয়ার নিজের শিয়রের বাতিটা জ্বালিয়ে খাম খুলে চিঠিটা পড়তে লাগল।

চিঠিটা সে তিনবার পড়ল। সেটা চার বার পড়ার পর, তার মুখের চাপা হাসির ভাবটা মিলিয়ে গেল। তার গূঢ় অর্থটা ক্রমে বুঝতে শুরু করল। এই গোলমালের পেছনে অনেকেরই হাত রয়েছে। এধরনের লোক কেবল যাকে ঈর্ষা ক'রে তার ক্ষতিই করে না, তদুপরি অন্যের সুখে থাকাটাও তার কানা চোখে সয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তি এই প্রমাণপত্র সব একত্র করল কি করে? কাজটা তো সোজা নয়, এর জন্য অবশ্যই অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

তার মাথা ঘুরতে লাগল। এতখানি খোলাখুলিভাবে...সবার সামনে...আমার এই অপমান। কথাটা তার মাথায় পাক খেতে লাগল। মন তার অশান্ত হয়ে উঠল। মনে হল সেই মুহূর্তেই মহালিঙ্গমের সঙ্গে দেখা করে। তবে রেলের তো আর পাখা নেই! পরদিন সকালে গাড়ির মাদ্রাজ পৌঁছানোর কথা।

মাথার কাছে জ্বলা আলোয় তার হাতের আঙুলগুলো নজরে এল। অঙ্গুষ্ঠতে নিজের নামধেয় পবিত্র আংটি একটা চকমক করছিল। আঙুলের দিকে দেখার সময়

মনে হচ্ছিল যেন তার চোখ জ্বলছে। চোখ সে ফিরিয়ে নিল। বন্ধ করে রইল চোখ। চাদরে পা ঢেকে দিল। মুখটাও ঢেকে নিল। কিন্তু মনের ভয়টা বাড়তে বাড়তে ক্রমেই একটা বিশাল আকার ধারণ করছিল। ছোটো পোকা যেমন বাড়তে বাড়তে একটা লম্বা-চওড়া সাপের চেহারা নেয়, ভয়টা তেমনি বেড়ে চলেছিল। ঝোলানো কোটটার পকেট থেকে ঘড়িটা সে বার করল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পরের স্টেশন এসে যাচ্ছে। এই ভেবে একটু বড়ো করে শ্বাস টানল। এক-একটা মুহূর্ত সে গুণে চলেছিল। যেন এক যুগ বাদে এসে পরের স্টেশনে গাড়িটা থামল।

আ. অ. আয়ার নীচে নেমে গাড়ির পেছন দিকটায় চলল। পরের কামরাটাই ছিল গার্ডের গাড়ি।

'গুড ইভনিং, আমি তাড়াতাড়িতে গাড়িতে চড়েছি। টিকিট কাটবার সময় ছিল না। ইঞ্জিনের দিক থেকে তৃতীয় কামরাটায় রয়েছি। টিকিটের টাকাটা আপনাকে এখন দিয়ে দেব কি?'

গার্ড বলল, 'ঠিক আছে, মশায়। এখুনি টি. টি. এসে যাবে। আমি তাকে বলে দেব। সে নিজেই পয়সা নিয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে। আপনি যান, বোধহয় এখুনি সে আসছে।'

অ. অ. আয়ার নিজের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। বাতি জ্বলছিল কামরায়। সর্দারজীকে দেখা যাচ্ছিল না। সম্ভবত বাথরুমে!

টি. টি. আই.-এর প্রতীক্ষায় অ. অ. আয়ার নীচেই দাঁড়িয়ে ছিল।

ওই দেখো লম্বা হাতা খাকি রঙের জামা আর টুপী পরা একজন আসছে। সম্ভবত ওই টি. টি. আই.

'হায় রে! ওহো! হো! গেল গেল! আমার হাত...ও মাগো!'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সর্দারজী বাইরেকার এই দরজাটা সজোরে বন্ধ করল। পাশে দাঁড়ানো আয়ারের দিকে তাকায় নি। দরজায় হাতটা এসে গেছে। চিৎকার শুনে সর্দারজী দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল।

আয়ার প্ল্যাটফর্মে বসেই আবার সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

চোখ খুলে সে তার চারপাশে অনেক লোকের ভিড় দেখতে পেল। একজন হাতের রক্তধারাটা মুছে দিচ্ছিল। বাঁ হাতের আঙুল চেপ্টে গিয়েছে। আঙুলের হাড়ও টুকরো হয়ে গেছে। গাড়ি সেখান থেকে ছাড়তে আধঘণ্টা দেরী হল।

সারারাত ধরে সে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। সর্দারজী দুবার 'মাপ করবেন' বলে শুয়ে পড়ল। ভোর হল। মাদ্রাজ পৌঁছল।

একটা আঙুল তার পুরো কেটে ফেলতে হল। টি. টি. আই. তার কাছে টিকিট চায় কি করে? নিয়ে যাবার জন্য স্টেশনে আগত আয়াদ্দুরৈর সঙ্গে তাকে ট্যাক্সিতে বসাল। সমস্ত পথটা আয়াদ্দুরৈ সঙ্গে রইল।

অ. অ. আয়ারকে তিন মাসের ছুটি নিতে হল। দফতরের প্রত্যেক কর্মচারী-অফিসার থেকে চাপরাসী পর্যন্ত সবাই তাকে দেখতে গেল।

একদিন মহালিঙ্গমও গিয়েছিল। অনেকক্ষণ সে পাশে ছিল। একা কথা বলার অবসর পেয়ে সে বলল, আমি কারোর কোনো ক্ষতি করব না। আমি সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' চ্যাপ্টা ভাঙা আঙুলটার দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

তার চলে যাওয়ার পর অ. অ. আয়ার তার পটি-বাঁধা আঙুলটার দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তারের কথা শুনে সে বুঝেছিল যে এ আঙুলে আর বীণা বাজানো যাবে না। আঙুলটা আর আঙুল হিসেবে সে দেখতে পাচ্ছিল না। তাজা গ্লাব-দানার মতো সেটা দেখাচ্ছিল। সব-কিছুই যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল—সেই চিঠিটা আর তাতে আঙুলের উল্লেখ, দরজা বন্ধ হওয়া, আঙুল চেপ্টে যাওয়া। বাঁ হাতের এই আঙুল কি দোষ করেছে? ভগবান ডান হাতের আঙুলের পরিবর্তে বাঁ হাতের আঙুলটা আমার কেটে দিয়েছেন। তাঁর লীলাই বিচিত্র!

'আরে, আগে তো তুমি নির্দোষ সীতাকে বনে পাঠানোর মতো নির্মম কাজও করেছ! কথাটা বলতে বলতে অ. অ. আয়ার তাকিয়ায় মাথাটা ঠেকাল।

□

আর. বি. বেঙ্কটরামন

'কন্নন' নামক ছোটদের পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বহু গল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাধারণ বিষয়কে অসাধারণভাবে প্রকাশে তিনি দক্ষ। তাঁর গল্পগুলি পাঠকের চিন্তা-শক্তি প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

বাবা এল না

তিনটি মেয়েই দেখতে একরমই—একই ছাঁচে ঢালা সোনার প্রতিমার মতো। এদের বয়সের ব্যবধান ছিল দু বছরের—ক্রমানুসারে, সতেরো, উনিশ আর একুশ। গায়ের রঙও তিনজনের একই রকম। মাথায়ও সমান সমান—ফারাক কিছু ছিল না। এরা যেন গাছের একই শাখায় দোল খাওয়া তিনটি কলি।

তিন জনেই অবিবাহিতা। বিয়ের কোনো চিন্তাই কারোর মাথায় নেই। কায়ক্লেশে যেখানে দিন কাটছে, সেখানে বিয়ে শাদীর কথা ওঠে কি করে?

তাতে কি? শহরে তো কত বিয়ে হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় কলা গাছ দাঁড় করানো। বাজনাও শোনা যাচ্ছে। ইঁদুরের ল্যাজের মতো চুলওয়ালা আর খোঁড়াদেরও শুভদিন আগত। এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসের কুশ্রী মঙ্গলম আর কোয়েল পাখিকে লজ্জা দেবার মতো কোমলমের ভাগ্য প্রসন্ন। এই মেয়ে তিনিটি সেই রাস্তা দিয়েই রোজ যায় আর ফেরে। বিয়ের জন্য আগতদের মোটরে আর স্কুটারে আসতেও দেখে। জরির আঁচল আর টেরিলিনের প্যান্টের সরসরানিও শোনে। 'অফিস বস'-এর কথা স্মরণ করে পা চালায়। এদের থামবার সময় কোথায়? থেমে দেখার চিন্তাই বা করে কিভাবে?

সবার বড়ো—বেদবল্লীকে প্রতিদিন সকালে দশটায় টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসতে হয়। দ্বিতীয় জন—কনকবল্লীকে দশটা নাগাদ কলেজে পৌঁছতে হয়। তৃতীয় কন্যা—চম্পকবল্লী দশটায় পৌঁছলে বিনা অপেক্ষাতেই টাইপ মেশিন পেয়ে যায়। সে কাজেও যাচ্ছে না, কলেজেও না। ম্যাট্রিক পাস করার পর টাইপিং ইনস্টিট্যুটে সে ভর্তি হয়েছে। দেরীতে গেলে খালি না হওয়া পর্যন্ত মেশিনের জন্য ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বেদের বেতনের ওপরই সংসারযাত্রা নির্ভর করছে। সে টাকায় পেট চলে যায়। রসম[1] আর ভাত—অবশ্য এটুকুকে তো ভোজনই বলা যায়। মাইনে পাওয়ার পর

---

[1] তেঁতুল, মরিচ ইত্যাদিতে তৈরি ভাতের সঙ্গে খাওয়ার পানীয় (খুবই মামুলি ধরনের আহার)।

মাসের প্রথম সপ্তাহে দুদিন ওদের কাঁচা সব্জীর তরকারি চোখে পড়ত। রোজই এভাবে ধুমধাম করে খরচ করলে কনকেরই বা কলেজ আর চম্পারই বা ইনস্টিট্যুট যাওয়া হয় কিভাবে? কোনো ক্রমে কষ্ট করে দশটা মাস সে ইনস্টিট্যুটে যেতে পারলে আর তার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না—কোনো একটা কাজও তখন পেয়ে যাবে। বেদের নিজের অফিসেই চাকুরি দিয়ে দিতে পারবে। তার জন্য ওপর মহল থেকে একটা সুপারিশ সে করিয়ে রেখেছে। ততদিনে সে আঠারো বছরের হবে আর একটা 'ডিপ্লোমা'ও পেয়ে যাবে। সে পর্যন্ত এই অবস্থাই চলবে—অন্যথায় ভালো খেলে কাপড় কম হবে আর ভালো পরতে গেলে খাওয়ায় টান পড়বে। এসময় অন্য আর কি করা সম্ভব?

এমন কোন কষ্ট আছে যা তারা অনুভব করে নি? তবে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার চেয়ে অন্য কোনো কষ্টই বেশি নয়। তাই না। চম্পা চাকরিতে লেগে গেলে ওরা আরো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে। কনককে আরো দুবছর পড়তে হবে। তারপর সে ট্রেনিং নেবে। তাতেও আরো একবছর। এভাবে তিনটে বছর কেটে গেলে তাদের আর কোনো কষ্টই থাকবে না। যা ইচ্ছা কিনতে পারবে, যা মন চাইবে খেতে পারবে। খুব আরামে থাকবে ওরা। সেসময় পর্যন্ত অন্য কিছু ভাববার অবসর তাদের নেই। দেশে দুনিয়ায় কত কী কথা হয়, হোক-না। ও-সব ব্যাপারে ওদের ভাবনা হতে যাবে কেন?

মেয়ে তিনটি জানে যে ওদের মা সৌন্দরম সব কষ্ট নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে। ধৈর্য সহকারে সব সহ্যও করেছে। যখন একের পর এক বিপদের পাহাড় এসে মাথায় ভেঙে পড়েছে, দুঃখের পর দুঃখ এসেছে, মেয়ে তিনটি ভীত-চকিত হয়ে মায়ের পেছনে এসে লুকিয়েছে।

সৌন্দরম সব দুঃখ যেন চুমুক দিয়ে টেনে নিয়েছে আর অটুট ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এমনভাবে কাজে আবার লিপ্ত হয়ে গেছে যেন কিছুই হয় নি। মনের এই অপূর্ব দৃঢ়তা আর অসীম ধৈর্য এ পেল কোথা থেকে? এ ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার চেয়ে মেয়েরা গর্বই বেশি অনুভব করত।

ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সৌন্দরমের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিল না। এখন সে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। আর পরিবারের সুখ-শান্তি বজায় রেখে সব বিচার-বিবেচনা, চাল-চলনের ব্যাপারে যা করণীয়, একাই সে করে যাচ্ছে। সে এক প্রজ্বলন্ত দীপশিখার মতো সৌন্দর্যময়া। সিঁদুর আর ফুল সহযোগে নিজেরই নয়, আঙিনারও শোভাবৃদ্ধি করত। তার হাতের ছোঁয়া লাগলে আহার্যেও নতুন স্বাদ আর সুগন্ধ পাওয়া যেত। কী করে এ-সব সম্ভব হত, কিছুই বোঝা যেত না।

কত-না কত লোক এসে তার হাতের রান্না খেয়ে প্রশংসা করে গেছে। কিন্তু যার প্রশংসার প্রয়োজন ছিল, যার প্রশংসায় তার মন সত্যিই আনন্দে ভরে উঠত কোনো

দিন সে মুখ খুলে প্রশংসার একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি। বলা হয় যে কেউ মুখ ফুটে আশীর্বাদ না করলেও, পেট যদি তার ভরে যায়, তবে সে কৃতজ্ঞচিত্তে সেটা স্মরণ করবে। প্রশংসা যদি না-ই করল, তাতে হয়তো তত এসে যায় না। তবে টীকা-টিপ্পনী তো বন্ধ করতে পারত? কিন্তু সমালোচনা ছাড়া সে থাকতে পারত না। সত্যি সে এক বিচিত্র জীব, তার গুরুত্ব সে জানতে বুঝতে চাইত না। তাকে নিয়ে এত গর্ব অহংকার, তাই নেহাত অবোধ বলা চলে না।

যখন গ্রামে জমি-জায়গা ঘর-বাড়ি ছিল, তখন লোকের ওপর অধিকার কায়েম করে মজায় দিন কাটিয়ে, বসে বসে খানা-পিনা করে সমস্ত সম্পত্তি সে উড়িয়ে দিয়েছে। এদিক ওদিক যা বেঁচেছিল সেটুকুও তাস আর জুয়ায় নষ্ট করেছে। পাশের গাঁয়ে একটা বাড়ি আর সামান্য জমি ছিল। সেটা অঞ্জাকুরির কন্নম্মা নামে একটি মেয়েছেলে লিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে নেয়। একটা মেয়ে ছিল তার, বেদার চেয়ে এক বছরের বড়ো। সে মেয়েটাকে কি গান, কি নাচ সব কিছু শেখানোর জন্য এই ব্যক্তি সাধ্যমতো যত্ন নিয়েছে। গাছ লাগাল এক আঙিনায়, ফুল পড়ল গিয়ে অন্যত্র। খাওয়া-দাওয়া করত এখানে আর ঘুমোত অঞ্জাকুরিতে। তার সুবিধা অনুযায়ী সাড়ে নটায় একটা গাড়ি এখান থেকে যেত। সেটায় গেলে দশটা-সওয়া দশটায় সেখানে পৌঁছে যেত।

বলত যে এ-লোক ওদের ওখানে অনেকবার গেছে। সে গাঁয়ের যারা, নিজচোখে যারা দেখেছে, তারা দেখেই এ-সব কথা বলত।

কেউ কেউ সহানুভূতি জাগানোর জন্য বলত, 'কি রে সৌন্দরম, তোর তিনটে মেয়ে রয়েছে। সেই মুর্খটাকে নিজের ইচ্ছামতো পথে এভাবে যেতে দিস কেন?'

'আমি কি করব? অঞ্জাকুরির নাম নিলে আমায় মারতে আসে। জিজ্ঞাসা করলে বলে এ-সব কিছুই হয় নি।'

'চল বুদ্ধু কোথাকার! আমায় জিজ্ঞাসা করছে কি করি? কি করতে চাস এ ব্যাপারে? একথা বলার প্রয়োজন আছে কি?'

উপায় যা যা বাৎলেছিল, সব-কিছুই সে চেষ্টা করেছিল। ফল এই দাঁড়াল যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তার অলংকার সব ঘর থেকে গায়েব হতে লাগল। সে ব্যক্তির মন আর বদলানো গেল না। গোড়ায় তবুও চার-পাঁচ দিনে একবার বাড়ি আসত। পরে বাড়ি ফেরা একেবারেই সে বন্ধ করে দিল।

লোকেরা বলল যে তাকে অঞ্জাকুরিতে কিছুদিন দেখা গেছে। কে জানে সে নিজেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করল কিংবা তাকে আসতে মানা করে দেওয়া হল। মোটকথা তাকে সেখানেও আর দেখা গেল না।

সৌন্দরম অনেক প্রতীক্ষা করল। সংসার পুরোপুরি ঋণে ডুবে গেল। যা সামান্য অলংকার পত্র বেঁচেছিল সে-ও আস্তে আস্তে মহাজনের বাড়ি পৌঁছে গেল। এর

কিছুদন বাদে তার বড়ো ভাই শহরে ওর সঙ্গে থাকার জন্য লিখল। বাচ্চাদের সবাইকে নিয়ে সে গেল তার কাছে। ভাই সময় সময় টাকাপয়সা দিয়ে ওকে সাহায্য করত। সে সময় বেদার ফাইনাল পরীক্ষা। সহসা সৌন্দরমের বড়ো ভাই চোখ বুজল। পরিবারে মস্ত এক আঘাত এসে পড়ল। এর সঙ্গে ছোটো একটা আঘাতও ছিল—বেদা পরীক্ষায় ফেল করল। বিক্রি করে খাওয়ার মতো জিনিসও কিছু সঙ্গে ছিল না। ঘরে একটা দরজার কুণ্ডী, কলসী, পিতলের কেটলি আর একটা তাওয়া ছিল। এরকম এক গণ্ডগোলের মধ্যে বেদা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিল আর পাসও করে গেল। কেউ একজন দয়াপরবশ হয়ে তাকে টেলিফোন অপারেটরের একটা কাজও পাইয়ে দিল। সেই বেতন থেকে সে কী করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করল আর কনকাকে পড়াতে পাঠাল, সেটা আজ কল্পনা করাও যায় না। কত সময় না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। নানা প্রকার ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, বাসা বদল করতে হয়েছে।

তিনটি মেয়েই যৌবনবতী হয়ে উঠল। নিজেদের সৌন্দর্যে ওরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অবস্থা তো এমনই ছিল যে আর সকলের মতোই সেজেগুজে থাকার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগলেও সংসারে টানাটানির জন্য তা সম্ভব ছিল না। এরা কোনো না কোনো পরিবারের সঙ্গে একত্রে থাকত। বাইরে সমাজে শিষ্টাচার বলে কিছু ছিল না। সৌন্দরমের খুব ভয়ে ভয়ে, কঠিনতার মধ্যে দিয়ে এক-একটা দিন কাটত। এরই মধ্যে নানা প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে চম্পা একাদশ শ্রেণীতে উঠল। দুয়েক বছর একটা সাহায্য পেলে সে-ও কাজে যাবার যোগ্য হয়ে উঠবে। কনকা ভালো করে পড়ে নেয় তো পরে সবার দেখাশোনা করতে পারবে। পরাজয় না মেনে এত ধৈর্য সাহসের সঙ্গে ভুখা থেকে আধপেটা খেয়ে বেদার এই সামান্য বেতনের ওপর যেভাবে এই সংসার সৌন্দরম চালিয়েছে সেটা খুবই আশ্চর্যজনক।

একদিন কনকার কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তখন বেদাও বাড়ি ফিরে এসেছে। কলেজে বিশেষ কাজ থাকলে কনকা সকালেই বলে দেয়। আজ সেরকম কিছু বলে যায় নি। তাই সবাই চিন্তিত হয়ে উঠল। অনেক দেরিতে সে বাড়ি ফিরল।

'কী রে, এত দেরি হল কি করে?'

'মা, রাস্তায় বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

সৌন্দরম চুপ করে গেল।

'বাবার সঙ্গে। কোথায়।' অন্য দুই মেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সৌন্দরম ওদের দিকে দেখছিলও না, মনও তার সেখানে ছিল না।

'কলেজ থেকে ফেরার সময় রাস্তায় দেখা।'

'এর জন্যই তোর ফিরতে দেরি হল?'

'হ্যাঁ। কোনো সংগীত-দলের প্রধানের মত ঢিলে পাঞ্জাবী, জড়িপাড় ধুতি,

অঙ্গবস্ত্র ইত্যাদি পরে বাসস্ট্যাণ্ডে বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। গোড়ায় আমি তাকে দেখি নি। যখন আমার নাম ধরে ডাকল, তখন আমি মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে। শরীরে চন্দন আর অগুরু-আতরের সুগন্ধ আর মুখে পানের খোশবু।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'তখন বাবা আমাদের সবার কথা জিজ্ঞাসা করল। আমাদের ঠিকানা জানতে চাইল। আমি সব বলে দিলাম। ইতিমধ্যে বাস এসে গেল আর আবার দেখা করার কথা বলে বাবা বাসে চড়ে পড়ল।'

'এতেই তোর এত দেরি হল?'

'আমি হোটেলে গিয়েছিলাম। তাই দেরি হল। আমি না করেছিলাম কিন্তু বাবা শোনে নি। আমি বারবার কিভাবে আপত্তি করি?'

'আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না?'

'আর জানতে চাইল বেদার বেতন কত আর চম্পা কি করছে।'

বেদা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এখন থাকে কোথায়?'

'জানি না।'

'করে কি?'

'আমি জিজ্ঞাসা করি নি।'

'কেন জিজ্ঞাসা করলি না?'

'একবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা এসে গেল।'

সৌন্দরমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, এখন উঠে এসে যার যার কাজ করো।'

কিছু দিনের মধ্যেই এরা বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া, তার সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপার ইত্যাদি সবই ভুলে গেল। চম্পার পরীক্ষার ফল বেরল সংবাদপত্রে। এরা হনুমানজীর মন্দিরে গিয়ে একটা নারকেল ভেঙে বাড়ি ফিরল।

'ভাঙলি নারকেল?' জিজ্ঞাসা করতে করতে সৌন্দরম এগিয়ে এল। বারান্দায় দরজার পাশে এক মনুষ্যাকৃতি দেখে সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। চম্পাও মুখ ঘুরিয়ে দেখল কে তার পেছনে দাঁড়ানো। ওই তো বাবা! এই বাপ তাকে সাত-আট বছর বয়সের সময় দেখেছে। কনকার বর্ণনা থেকে বাপের যে চেহারা সে কল্পনা করেছিল, তার অনেকটা এরকমই ছিল।

হতচকিত হয়ে দৌড়ে দরজার পেছনে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল সৌন্দরম। বুকে এসে জোরে জোরে ঘা লাগছে। মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাল। তার প্রবেশের আগেই চন্দন আর আতরের সুগন্ধ ঘরে এসে ঢুকেছে। সংগীত-সম্রাটের মতো সে ঘরের ভেতরে এসে বসল। মনে হল যেন এ-স্থান তার উপযুক্ত নয়।

বিচিত্র অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল মেয়েরা।

'বাবা, এ-বাড়ি কি করে খুঁজে পেলে? আগে যেখানে থাকতাম, সে বাসার ঠিকানা তো আমি দিয়েছিলাম', কনকা বলল। 'আমি সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তবে ওখানকার ওরা বলল যে আমরা ওদের জানি না। তখন কি করি ভাবতে ভাবতে হনুমান মন্দিরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। সেখানে চম্পাকে দেখলাম। গোড়ায় তো ভাবলাম তুই-ই। চম্পা এখন এত বড়ো হয়ে গেছে। আবার সন্দেহ হল চম্পাই তো? তাই আমি আর কিছু বলি নি, এক রকম করে খুঁজেই বার করে ফেললাম বাড়িটা। এই নে, এগুলো ভেতরে নিয়ে রাখ,' এই বলে সে থলে থেকে তিনটে কলা বের করে দিল।

সৌন্দরমের সঙ্গে সে কোনো কথা বলল না। এত বছর বাদে ঘরে আসার পর সে-ও সেই স্বামীর সঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। তবে ভেতর থেকে সে আপেল কেটে পাঠাল, চা দিল। তারপর খুব জোর খাওয়া-দাওয়া হল। বাবার বাড়ি ফেরার অজুহাতে জ্ঞান হওয়া অবধি এই আজ প্রথম ভালো খাওয়া হল। কি রকম খারাপ হাল হল, যেকারণে কত কষ্ট তাদের সইতে হল—এ-সবেরই মূলে তাদের এই বাবা। এই কারণে যত অপমান তাদের সইতে হয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। যত দুঃখ পেতে হয়েছে তারও সীমা-পরিসীমা নেই। তবুও তারা সব ভুলে গেল। কিছু না হলেও এখন তো সে তাদের দেখতে এসেছে—এটা ভেবেই ওরা খুব আনন্দিত হল।

সবারই খুব আনন্দ হল। মনে হল বাড়িতে বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে। হাতের পাখাটা নাড়তে নাড়তে ন'টা নাগাদ সে শুতে গেল। তারপর কখন তার পাখা চালানো বন্ধ হল আর শুয়ে পড়ল, সে খবর মেয়েদের জানা নেই। ওদের মা সকালে উঠে স্নান সেরে কপালে বড়ো করে বিন্দী লাগাল। বাবা তখন ঘুমচ্ছে—এটুকু তারা বুঝল।

'বাবা বোধ হয় রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারে নি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাখা নেড়েছে না।' জিজ্ঞাসা করল চম্পা।

সৌন্দরম কোনও জবাব দিল না। জবাব পাবার জন্য অবশ্য চম্পা প্রশ্নটা করে নি।

বেদা অফিসে বসে বসে বাবার ফিরে আসার কথাটা ভাবছিল। তার মন এত আনন্দে ভরে উঠেছিল যেন কোনো ধনদৌলত সে পেয়ে গেছে। তার এই আনন্দ বর্ণনা করা যায় না।

'মা, তুমি বড়ো খারাপ। বাবা এতদিন বাদে ফিরে এল। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলছ না কেন?' চম্পা প্রশ্ন করল।

'ভাগ্ এখান থেকে। নিজের কাজ কর গিয়ে।'

'হ্যাঁ, তারা আপসে কথাবার্তা বলবে। যখন আমরা থাকব না তখন বলবে, আর

যখন তখন বলবে না,' বেদা বলল।

তার মনেও তো এরকমই কিছু ছিল। যদিও মা আর বাবা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে না, তবুও তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে ওরা এরকম বললে বোধহয় পরস্পর তারা কথাবার্তা বলবে।

'বলার কী রেখেছে? কথা বলাই কি সব?'

সবার আগে বেশি দুধ দিয়ে তৈরি কফি নিয়ে যাচ্ছিল। ধোঁয়া উঠছিল গরম কফি থেকে। কাঁধের চাদর দিয়ে গেলাসটা ধরে নেড়েচেড়ে খুব সোয়াদ করে নীরব এই লোকটি কফি খাচ্ছিল। পাতে খাওয়ার সময় হাত মেলে অঞ্জলি ভরে ভরে রসম খাচ্ছিল। নটা নাগাদ হাতে পাখা নিয়ে সে শুতে চলে যায়। দশটা, সাড়ে দশটায় যখন বোঝে যে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন পাখা দিয়ে অল্প আওয়াজ করে কাশতে থাকে। অন্ধকারের দিকে মুখ করে জল চায়। কে জানে কিসের তৃষ্ণা তার?

আপসে এরা কথা না বললেই বা কি? কথা না বলা হয়তো, বলার কোনো আবশ্যকতা ছিল না বলেই। চতুর্থ দিনে তাকে আর বিছানায় দেখা গেল না।

সকালে উঠে ভিতরে এসে চম্পা জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা কোথায়?' তার প্রশ্ন শুনে মনে হল এমন কিছু খোয়া গেছে, যা আছে দেখলেই সে তৃপ্ত হত।

'আমায় এসে জিজ্ঞাসা করিছঁস? যেন আমি তাকে আমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখেছি। সাতটা পর্যন্ত তো শুয়ে ছিল।'

'এখানে তো নেই।'

'তাড়াতাড়ি হয়তো উঠে পড়েছে।'

'বাথরুমের দিকেও তো নেই। ঘরে-ফেরা এ-লোককে তুমি যত্ন-আত্তি কর নি। একটা কথাও তার সঙ্গে বল নি। তাই তার আর থাকতে ভালো লাগেনি। গলদটা তোমারই। আমি তো তাই বলব।'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমারই সব দোষ', সৌন্দরম বলল। 'আমার ওপর যে অন্যায় উনি করলেন, সেটা সয়েছি। আমায় অকূলে ফেলে বাড়িঘর ছেড়ে চলে গেল—সেটা ভুলে ঘরে ফেরার পর অতিথি ভেবে তাঁর সঙ্গে কথা বলি নি। এই তো আমার দোষ!' কথা বলতে বলতে অজ্ঞাতে সৌন্দরমের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

চার-পাঁচ দিন একথাটাই তাকে দুঃখ দিতে থাকল যে সে এসে চলে গেছে। অনেক দিন বাদে তার হঠাৎ আসা, একসঙ্গে কাটানো ইত্যাদি বিষয় যেন সৌন্দরমের কাছে এক মধুর স্বপ্নের মতো মনে হল।

যেখানে পাখাটা নাড়তে নাড়তে বাবা বসে থাকত, চম্পার দৃষ্টিটা সেখানটাতেই তাকে খুঁজত। কিছুদিন পর্যন্ত একটা ভ্রমের মধ্যে রইল সে। এর মধ্যে কনকা এসে যেত, বেদাও এসে যেত। কথাবার্তার ধরনও বদলে যেত। যতই যাকে যা-ই বলুক, মায়ের বিরুদ্ধে তার একটা নালিশ জমে উঠল। কে জানে সৌন্দরম সেটা জানত

কিনা। সে কিন্তু এখন শুধু চম্পাই নয়। বাকী সবার সঙ্গেও, ঠিক আগের মতো মন খুলে কথাবার্তা বলত না।

তিন মেয়েই মায়ের এই পরিবর্তনটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিল। তবে এ বিষয়ে কেউই কোনো আলোচনা করে নি। কেবল চম্পার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তারা মায়ের সঙ্গে আদর সোহাগ করে যাতে সে আগের মতো হাসতে আর কথা বলতে পারে।

'কি মা, তোমার অমন উদাস ভাব কেন?'

'উদাস বলছিস?'

'তুমি বদলে গেছো। তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে? কোনো দুঃখ বা ক্রোধ রয়েছে তোমার মনে?' একদিন আড়ালে চম্পা জিজ্ঞাসা করল।

'আমার কোনো দুঃখ নেই, রাগও নেই,' একটি কথাতেই জবাব দিয়ে সৌন্দরম চম্পার প্রশ্নটা এড়াল। চলে গেল সেখান থেকে।

'না, তোমার মনে কোনো কথা রয়েছে। সত্যি কথাটা বলো তো মনে কী রয়েছে?' জিজ্ঞাসা করতে করতে চম্পা মায়ের পেছনে পেছনে গেল।

সৌন্দরম মুচকি হেসে বলল 'যা, আমার মনে কিছুই নেই। আমি তো তখনই সে কথা ভুলে গেছি।'

'তবে তোমার মধ্যে এই পরিবর্তন কেন এসেছে? তুমি ভয়ে ভয়ে কেন সামনে আসছ?'

'আমি কী করি ভেবে পাচ্ছি না। শরীরটা একদম ঠিক নেই।'

'বেদার অফিসে একজন লেডী ডাক্তার আসে। তার কাছে চলো না কেন?'

'হ্যাঁ। যাব। তবে আমার একেবারেই সময় নেই।'

'আজই চলে যাও। চাও তো আমিও সঙ্গে যাই। ইনস্টিট্যুট থেকে ফিরেই যাব।'

'হ্যাঁ, যাব। তুইও যাবি। সেটাই ভালো হবে।'

ইনস্টিট্যুটের সবাই একটা বিয়েতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ওদের সঙ্গে কাজ করে যে মেয়েটি তার বড়ো বোনের বিয়ে।। খুব ধুমধামের সঙ্গে বিয়েটা হচ্ছে। চম্পা যদি বিয়েতে যেত, তবে মায়ের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে আর যাওয়া হত না। তাই সোজা সে বাড়ি চলে এল। বাড়ির দরজায় তালা লাগানো ছিল।

পাশের বাড়ির বাসিন্দা এক মহিলা বাড়ির চাবিটা এনে দিয়ে বলল, 'মার শরীরটা ভালো ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে চলে গেছে। উনি তোমায় সেখানে যেতে বলে গেছেন।'

চম্পা সেই ডাক্তারের বাড়িটা জানত। সে চাবিটা সেই মহিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে সোজা ডাক্তারের বাড়িতে চলল। রওয়ানা হওয়ার সময় মনটা তার অস্থির অস্থির করছিল। সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কি জানি কি ব্যাপার। তার এসে পৌঁছানোর আগেই

মা চলে এসেছে ডাক্তারের বাড়িতে। এতৎসত্ত্বেও সে ধৈর্য ধরে ডাক্তারের বাড়ি পৌঁছালো।

সেখানে পৌঁছে সে দেখল যে বেদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। সে চমকে উঠল।

'তুই কখন এলি? মার সঙ্গে এসেছিস?'

'না, মা এখানে আসার পর ডাক্তার আমায় ফোন করলেন।'

'মার অবস্থা এখন কেমন?'

'ডাক্তার বাইরে এলে সব কিছু বোঝা যাবে। ডাক্তার জানেন না যে আমি এখানে। আমি বেশ অনেকক্ষণ এসেছি। মা ভেতরে রয়েছে।'

দুজনের বুদ্ধিতে কুলোল না যে কী করে। প্রায় পনেরো মিনিট বসে রইল ওরা। তারপর ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

'তোমরা কি অনেকক্ষণ এসেছ?'

'না, তেমন কিছু বেশি সময় নয়। মার শরীর কেমন?'

'আমি ইনজেকসন দিয়েছি। এখন ঘুমিয়ে রয়েছে।'

'হঠাৎ কী হল মার?'

'কোনো 'শক' পেয়েছে। কিছু একটা বিষয়ে চিন্তায় ছিল। তার দরুন শরীর অসুস্থ হয়েছে।'

'অজ্ঞান হয়ে পড়েছে কি? বুকের ভিতরটায় উথাল-পাতাল চলছিল?'

এ-সব কী জিজ্ঞাসা করছ তোমরা? জানতে তোমরা? তার পাঁচ মাস...।'

'হায়, হায়' মেয়েরা তীক্ষ্ণ-গলায় চীৎকার করে উঠল। তারা খুব আঘাত পেয়েছে কথাটায়।

'খুব সময়ে এসে পড়েছিল, তাই বেঁচে গেল। তোমাদের বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কেস ভণ্ডুল হয়ে যেত।'

'কী করলেন আপনি?'

'এখানে এসে পৌঁছুতেই তাকে অজ্ঞান করে যা করার আমি করে নিয়েছি। এখন আর প্রাণের আশঙ্কা নেই। আমি বলছিলাম না যে গভীর আঘাত বা বেদনার কারণে তার গর্ভ নষ্ট হচ্ছিল। বয়সও তো হল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একচল্লিশ বছর বয়স হয়েছে।'

'আর কি এবয়সে কতটা সইতে পারে, তাও এত বছর বাদে! অপেক্ষা করো, ওষুধটা লিখে দিই। দুদিনে ছেড়ে দেব। এরপর দুসপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বেদা আর চম্পা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল। কি বলা যায় ভেবে সংকুচিত হয়ে এখানে ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

সহসা চম্পার কি একটা কথা মনে পড়ল।

'বেদা, তুই বুঝতে পারছিস না?'

'না তো।'

'তুই পাঁচ মাস আগে যা বলেছিলি, সে কথা খেয়াল নেই। তুই বলিসনি যে আপসে ওরা কথা বলবে। যখন আমরা থাকব না, তখন বলবে। এরকম বলিস নি তুই?'

'তা, কি, এ তারই ফল?'

'তা নয়তো কি? তার ফলেই এ-সব।'

যখন ওষুধের কাগজ নিয়ে ওরা বেরিয়ে আসছিল, তখন কনকা দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছুল সেখানে।

'মার শরীর এখন কেমন?'

'এখন ভালো। ঘুমিয়ে রয়েছে।'

'ঘাবড়াবার মতো ব্যাপার কিছু নয় তো?'

'না, এখন আর ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

'আমি আর একটু আগেই আসতাম। রাস্তায় বাবার সঙ্গে দেখা হল। তাতে দেরি হয়ে গেল।'

'তুই কোথায় দেখলি তাকে?'

'কলেজ থেকে ফেরার পথে একটা বিয়ে হচ্ছিল। বিয়ের জন্য সে নাচ গানের ব্যবস্থা করছে। বলছিল যে সেখান থেকে ফিরে বাসায় যাবে।'

'কি কারণে? তুই ওষুধ নিয়ে যাবার সময় বলে যাস যে মা হাসপাতালে। আর তার আসার দরকার নেই। নাচ-ওয়ালীর সঙ্গেই যেন চলে যায়,' বেদা বলল।

'সে এখন ও আর কখনো যেন না আসে?' প্রশ্ন করল কনকা।

'কখনোই যেন না আসে, কখনই নয়' চম্পা দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

□

এল. এম. রামামৃতম

জন্ম ১৯১৬ সালে। অল্প বয়স থেকেই ইংরাজী ও তামিল ভাষায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্প তামিল পাঠক সমাজকে প্রভাবিত করেছে। গল্পের মাধ্যমে গভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করার ক্ষমতা অসামান্য। তাঁর গল্প সৌন্দর্য ও বিশিষ্টতা অর্জনে সক্ষম। বহু সুন্দর সুন্দর গল্প তিনি উপহার দিয়েছেন।

দিবাস্বপ্ন

কোনো কোনো লোকের মধ্যে কথার যে চাতুরী দেখা যায়, সে জিনিসটা আমার আদৌ আসে না। এ-সব লোকেরা সামান্য একটা কথাকে নুন ঝাল সহযোগে বেশ সরস করে বর্ণনা করে। এমনভাবে কথাটা বলে মনে হয় যেন তাদের সামনেই ঘটনা ঘটেছে। এ জাতীয় বর্ণনা শুনে শ্রোতারাও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

আমার এ-সব চাতুরী একেবারেই পোষায় না।। মস্তিষ্ক আর মনে বক্তব্য যে আবেগে ফুটে ওঠে, তার সিকিভাগও আমি গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারি না। উপরন্তু মনে হয়, যে অনুভূতিটা জাগল সেটা কত তুচ্ছ, গুরুত্বহীন। আবার এও মনে হয় না, এখনো যেন আমার মনোবেদনা প্রশমিত হল না।

কথাটা তেমন কিছুই নয়। আমি বাসে অফিস যাচ্ছিলাম।

কোথাও যাই বা কোনো জায়গা থেকে ফিরেই আসি, তাতে তফাতটা কোথায়?

আমি একজন নিতান্ত ছাপোষা মানুষ। সকালে উঠে কফি খেয়ে বাজারে যাওয়া, রেশন দোকান থেকে চাল আনা, তাড়াতাড়ি অফিস দৌড়ানো, সেখান থেকে ফিরে সমুদ্র তীরে গিয়ে হাওয়া খাওয়া, ফিরতে দেরি হলে, ঘরে হাঁকডাক করে স্ত্রীকে কথা শোনানো আর খাওয়ার পর শোওয়া—এই-ই আমার নিত্যকর্ম। এই দিনগত পাপক্ষয়ের যে-কোনো পরিবর্তনে আমার আনন্দ। কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটা কিভাবে সম্ভব? সবে একটি বাচ্চা মায়ের কোল থেকে নেমেছে। ঘরের বাইরে গিয়ে মাটি খেতে খেতে খেলা করছে। কোলের ছেলেটা রাতে কান্নাকাটি করে ঘুমটা মাটি করে দেয়। মন থেকে চিন্তাটা দূর না হয়ে যায়, সেই ভেবে গত তিনি মাস ধরে পেটে আবার এর-একটি সন্তানের লালন-পালন শুরু হয়ে গেছে। গলায় এত ভার ঝোলানোর পরও যদি কেউ পাখা লাগিয়ে আকাশে উড়তে চায়, তবে সত্যি কি সে উড়তে পারবে?

সে কারণেই...হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, আমি বাসে যাচ্ছিলাম।

আপনাদের জানা আছে বাসে যাতায়াত করা আজকাল কত কষ্টকর। প্রতিটি বাসেই যেন উৎসবের ভিড়, অর্থাৎ সিনেমা ঘরের প্রথম শো-র মত ভিড়ে বোঝাই।

বাসে চড়াই কঠিন আর ভিতরে গিয়ে সুবিধামতো দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। বসার জায়গা পেলে তো আর কথাই নেই।

আমি বসেছিলাম।

'ঘড়ক্-ঘড়ক্-ঘড়ক্-ঘড়ক্।'

একটা জায়গায় এসে থেমে পড়ল বাসটা। রোদে দাঁড়ানো লোকজনের জমায়েৎ বাসের ভিড়টাকে আরো বাড়িয়ে দিল। একটি মেয়ে এসে আমার পাশে বসল—আমায় পাশ কটিয়ে সোজা এসে ঢুকে পড়ল।

রঙটা ওর কালোই বলা চলে। নেহাতই অল্প-বয়স্ক মেয়েটি। বয়স আঠারো কি কুড়ি। কানে সাদা-পাথর ঝুমকো। তা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল দ্যুতি। গলায় সোনার হালকা এক চেন। গাঢ় নীল শাড়ীখানার পাড়টা লাল। অপূর্ব মেয়েটির মুখ।

ঘুরে বেড়ানোর সময় আলাদা করে কাউকে দেখার কোনো প্রয়োজন আমার হয় না। মন্দির প্রাচীরের চারিদিকে ঘোরাফেরার সময় গাধাও তো দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মানে এই নয় যে সেটার শিল্পসৌকর্য উপভোগে ব্যস্ত। মনে নানা উল্টোপাল্টা ভাব জাগে—কল্পনাকে ভোঁতা করে দেয়, 'হাওয়া মহল' গড়ে তোলে। ও কে? তা দিয়ে আমার কি? বৈশ্য-কুলোদ্ভব, কি খ্রীস্টান, এমন-কি ব্রাহ্মণী হলেই বা কি?

কিন্তু হ্যাঁ, আমারই কোলে ঢলে পড়ে সে মরে গেল।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। ওর চেহারাও হঠাৎ কেমন যে পাঁশুটে হয়ে এল। চোখ বড়ো বড়ো করে সে দেখছিল। চোখের তারাগুলো অনরবত ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথাটাও দোলাচ্ছে ওপাশ-ওপাশ। জ্ঞান হারিয়ে আমার কোলে এলিয়ে পড়ল।

আমি জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি ওকে উঠিয়ে সোজা করে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। হাত দিয়ে নাড়ীও টিপে ধরলাম।

'উঁহু'। কিছুই সে বলছে না। চোখের ভেতরটাও বসে গেছে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও যেন হঠাৎ স্তব্ধ। এর জন্য বিশেষ কারণ বা সময়ের দরকার হয় কি? বাসে যে হৈ-চৈ শুরু হল তার কথা আর কি বলব! বাস দাঁড়িয়ে গেল।

বাসের এক কোণে বসা ওর স্বামীটি সব ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এদিকে এসে গেল। বাসে প্রচুর ভিড়। তারই মধ্যে যার যেমন জায়গা মেলে, কেউ বসে পড়ে কিংবা ডাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়ে যায়।

এরও বয়স কম। বছর পঁচিশেক হবে। দেখতে ফর্সা, নাক বেশ টিকালো আর মুখে ছোট্ট গোঁফ। দুজনে বেশ মানিয়ে ছিল।

সে বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করল।

এতে লাভ কি? প্রাণ-পাখি তো কখন উড়ে গেছে। আমার কোলের উপর ওর প্রাণহীন দেহ।

'এই ঝটকাওয়ালা[1], এই ঝটকাওয়ালা!'

'এই ট্যাক্সি—ট্যাক্সি!'

তাড়াতাড়ি রিক্সা পাওয়া গেল। অফিস পৌঁছুতে আমার আধঘণ্টা দেরি হল। মালিক বিরক্ত হলেন।

কাজ করতে করতে কোমর ধরে গেল। কাজে মন বসছে না। মনটা বড় অশান্ত। নিজের সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে একটা দোহাই পেড়ে বেলা তিনটের সময় অফিস থেকে কেটে পড়লাম।

জামার পকেটে হাত রেখে আমি সমুদ্রতীরে চললাম।

বালি আর সমুদ্রের নীল জল দুই-ই ক্রমে তপ্ত হয়ে উঠেছে। রোদে পিঠ জ্বালা করছে।

ওর যুবা বয়সের শরীর ও স্বাস্থ্যে সাংসারিক চাপের কোন ছাপ নেই। নতুন সংসার পাতার পরের মধুর বেদানায় ক্ষীয়মানা এই যুবতীটি আমার কোলের ওপর ঢলে পড়ে মারা গেল।

আমার মনের অবস্থাটা কিভাবে বর্ণনা করি?

অকারণ একটা ব্যাথা অনুভব করছিলাম। এই ব্যথায় যেমন আনন্দ তেমনি বিচিত্র এক মধুরতম আমেজ। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছিলাম। ঢেউগুলো এসে পায়ে আছড়ে পড়ছিল।

এগুলো কি আমার মনের সব দুঃখ ধুইয়ে মুছিয়ে দেবে? সমুদ্রের ধার দিয়ে চলতে চলতে বার বার ওই ঘটনাটাই মনে ভেসে উঠছে।

আমি কি ওর গাল ছুয়েছিলাম। হ্যাঁ, ছুয়েছিলাম—হুঁস আছে কি-না বোঝার জন্য। বুকের ধড়ফড়ানি বন্ধ হতেই সে মরে গেল। শরীরের উষ্ণতা এত তাড়াতাড়ি কি করে মিলিয়ে যায়। স্নিগ্ধ কপালের রূপরেখাও বদলায়নি তখনও। সামনের চুলের দুচার গোছা কিছুটা অবিন্যস্ত। সিঁথি কি সোজা ছিল না বাঁকা? ঠিক মনে নেই...তবে, তবে কি? এটা কি আমার জানা দরকার? যে রকমই হোক না কেন, তাতে কি? সে কোথা থেকে এসেছে কে জানে? যখন সময় হল মরবার, এই বাসে চড়ল আর আমারই কোলের ওপর মারা গেল। হয়ত বা পূর্বজন্মের কোনও সম্পর্ক। কেন সে নিজের স্বামীর কোলে শুয়ে মারা গেল না?

ভাগ্য! হ্যাঁ, এই ত ভাগ্য!

এটুকু কথা। ওকে কেন্দ্র করে আমার মনের আনাচে-কানাচে যে কাহিনী গড়ে উঠল, সেটা আর আমি বলতে পারব না, লেখাও সম্ভব নয়। এ এক অলিখিত কাব্য। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা ইত্যাদির

[1] এক ধরনের রিক্সা।

সঙ্গে আমরা সম-শ্রেণীতে পৌঁছে গেলাম।

এই কাব্যে আমার সংসারভাগিনী, বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও স্থান ছিল না। ঘরের দাওয়া থেকে নেমে বাইরের মাটি খুঁটে খাওয়া আর পেটের ব্যারামের রোগী শিশুটিরও কোনও স্থান নেই। হিষ্টিরিয়া রোগজনিত খরচ ও চিন্তা আর শিশু-ভ্রূণের অস্তিত্বের কোনো সাড়া নেই। কেবল আমরা দুজনই তাতে রয়েছি. দুজনের সেই কাল্পনিক জীবনে সর্বত্র শ্যামশোভা। কোথাও কোথাও ঝর্ণাধারা। মনে এক অপূর্ব শান্তি। পরিপূর্ণরূপে সুখময় সে জীবন। আমরা দুজনে যে গন্ধর্ব হয়ে আকাশবিহারি। সে কি বেদনা—কি বেদনা। আমার মনের অবস্থা অনেকটা বিষ-পরিবৃত এক অমৃতময় পাত্রের মতো।

বেশ দেরি হয়ে গেছে।

আমি বাড়িতে ফিরে এলাম।

আমার স্ত্রী মাটি খাওয়া বাচ্চাটির মুখ পরিষ্কার করে দিচ্ছিল।

আমায় দেখে কোলের বাচ্চাটিকে আমার কাছে ধরিয়ে দিয়ে ও আমাকে খাবার দিয়ে মাদুর বিছিয়ে দিল। ক্লান্তিতে ও হুঁ হুঁ করছিল।

পেটের বাচ্চার যন্ত্রণা।

দু-গ্রাস খেয়ে আমি উঠে পড়লাম।

'শরীর ভাল নেই নাকি? ঠিকমত খেলে না।'

'হ্যাঁ, আজ এক যুবতী আমার কোলের ওপর মারা গেল।'

এক নিঃশ্বাসে জবাব দিয়ে হাত ধুয়ে ছাতে গিয়ে আরাম কেদারায় বসলাম।

রাস্তায় ঠন ঠন ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম গাড়ী যাচ্ছে। চলমান চাকার সরর-র সরর-র আওয়াজ এসে ক্রমাগত কানে বিঁধছে। পি-পি করতে করতে বাস আর মোটর দৌড়ে দৌড়ে যাচ্চে। নীচে লোকজনের একটানা কথাবার্তা। স্ত্রী কোলের বাচ্চাটাকে খাটে শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। নোংরা নাকটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। খুবই অন্যমনস্ক। নইলে আমার কোলে অন্য যুবতীর মৃত্যু কিছুতেই সহ্য হত না।

'আমার কোলজুড়ে এ-কোন সোনা? এ কে?' স্ত্রী ঘুমপাড়ানী গান গাইছিল।

'হ্যাঁ, জানি না সে কে আর আমি কে? কিন্তু...এ কে?'

সংসারের ঝামেলায় ওকে আমি ভুলে যাব। কোনটা এখানে টিকে থাকে? বড় বড় সবাইকেও শেষে মাটির সঙ্গেই মিলিয়ে যেতে হয়। এ সময় এ চিন্তাটা গাছে-বসা কাঠঠোকরার মতো আমার মনটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও ধুয়েমুছে যায়।

এই ত' বেদনার চেহারা...?

হঠাৎ আমার দৃষ্টির সামনে সেই শেষ দৃশ্য ভেসে উঠল। স্বামী ওর মৃতদেহ রিক্সা করে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রাণ না থাকায় হাত আর মাথা ঝুলে পড়েছিল নীচে।

চুলে গোঁজা এক সুগন্ধী ফুলের গোছা...।

আমি চমকে উঠলাম, 'হায় রে বিড়ম্বনা!'

'কি হল, কি হল' চীৎকার করে আমার স্ত্রী আমার কাছে এল।

'আমি কি করব? কতদিন এভাবে চলবে?' আমি বিড় বিড় করে বললাম।

সে আমার মাথায় হাত রাখল। হায় শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তেড়ে জ্বর এসেছে। বলেনি কিছু। বাড়ীতেও কেউ নেই। একটু শুয়ে থাক। সকালেই ডাক্তার ডাকব। শুয়ে পড়, এক্ষুণি আসছি। আমায় শুইয়ে দিয়ে একটা ছোট বাটি আর এক টুকরো কাপড় নিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে গেল।

□

রঘুনাথন (তো. মু. চিদম্বর)

তিরুনেলবেলীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মুত্তৈয়া তৌণ্ডেমানের কনিষ্ঠ পুত্র। ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক। হালকা বিষয় আর দীর্ঘ কাহিনী রচনায় দক্ষ। পুদুমৈপিত্তনের সঙ্গে থেকেও রঘুনাথন নিজস্ব একটা রচনাশৈলী গঠন করেছিলেন।

প্রস্ফুটিত পঙ্ক কমল

সেদিনটা রবিবার। মিনার্ভা টকীজে ম্যাটিনী শো দেখার জন্য অন্য দিনের মতই নানা ধরনের প্রচুর লোক এসে কিউয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন একটা ইংরেজী ছবি দেখানো হচ্ছিল। তাতে অভিনয়াংশে ছিল সিনেমা প্রেমিকদের প্রিয় তারকাবৃন্দ। রঙীন এই ছবিটা ছিল গ্রীয়ার গার্সন আর ওয়াল্টার পীজন অভিনীত—ধূলার ফুল—ব্লসমস ইন দ্য ডাষ্ট।

সিনেমা হলের বাইরে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। যেন সারা মাদ্রাজ শহরের লোক তাদের রসবেত্তার প্রমাণ দিচ্ছে। ছাত্র, করণিক, দালাল, ডিগ্রীধারী, নব্যযুবক, সিনেমা-পাগল, পত্রিকা-সম্পাদক ইত্যাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচুর লোক সাড়ে ন' আনার টিকিটের কিউতে এসে দাঁড়িয়েছিল। জনতার এই কিউটা নিথর—অচঞ্চল মালগাড়ীর মত।

রিক্সা থেকে আমি নামলাম। ভাড়া দেবার জন্য রিক্সাওয়ালার দিকে সাড়ে তিন আনা পয়সা বাড়িয়ে দিলাম।

সে চীৎকার করে বলল, 'যা পয়সা ঠিক করেছিলেন, তাই দিন বাবু।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম! মন্নাডি থেকে ডেভিডসন রোডের ভাড়া সাড়ে তিন আনাই হয়। আমার কাছে ও চার আনা চাইছে। আমি বললাম, 'আমি তোমাকে সাড়ে তিনি আনাই দেব।'

রওয়ানা হবার সময় লোকটা আমায় বলেছিল, 'বাবু, যা ন্যায্য মনে করবেন, তাই দেবেন। আসুন চড়ুন।' আর এখানে পৌঁছে ঝগড়া শুরু করেছে।

'আমি ত' তিন আনাই ভেবেছিলাম।।

সে বলল, 'আরে বাবু চার আনাই দিয়ে দিন, নয়ত আপনার পয়সা আপনার কাছেই রেখে দিন।'

'যা উচিত ভাড়া, তার চেয়ে এক পয়সা বেশি দেব না।'

'না দেবেন ত' যান,' বলে পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে, রিক্সার টানাটা সে উঁচিয়ে ধরল।

আমি বললাম, 'কেন খামকা ঝগড়া করছ? মন্নাডি থেকে এখানে আসতে

তোমায় তিন আনার বেশি কে দেবে?'

সে রেগে বলল, 'আপনি কতটুকু জানেন। এই ভর দুপুরে রিক্সা টানতে হলে বুঝতেন! আমার অন্ন মেরে কি লাভ হবে আপনার?'

এক আনা পয়সায় আমার কিছু এসে যাবে না। সেটা আমার দুটি উইলস সিগারেটের দাম। কিন্তু আমার মিথ্যা-সম্মানবোধ লোকটার ইতরতার কাছে আমায় নত হতে দিল না। কিউয়ে দাঁড়ানো পরিচিত-অপরিচিত বহু লোক আমার দিকে ঘুরে তাকাল। তাদের সবার সামনে লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া আমার মধ্যবিত্ত অহঙ্কারে অনুচিত বলে মনে হল। তাই আর এর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে পয়সা বের করে ছুঁড়ে দিলাম ওদিকে।

'বড় নির্লজ্জ এই লোকটা। ছোটলোকের বুদ্ধি ছোটই হয়।' বিড়-বিড় করে বলতে বলতে কিউয়ে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম।

বুকিং অফিস তখনও খোলেনি। ছায়ার দিকে সরে এসে লোকে লাইন বানিয়েছে। লাইনে দাঁড়ানো লোকদের ভেতর কেউ কেউ পত্রিকা পড়ছে। কেউ গানের বই দেখছে, কেউ কেউ গল্প করছে। কেউ সিগাবেট টানছে আর কেউ বা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমিও ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মিনার্ভা টকীজের সামনের লাইনে এক রিক্সাওয়ালার পরিবার থাকত। এই গরীব পরিবার এক গুদামের বাইরে বারান্দায় ঠাঁই নিয়েছিল। ধ্বসে যাওয়া ভাঙ্গা দেওয়াল, ধোঁয়া আর ধূলোয় কালি হয়ে গিয়েছিল। এক কোণায় কালো হাঁড়ি, এনামেল উঠে যাওয়া থালা, টিনের একটা কৌটা, বাঁশের ছেঁড়া চাটাই ইত্যাদি সব পড়ে। বারান্দার এক পাশে টাটের একটা কাটা বেড়া টাঙানো। টাটের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কালো মোমের তৈরী খেলনার মতো একটা নবজাত শিশু ময়লা কাপড়ের ওপর শোয়া। অনবরত হাত পা ছুঁড়ছিল বাচ্চাটা। ওর গলায় পরা শঙ্খের মত সাদা মোতির মালাটা, শরীরের কালো রঙটাকে যেন আরও প্রকট করে তুলেছে।

বারান্দার নীচে দক্ষিণ দিকে বাঁশের চাটাইয়ের ওপর দুটি মনুষ্য মূর্তি। একজন তাদের মধ্যে বৃদ্ধা—চোখ পিচুটিতে ভরা, চুল ধূলোভর্তি আর শরীর শুকনো জায়ফলের মত। অন্যজন এক নবযুবতী—উর্বরা জমিতে উৎপন্ন সুপুষ্ট কলার মত সুন্দর ও সুডৌল। যুবতীর রঙ ময়লা কিন্তু দেখতে সুন্দর ও সুশ্রী। তার হাতে কাচের চুড়ি, কপালে কুমকুম আর গলায় উজ্জ্বল হলুদ রঙের সুতো। আরে, এ-যে নববিবাহিতা!...বৃদ্ধা তার চুল ইত্যাদি পরিপাটি করে বেঁধে তাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল।

কিউয়ের দিকে আমার নজর গেল। বুকিং অফিস খুলে গিয়েছে। আমার পরেও লোকের লম্বা লাইন। কানখাজুরে চালে লাইন এগোচ্ছিল। আমিও এক পা এগোলাম।

ভাবলাম কখন আমি টিকিট পাব? একবার তো দেখানো হয়ে গেছে এ-ছবি।

খুবই ভাল ছবি। আমিও একবার দেখেছি এটা।

ছবির নামটাই কবিতার পংক্তির মত..ধূলার ফুল..। গার্সন আর পীজনের এক পরিবার। ওদের ছিল এক ছেলে—বড় আদরের। দুজনেই তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সে ছেলে মারা গেল।

'এই শবম! কি রে, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? খেতে এসেছিস। এসে ঘুরছিস। কিছু একটা নিয়ে এলে ত' খেতে পারবি,' তীক্ষ্ণ রমনী কণ্ঠ শোনা গেল।

আমি ঘুরে বারান্দার দিকে তাকালাম। দেখলাম কালি-লাগা তিনটে ইট দিয়ে বানানো চুলোর ওপরে বাসনে চাল ঢেলে দিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি আবার চেঁচাচ্ছে। মার ডাক শুনে শবম দৌড়ে সেখানে এল।

'যা, আগুন জ্বালানোর জন্য কিছু জ্বালানী জোগাড় করে নিয়ে আয়' এ কথা বলে সে ধোঁয়া ওঠা উনুনে হাওয়া দিতে লাগল। ধোঁয়া আরও বেড়ে গেল। নিজের চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে হাওয়া দিতে লাগল। ইতিমধ্যে বারান্দায় বাচ্চাটার ওপর বেড়ার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ায় সে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল। সেই মেয়েলোকটি দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল।

আমার দৃষ্টি শবমকে খুঁজে ফিরছিল। খালি গায়ে ঘুরে বেড়ানো একটা ছোট ছেলে সে। কোমরের কাছে তার একটা কালো তাগাও বাঁধা নেই। শরীরটা কুচকুচে কালো। লিভারকিওর ওষুধের বিজ্ঞাপনের বাচ্চার মতো ফোলা পেট ওর। মাথার চুলগুলো চক চক করছিল। নাকের ফুটো দিয়ে থেকে থেকে সর্দি-সিকনী বেরিয়ে আসছিল যেন মাছ এসে জল থেকে বার বার নাক উঁচু করে ঘাঁই লাগাচ্ছে। জিভ দিয়ে নাকাট সাফ করে নিচ্ছে ছেলেটা। সে জ্বালাবার জন্য সিনেমার বিজ্ঞাপন, টিকিট, শুকনো খড়-পাতা ইত্যাদি একত্র করে চুলার পাশে নিয়ে গেল।

সেই যুবতীটি চুল বেঁধে নিয়েছিল। সে বলল, 'এই বুড়ী, কলসীতে জল ভরে নাও, ধুঁয়ো এখন নেই, চুলাটা ঠিক মত জ্বলছে। রাস্তার ধারে বারান্দায় বাচ্চাটাকে মা ঘুম পাড়াচ্ছে। বাঁশের চাটাইয়ে শোয়া বুড়ীটা মুখের পাশ থেকে বেশিরকম তামাক মেশানো পানের পিকটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিল। তারপর কলসী নিয়ে জল আনতে গেল। শবম সব কাগজগুলো একত্র করছিল।

'এগিয়ে চলুন মশাই' কথাটা শুনে সম্বিত এল। এগিয়ে গেলাম। এখনও কিউ-এ পিঁপড়ের দঙ্গলের মতো কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। ষাট জনের পর আমার টার্ণ আসবে। আমি মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালাম..।

দেয়ালে গার্সন ও পীজনের ছবি সাঁটা। গার্সনের চেহারায় একটা শান্তভাব তবে একটা দৃঢ়তাও সুপরিস্ফুট। তার পাশেই পীজনের একটা ছবি। সেটা পাশ থেকে নেওয়া। সে ছবি দেখে দর্শকের মনে কান্না ঠেলে ওঠে। ছেলে মারা যাওয়ার পর কি তার অভিনয়। আর বিয়োগাত্মক দৃশ্যে গ্রীয়ার গার্সনের অভিনয়ও কেমন উচ্চাঙ্গের।

মাদাম কুরী চিত্রে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর একটা শব্দও সে উচ্চারণ করেনি। বিনা আয়াসে, কোনও কান্নাকাটি না করে কেমন নিজের ব্যথাটা ব্যক্ত করল!...এ ছবিতেও ছেলের মৃত্যুর পর তার অভিনয় খুব মর্মস্পর্শী। প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর পর কেমন যেন উদভ্রান্তের ভাব। সব বাচ্চাকে দেখেই আনন্দ—আর দুঃখ হচ্ছে। তারপর মন স্থির করে ফেলেছে যে সারা জীবন ধরে সে শিশুদের মধ্যেই কাটাবে। তাদের জন্যই বাঁচবে। অনাথ আর মা-বাবার খবর জানে না যে শিশুরা, তাদের লালন-পালন করবে। সবাইকে পালতে, 'তাদের বড় করতে যে অর্থের প্রয়োজন, তা আসবে কোত্থেকে?...এই সমস্যা উপস্থিত হল সামনে।

'বাবু, একটা পয়সা দিন, বাবু।'

ভিখারীর গলা শুনে তাকালাম। শবম লাইনে দাঁড়ানো লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে। মাঝে মাঝে নাকের সিকনী চাটছে।

সামনের দিক থেকে 'ওরে মচ্চাবী এসে গেছে' শুনে তাকাতে আমার দৃষ্টি পড়ল—উনুন থেকে ভাত নামিয়ে যুবতীটি মাথাটা ঘুরিয়ে দেখছিল। রিক্সা এক পাশে দাঁড় করিয়ে মচ্চাবী তার স্ত্রী কাছে এল। সামনে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই এখনও আসেনি?' কিছুক্ষণ বাদে আবার বলল। 'ঠিক আছে, আমায় খেতে দাও। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

যুবতীটি আস্তে আস্তে বলল 'এই ত এলে, আবার যাওয়ার কথা বলছো?'

সে সময় বারান্দায়-বসা মেয়েলোকটি বাচ্চাটাকে ছায়ায় রেখে নীচে এল।

যুবতীটি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বোনদি, খাবার দিয়ে দেব একে? চলে যাচ্ছে।'

সেই পাকাচুলওয়ালী দিদি বলল, 'হ্যাঁ, দিয়ে দে। ও যাক। গিয়ে আরও দুচার পয়সা কামিয়ে নেবে।'

নবদম্পতীটি গিয়ে বারান্দায় টাটের বেড়ার পিছনে বসল। স্ত্রী এনামেলের থালায় ভাত বাড়ল। লোকটা কোলের ওপর পড়ে থাকা মরু[1] আর সামন্দী[2]র তৈরী একটা বেণী চুপি চুপি মেয়েটির চুলে আটকে দিল।

যুবতীটি মাথায় হাতটা ছুঁইয়ে বলল 'মজা করো না। দিদি দেখতে পাবে।'

'ওরে আমার পিয়ারী পাখী। তুই আমার চিন্তামণির মতো?'

'তবে কি তুমি আমায় বেশ্যা মনে কর?'

দুজনেই কেমন হাসতে আরম্ভ করল। মধুচন্দ্রিমা-যাপনের সময় এরা কি কোনও ছবি দেখেছিল?

'কি, আজও খিচুড়ী বানিয়েছিস' বলতে বলতে সে ওর গালে এটা চিমটি কাটল...।

---

[1] এক প্রকার সুগন্ধী পাতা। বেণীতে গোঁজা হয়।

[2] গাঁদা ধরনের একপ্রকার ফুল।

প্রেমিক যুগলের নাটকটার পরের অংশটা আমি দেখিনি। অবস্থাগতিকে কিউ আবার কিছুটা এগিয়ে গেল। ভরপেট খাওয়ার পর সাপ যেমন ধীর গতিতে চলে, তেমনিভাবে আমাদের কিউটা এগোচ্ছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আর কত সময় লাগবে?' আরেকজন বলল, 'এ-ছবি ত' আগেও এসেছিল। এর এত চাহিদা?'

আগে একবার হয়ে গেছে, তবুও এত ভিড় কেন?...কারণ ছবিটা খুব ভাল। এটা আমাদের মন ছুঁতে পেরেছে...গার্সন অনাথ আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত।...কত বড় বড় লোকদের কাছে যাচ্ছে সে। অভিজাত ঘরের ছেলে-মেয়েরা কত রহস্য, কত ঢঙ-এ প্রেমরসে মত্ত হয়ে সময় নষ্ট করছে। অনেক দুর্ঘটনাও ঘটছে তার ফলে। ওসব লোকের মন তাতে আপ্লুত হয় না। ওই যে বুড়ী! আশী বছর পার হয়েও, পাউডার আর আড়ম্বর ছাড়তে অক্ষম, তার এত লোভী মন। সে জিজ্ঞাসা করছে, 'পাপজাত এই বাচ্চাকে আশ্রয় কে দেবে?' নায়িকা জবাব দিচ্ছে, 'পাপী কে? কামনা-বাসনার পরিণাম না জেনে, গর্ভবতী হয়ে, কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, পেটের সন্তানকে ফেলে যায় আর পয়সা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে পাপ যারা গোপন করে তারা...না এই অবোধ শিশু...কে পাপী? এই বাচ্চা অবৈধ নয়। তার জন্ম হয়েছে লুকোচুরির মধ্যে। পাপ-কর্মের প্রতিফল শিশুকে পাপী বলা হবে? না, পাপ-জাত শিশুও দেবতা হতে পারে।'

আমার মন এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শবম এসে 'বাবু, একটা পয়সা দিন' বলায় চিন্তাতে বাধা পড়ল। কিছু না বলে একটা পয়সা ওকে দিয়ে দিলাম।

ছবির নামকরণটা খুবই সঙ্গত...আজকের পৃথিবীখ্যাত ষ্টালিন ছিলেন মুচির ছেলে...কথাশিল্পী গোর্কী আগে মাল বইতেন। রুটি বানানোর উনুনের কাছেই পড়ে থাকতেন। পাঁকে পদ্মফুল...আস্তাকুঁড়ে হীরে-মানিক...।

সামনের বারান্দায় আরেকটা রিক্সা এসে দাঁড়াল। রিক্সার টানাটা নীচে নামিয়ে রাখল। ঘামে জবজবে তার শরীর, যেন তেল মাখিয়েছে কেউ। সেটা মুছে, বারান্দার দিকে এগোল সে।

ভারী স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাওয়া তৈরী?' বারান্দার দেওয়াল থেকে সরে এসে সে বসে পড়ল।

তার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'মচ্চাবী খাবার খেয়ে চলে গেছে। তুমি কি খেয়ে নেবে?'

'হ্যাঁ, খাব। ছোট্টু কোথায়?'

'শবম ত' এদিকেই দাঁড়ানো ছিল।'

বাপের দৃষ্টি গেল তার ছেলের দিকে। 'একটা পয়সা দিন বাবু' বলে সে হাত পেতে লাইনে দাঁড়ানো লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইছিল। এক ফাঁকে সে কিউয়ের ধারে

পৌঁছে গেল। শবমের মেলে-ধরা হাতের দিকে তাকাল সে। চারটা পয়সা পড়েছিল হাতে।

রাগে লাল হয়ে উঠল বাপের চেহারা।

'এই মরার বাচ্চা। জানোয়ার কোথাকার! আমার সামনে তুই লোকের কাছে ভিক্ষা চাইছিস? তোর পায়ে কি অসুখ হল।' একথা চীৎকার করে বলতে বলতে সে ওর হাতের সব পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিল আর জোরে জোরে ওকে পিটতে লাগল।

ছেলেটা খুব জোরে কাঁদতে শুরু করল।

আমি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একে মারছ কেন?'

সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন পিটছো? আমার রোজগার পুরো হয় না, তাই আপনার ছেলে ভিক্ষা করছে? নিজের মান ইজ্জতের কি কোনও বালাই নেই?'

কিউটা এগিয়ে যাচ্ছিল। আরেকটু এগোল। ব্রডওয়েতে 'কড়া' বলে একধরনের ট্রাম চলে। এ কিউটাও যেন বন্নার পেটের ট্রামের মত এক কদম যায় ত' আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি অস্বস্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। টিকিটের পয়সা বার করলাম পকেট থেকে। তিনজনের পরেই আমায় দেবে...।

আমি বারান্দার দিকে তাকালাম। স্ত্রীর বেড়ে দেওয়া ভাত স্বামীটা গরাস পাকিয়ে খেতে লাগল। শবম এক কোণায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে রিক্সাওয়ালা তার স্ত্রীকে বলল, 'এই ছেলেটাকে একটা দানাও দেবে না। কুকুরের মতো মার খেয়ে খেয়ে তবে কথা শুনবে। খেতে খেতে আবার মাঝে মাঝে সে বলে উঠছে, 'তুই ভিক্ষা করিস।'

কিউটা এগিয়ে গেল।

'পিচ্চে' তার দম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত পয়সা রোজগার করত। রোজগারের পয়সা মদের দোকান আর মহাজনকে দিয়ে জীবন-ধারণ করতে হয় রিক্সাওয়ালাকে তারই মধ্যে ধর্ম-কর্মও করতে হবে না? ধর্ম কি নিছকই শব্দ—শুধু সুন্দর শব্দ? কিছুক্ষণ আগে যে রিক্সায় আমি এলাম, সে রিক্সাওয়ালা পয়সা নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করল আর এ রিক্সাওয়ালা পয়সা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল! কি, না—এ-পয়সা ভিক্ষা করে পাওয়া—মেকী ব্যাপার। নিজের পরিশ্রমের পয়সা ঝগড়া করে পাওয়া, পাপকর্ম নয়। বরং বিনা পরিশ্রমবদ্ধ, ভিক্ষা করে পয়সা নেওয়া পাপ।...তাছাড়া, শিক্ষিত ডিগ্রীধারীরা ঘুষ নেয়। ওরা, যারা...পরিশ্রম করে রোজগার করছে, তাদের পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে জীবন কাটায়। এই রিক্সাওয়ালা কি তবে ওদের মত বাবু নয়...।

কিউটা আরও এগিয়ে গেল। এখন আমি মানুষের এই রেলের ইঞ্জিন হয়ে গেলাম। আমার আগেরজন টিকিট নিয়ে নিয়েছে। আমি বুকিং অফিসের ক্লার্কের দিকে পয়সা এগিয়ে দিলাম। কিন্তু বুকিং অফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'মশায় একটা টিকিট।'

বুকিং অফিসের জানালার ওপাশ থেকে জবাব এল, 'এক্সকিউজ মী।' পয়সা ব্যাগে রেখে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কিউ ভেঙে গিয়েছিল। আনন্দিত মনে বলে উঠলাম, 'পাঁকে ফোটা পদ্ম কি কেবল মিনার্ভা টকীজের ভেতরেই দেখা যায়? বাইরে কি দেখা যায় না?'

□

ডি. জয়কান্তন
১৯৩৪ সালে জন্ম। বৈপ্লবিক ভাবধারার জন্যে সিনেমা ও সাহিত্য জগত—উভয়কেই প্রভাবিত করতে পেরেছেন। অন্যান্য কলাতেও তাঁর যথেষ্ট রুচি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, প্রতি বিষয়েই একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন। বৈপ্লবিক চিন্তা ও সূক্ষ্ম শিল্প ব্যঞ্জনা তাঁর গল্পের লক্ষ্যণীয় দিক।

মৌন এক ভাষা

ভালই হল, সে একাই এসেছে।

পাঁচ বছর আগে শিঙ্গারম পিল্লাই রবিকে এধরনের একটা চিঠি লিখেছিল—আমি ভেবে নিয়েছি যে আমার সাত ছেলেময়ে আর তারাই তোর কথা আমায় পুরোপুরি ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি ফিরে না আসিস এখানে, তবে সেটাই তোর পরিবার তথা গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি যথার্থ উপকার হবে। রবি ফিরে আসেনি, যেন সে বাবার কথাগুলো ঠিকমতো মেনে নিয়েছিল। কিন্তু রবির মায়ের এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা দেখে শিঙ্গারম ওকে লিখেছিল যেন সত্বর চলে আসে। গতকাল থেকে একথাটা ভেবেই সে চিন্তিত হচ্ছিল যে সে কি একা আসবে না সেই বিদেশী মেয়েটিকে সঙ্গে এনে আমাদের অপমান করবে। গাড়ী থেকে রবিকে একা নামতে দেখে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সাধারণ সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী পরা রবিকে আগের মতই লাগছিল।...এই পাঁচ বছরে, আটাশ বছরের স্পল্প আয়ুষ্কালের মধ্যেই সে কত বড় হয়ে গেছে! কপালের দিকটা হালকা হয়ে এসেছে...তার বড় ভাই সুন্দরমের চেয়েও বড় মনে হচ্ছে তাকে। তবে রবির সৌন্দর্য কিন্তু কম নয়। গায়ের রং আরও ফর্সা হয়েছে। শরীর স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে ভাল। কি সৌন্দর্য, কি বুদ্ধি—কোনটায় কম? অল্প বয়সের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল সে সুন্দরম বনে-বাদাড়ে আর ক্ষেতির কাজই করতে পারে। আর এর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আস্থা থাকায় একে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। পড়তে গিয়েছিল এ ছেলে। বিদেশী মহিলাটির প্রতি এ কি করে আকৃষ্ট হল?...এসব কথাই শিঙ্গারম চিন্তা করছিল।

'বাবা!'

সুটকেশ হাতে রবি বাবাকে দেখতে পেয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল। সজল হয়ে উঠল তার চোখ—রবি সেটা জানতে পারল না। সে তার পিছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ হাসছিল। কিছুক্ষণ পরে চিন্তিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল 'মার অবস্থা এখন কেমন? কেন মা এমন কাজ করল? এই বয়সে আত্মহত্যার

চিন্তা এল কেন মাথায়?' তার দিকে না তাকিয়েই বাবা একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিল 'ভেতরে ত শুয়ে আছে। নিজে গিয়েই সব কিছু জিজ্ঞাসা কর না? এবাড়ীর লোকেদের বুদ্ধি কে জানে কি ভাবে কোন পথে চলে...হায়রে, দুর্ভাগ্য!' সখেদে কথাগুলো বলতে বলতে শিঙ্গারম তোয়ালেটা উঠোনে বিছিয়ে বসে পড়ল আর পা চালিয়ে ছেলেকে অন্দরের দিকে যেতে দেখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমার পুত্র-প্রেমের পালা শেষ হল। না...এ-ও আমার কল্পনা মাত্র। পুত্রের জন্মদাত্রী মা কি কখনও এমন কথা ভাবতে পারে?...যা কিছুই হয়ে থাক তার পক্ষে এমন একটা নীচ কাজ করা কি ঠিক হয়েছে?...শিঙ্গারম তার স্ত্রীর কথা ভাবতে লাগল। দুদিন আগে সে কনেরের শিকড় বেঁটে, সেটা খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা করার আগে না জানি কতবার বিষয়টা ভেবেছে। এখন শিঙ্গারম নিজেই চিন্তা করতে লাগল।

শিঙ্গারমের স্ত্রী অলমু আচ্চির জীবনে বহু কিছুরই অভাব ছিল। সবার বড় ছেলে সুন্দরমের বিয়ে হয়েছে দশ বছর হল, কিন্তু কোনও সন্তানাদি হয়নি। মায়ের মনে হয়েছিল যে দ্বিতীয় ছেলে তার ইচ্ছানুযায়ী শহরে থেকেই পড়াশুনা সমাপ্ত করুক আর বিয়ে-শাদী করে বাড়ীতেই জাঁকিয়ে বসুক।...কিন্তু সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়নি। রবি তার সিনিয়র এক য়ুরোপীয় মহিলা ডাক্তারের প্রেমে পড়ল। যখন সে বাড়ী ফিরে জানাল যে সেই বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করবে তখন তার আর তার বাবা শিঙ্গারম পিল্লাইয়ের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ হয়। অলমু আচ্চি তখন মৌনাবলম্বন করেছিল।

তার সেই মৌন থাকাটা এরা দুজনেই তাদের নিজের নিজের মতের সমর্থন বলে ধরে নিয়েছিল। দুজনে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। সে সময় রবি সেই বিদেশী মহিলার সঙ্গে মিলে মাদ্রাজে একটা নার্সিং হোম চালাচ্ছিল।

রবি মাদ্রাজে গিয়ে যখন ওই বিদেশী মহিলাকে বিয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে বাড়ীর লোকদের প্রথম জানায়, তখন কেউ-ই জানত না যে অলমু আচ্চি এতে খুশী হয়েছে কি না। শিঙ্গারম পিল্লাই যখন বলেছিল—'আমি ওকে ভুলেছি, তুমিও ভুলে যাও,' তখন সে দুঃখিত হয়েছিল কিংবা অন্য কিছু, তা কেউ-ই জানত না। অলমু আচ্চির এই মৌন নামধেয় ভাষাটায় ভালই দখল ছিল।

এই পাঁচ বছরে কত গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। রবি বিশেষ কিছুই জানে না। দুবছর আগে ওর দুই ছোট ভাই, মুত্থু আর সোমুর বিয়ে হয়েছে। তার বড় বোন কামাক্ষী স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ীর কাছেই ছিল। এখন স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে ছোট বাচ্চাসহ তার মায়ের কাছেই চলে এসেছে। পাশের শহরেই বিয়ে হয়েছে ছোট দুই বোন পঙ্কজম আর ইন্দিরার। দুই বছরে তারা একবার করে মায়ের কাছে এসে এখানে দুদুটো শিশুর জন্ম দিয়ে গেছে। রবির সবচেয়ে ছোট ও আদরের বোন সুশীলা, যাকে কোলে পিঠে করে ঘুরে বেড়াত, সে বড় হয়ে হালকা ওড়ানা

ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এখন সে-ও বিবাহযোগ্যা..।

দুমাস আগে শিঙ্গারমের ষষ্ঠিতম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে। সে সময়ে মায়ের মৌনভঙ্গ হয়েছিল। নিমন্ত্রণ-পত্রের ঠিকানা লেখার সময় স্বামীকে গিয়ে বলেছিল, 'ওর কাছে...রবির কাছেও চিঠি দিয়েছ ত'?'

শিঙ্গারম তার দিকে ঘুরে তাকাল। সে বুঝতে পারল যে এই তাকানোর অর্থ 'না'। এই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভয় পেয়ে চুপ করে যাওয়া থেকে শিঙ্গারম বুঝল যে সে রবির পক্ষ নিচ্ছে। অনেক আগেই এবিষয়ে সে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন এই নিশ্চন্ত আভাষ পাওয়ার পর সে দৃঢ়সঙ্কল্প হল যে রবিকে ডাকবে না। ষষ্টি বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের পর দুমাস পার হল। সেদিন সে খুব প্রসন্ন ছিল। রবি চলে যাওয়ার পর কোনও ভাবে তার কথা উঠলে হয়ত আলোচনাও করত। কিন্তু তার অভাবে কারুর কিছু আটকাত না...। অলমু আচ্চিরও কোনও ভাবে কিছু আটকায়নি...। তার মৌনাবলম্বন দেখে অন্ততঃ শিঙ্গারম পিল্লাই সেইরকমটাই ধরে নিয়েছিল।

এরকম একটা অবস্থায়, বয়স যার পঞ্চাশেরও কম, সেই অলমু আচ্চির দুদিন আগে কনেরের শিকড় পিষে খেয়ে আত্মহত্যা করার সাহস কোথা থেকে এল? এর কারণ কি রবির সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত দুঃখ কিংবা অল্পবয়সে বিধবা হয়ে কামাক্ষীর চলে আসাটা? জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানহীনতার দুঃখ অথবা এই সব কিছুর কারণে তার মনে একটা বিরক্তির ভাব জন্মেছে?

কারণ যা-ই হোক, কিছু একটা হোক, হঠাৎ-ই কি সে এ কাজটা করলো?

শিঙ্গারম পিল্লাই আর বাড়ীর অন্য লোকেরা কেউ-ই এ ব্যাপারে কিছু বুঝে উঠতে পারল না। তারা অলমুর বিভিন্ন ব্যাপার দেখে, ভগবানের নাম স্মরণ করে এক বৈদ্যকে খবর দিল। তিনি কনেরের প্রতিক্রিয়া দূর করতে এক ওষুধ দিলেন।

খুব রহস্যপূর্ণ ভাবে বৈদ্যজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি শাশুড়ী-বৌদের মধ্যে কোনও ঝগড়া হয়নি ত?'

শিঙ্গারম পিল্লাই বলল, 'মুখ খুললে তবেই ত' লড়াই ঝগড়া হওয়া সম্ভব!...মশায় আমাদের পরিবারে এধরনের ব্যাপার ঘটে না।'

'তবে ত' এই অসুস্থতার কারণ অন্য কিছু নয়। আপনার দ্বিতীয় পুত্রের চলে যাওয়াতেই দুঃখের উদ্ভব। এই সময় আপনার সব ছেলেপিলেদের চিঠি দিয়ে ভালই করেছেন। তারা এলে মায়ের মনটাও শান্ত হবে', একথা বলে গাঁয়ের বৈদ্যজী সেখান থেকে চলে গেলেন।

শিঙ্গারম পিল্লাইয়ের মনে এ ব্যাপারে খুব একটা দুঃখ ছিল। নিজের স্ত্রীর মৌনাবলম্বনের এক মনগড়া অর্থ-ই সে করে নিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর মনের প্রকৃত খবর সে জানত না। তার ধারণা হয়েছিল যে আত্মহত্যার চেষ্টার পেছনে একটি কারণ রবিকে তার কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। 'স্ত্রীর খাতিরেই' রবিকে আসতে

সে চিঠি লিখেছে আর পাশের শহরবাসী কন্যাদের নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বাড়ী এখন মেয়ে-জামাই আর নাতি-নাতনীতে ভরা।

বেহুঁশ অলমু আচ্চির জ্ঞান ফিরে এল। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে কাঁদতে শুরু করল। 'এরা সব কারা? সবাইকে এখানে ডেকে কেন আমায় অপমান করছ?...হায় আমার অদৃষ্ট!' নিজের মনে বিড়বিড় করে সে কথাগুলো বলল। শিঙ্গারম পিল্লাই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। এই গালাগালির মূলাধার হিসেবে সে নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগল।

সে সময় রবিও এল সেখানে। সে জানত না যে চিঠি লিখে তার বাবা কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। রবিকে দেখে শিঙ্গারম পিল্লাই নিশ্চিন্ত হল। এবার তাকে পেয়ে অলমুর সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

রবি যখন ঘরে ঢুকল, উঠোনে তখন বাচ্চারা খেলছিল। ছোট অবস্থায় এদের অনেককেই রবি চিনত। এখন বড় হয়ে যাওয়ায় রবি সবাইকে চিনতে পারেনি। কিছু বাচ্চা যারা ওকে আগে দেখেনি, তারা ওকে দেখে চমকে ওঠে, 'মা, কে এসেছে' বলতে বলতে ঘরের দিকে দৌড়ে পালাল।

রবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে ছুটে পালানো বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে সময় তার মা ভেতরের ঘরে শুয়ে। বাচ্চাদের চেঁচামেচি শুনে আস্তে আস্তে এসে সুশীলা দরজার কাছে দাঁড়াল। দুদিন যাবৎ সে মায়ের খাটের পায়ের দিকটায় বসে আছে। বাইরে উঁকি দিয়ে সে দেখল। ঠোঁট চেপে সে বলল, 'রবি ভাই।' আর দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে এল। ওর হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে 'দাদা, এসো' বলে তাকে স্বাগত জানাল। সুশীলার ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখও সজল। পরস্পর থেকে ওরা দূরে ছিল—এই বিচ্ছেদই কি এর একমাত্র কারণ?

আরে! সুশী! তোকে ত চিনতেই পারিনি! হ্যাঁ, মা কেমন আছে রে?' জিজ্ঞাসা করতে করতে সে ঘরের দিকে এগোল। উত্তরে সুশীলা বলল, 'সদ্য সদ্য মা ঘুমিয়েছে... এখন জাগিও না... জাগলেই কথা বলবে আর কাঁদতে শুরু করবে...এসো ভেতরে এসো। ক্ষেতের ধারে পাম্প বসিয়েছে, চল দেখবে কেমন তোড়ে জল আসে। পাম্পের জলে স্নান করলে দেখবে রেলযাত্রার সব ক্লান্তি নিমেষে মিলিয়ে যাবে। এক হাতে রবির সুটকেশ আর অন্য হাতটা দিয়ে রবিকে ধরে টানতে টানতে সে এগিয়ে চলল। ওর সঙ্গে ঘরের পিছনটায় যাবার আগে রবি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাকে এক লহমা দেখে নিল।

পিছনের দিকে রবিকে যেতে দেখে ওর বড় ভাই সুন্দরমের স্ত্রী রাজন হাসতে হাসতে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'ভাই সাহেব, এসো। আজ রাস্তা ভুলে কি করে চলে এসেছো?' ওর ভারী শরীরের গড়ন দেখে রবি চিন্তা করল, ছেলেপিলে না হওয়ার

দরুণ, না-কি কোন রোগের জন্য এই গড়ন? সে-ও হাসতে হাসতে মজার সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বৌদি, ভাল আছ?' বৌদি হেসে জবাব দিল, 'কেন, শরীর স্বাস্থ্যে কম মনে হচ্ছে নাকি?'

'আমি ডাক্তার হিসেবে জিজ্ঞাসা করছি। জবাব তোমার ঠিক হল কি?'

'একদিন তোমার দাদা বলছিল যে আমার মাদ্রাজ গিয়ে তোমার নার্সিং হোমে ভাল করে পরীক্ষা করানো দরকার।'

'হ্যাঁ, কথাটা খুবই ঠিক। আমি মাদ্রাজ ফেরার সময় চলো আমার সঙ্গে।' রবি যখন কথা বলছিল, তখন ইন্দিরা আর পঙ্কজ বাচ্চা নিয়ে ক্ষেতের দিক থেকে এসে সেখানে দাঁড়াল। 'আরে রবিদাদা তুমি? বাচ্চারা বলছিল কে এসেছে।' কথাগুলো বলে পঙ্কজম তার বড় ছেলেটাকে রবির পাশে দাঁড় করাল আর বলল, 'এ তোর মামা।' বাচ্চাটা ভয়ে আর লজ্জায় মায়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

ইন্দিরা মজা করে রবিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দাদা, বৌদিকে আনলে না?' ইন্দিরার এই প্রশ্ন শুনে সুশীলা চমকে উঠল।

নিজের চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে রবি বলল, 'নিয়ে ত' আসতেই পারতাম। কিন্তু বাবা যদি আবার তাড়িয়ে দেয় তবে..?' আর হাসতে লাগল।

বৌদি ভাবাবিষ্ট হয়ে বলল, 'তাড়ালে আমরা চুপ করে বসে থাকতাম? আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, 'এ কি আপনার পুত্রবধূ নয়?'

'আমায় তাড়ানোর জন্য তোমরা কিছু বলোনি। তবে ওর জন্যে তোমরা নিশ্চয়ই লড়বে' বলে রবি বৌদির মুখ বন্ধ করে দিল।

এসময় রান্নাঘরের দরজায় একটা অচেনা মুখ দেখা গেল। তাকে দেখে রবি বলল, 'যে বউ ঘরে আসেনি তার কথা থাকুক। নতুন যে দু'জন এসেছে, তাদের সঙ্গে ত' দেখা করাও।' রবি একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখুর বৌ কফি নিয়ে এল।

রাজম ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এ হল মুখুর বউ মীনা। রান্নাঘরের জানালা থেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো একটি যুবতীর দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওই হল সোমুর বউ নলিনী।' রবিকেও বাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়, একথা ভেবেই হয়ত সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মীনার হাত থেরে কফির গেলাস নেবার সময় রবি ওর দিকে তাকাল। তাকে অন্তঃসত্বা দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কবে হবে?' রবির একথা শুনে সে হাতে মুখ চেপে হাসতে হাসতে চলে গেল।

'কি, ইংরেজরা কি প্রত্যেক বাচ্চার জন্মের আগেই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার পালন করে? এ ত' এর দ্বিতীয় বাচ্চা, কন্নন কই রে?' বলে পঙ্কজম ঘুরে পিছনে তাকাল। কিছুক্ষণ বাদে দেড় বছরের বাচ্চাটার জামাকাপড়ে লেগে থাকা চাল-ডাল পরিষ্কার করে তাকে সেখানে নিয়ে এল।

কফি খেয়ে রবি গায়ের জামাটা খুলে খুঁটিতে টাঙিয়ে রেখে একটা মোড়া নিয়ে উঠোনে বসল। আর সব তাকে ঘিরে বসল।

'দিদি, মুত্থু আর সোমু কোথায়? জামাইরা বা কোথায় গেল?' বিধাবা দিদি কামাক্ষী ক্ষেত থেকে ফিরছিল আর সেই সময়ই রবি প্রশ্নটা করল।

'আরে, রবি! আয় ভাই...তুই কি আমাদের ভুলে গেছিস?' বলতে বলতে সে রবির পাশে এসে বসল। খুবই স্নেহমাখা কণ্ঠে সে রবির যাবতীয় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। দিদির এই চেহারা দেখে রবি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করল, তবে মনের এই ভাবটা সে বাইরে প্রকাশ করল না। কথার উত্তর সব সে হাসিমুখেই দিল।

এক ঘণ্টা ধরে সবাই নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলল। রবি আলাদা আলাদা ভাবে সবার সব সমস্যার সমাধানের পথ বাৎলে দিল। সে অনেক লেখাপড়া করার ফলে বাড়ীর সবারই রবির প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার ভাব ছিল। বাবা ও বড় ভাইও তার কথায় গুরুত্ব আরোপ করত। এহেন রবি মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়ী ছেড়ে গিয়ে এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করে বসল। এ ব্যাপারে সবারই মনে খুব দুঃখ। তবে বাড়ীর মেয়েদের চোখে নিজের পছন্দমতো এক মহিলাকে বিয়ে করে রবি বড় অপরাধ কিছু করেনি। ভগবান যার সঙ্গে যার জোড় মিলিয়ে দেন তাদের পরস্পরের মধ্যেই মিলন ঘটে। এরা এই সাধারণ বিশ্বাসটা সহজভাবে মেনে নেওয়ার স্বপক্ষে।

কামাক্ষী রবিকে বলল, 'বিদেশীদের কথা আমার বড় একটা জানা নেই। আমি একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি...কিছু আবার মনে করিস না...তোর বউ এই বিদেশী মেয়েটি কি আমাদের দেশের মেয়েদের মতো সংযতভাবে থাকে? তোর ইচ্ছানুসারে চলে ফেরে? ওখানে বসা সবার মনেই রবির স্ত্রী সম্পর্কে এ সন্দেহ ছিল। তবে কামাক্ষীর কথা শুনে যেন সে একটা খুবই বোকা রকমের প্রশ্ন করেছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে সবাই হেসে উঠল।

'তোমরা হাসছ কেন? দিদি কোনও ভুল কথা জিজ্ঞাসা করেনি...। আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি বলব যে গায়ের রং আর কথার ভাষায় আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে সে আলাদা। তা নইলে গুণের দিক থেকে সে ভারতীয় নারীরই প্রতিমূর্তি। আর বেশি কী বলব, তবে ভারতীয় নারীদের মত কথায় কথায় নালিশ, কান্না বা দোষাদোষীর মধ্যে একদম নেই। দিদি...চল আমার সঙ্গে। গিয়ে একবার ওকে দেখে ত' নাও...।' রবি কোনও রকম সঙ্কোচ না করেই স্ত্রীর প্রশংসা করল। তার কথা শুনে গ্রামের সব মেয়েরা চমকে উঠল।

'কোনও ছেলে-পিলে...' কামাক্ষী তার প্রশ্ন শেষ করার আগেই রবি জবাব দিল, নেই।'

কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলল, 'বাচ্চার জন্য এত তাড়া কিসের?' এটুকু শুনে

সবাই মনে মনে হেসে উঠলো।

ওকে দেখে আনন্দিত হয়ে কামাক্ষী বলল, 'মা কনেরের শিকড় পিষে খেয়েছিল বলেই আমাদের সবার সঙ্গে তোর দেখা হওয়ার সুযোগ মিলল...তা নইলে বাবাই বা কবে তোকে আসতে লিখত আর তুই-ই বা কবে আসতিস?'

'কি ব্যাপার? মার দুঃখটা কিসের? কেন এরকম করল?' রবি প্রশ্ন করল।

'দুঃখের তার কমটাই বা কিসের? তোর চলে যাওয়ার দুঃখ আর আমার কারণে দুঃখটাই কি যথেষ্ট নয়? তুই মায়ের স্বভাব ভালই জানিস। বোবার মত সব কথাই মনের মধ্যে পুষে রেখে দেয় আর সেগুলো ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠতে থাকে। মা ভেবেছিল যে পাঁচ বছরের ব্যবধানে বাবার ষষ্ঠিতম-পূর্তির সময় তোর সঙ্গে দেখা হবে আর তখন বাবার রাগটাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকমটি আর হল না। কোনও রকম ভয়ানক কিছু কাজ করলে বাবার স্বভাব বদলে যাবে। এই ভেবেই হয়ত একাণ্ডটা করেছে। বাবার কাছ থেকে মায়ের মনটা দূরে সরে এসেছে...এখন তাকে দেখলে মা আরও বেশি বক বক করে আর কাঁদতে থাকে। বেচারা বাবা! গোড়ায় অবশ্য অকারণ ঝগড়া-ঝাঁটি-ই বেশি করত। কিন্তু যখন বুঝল মায়ের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে, তখন থেকে সর্বদাই আঙ্গিনায় বসে থাকে, ঘরের ভেতরেও ঢোকে না। মায়ের ঘরে যেতেও ঘাবড়ে যায়। তবে যা কিছুই হোক, মার এ-ধরনের ভয়ানক একটা কাণ্ড করা উচিত হয়নি। তুই জানিস লোকেরা কি বলছে?...ওরা বলছে যে এটা বউগুলোর খারাপ ব্যবহারের ফল। হায় বেচারী বউয়েরা! এরা বাইরের লোকের সঙ্গে ভাল বা রূঢ় যেমন ব্যবহারই করুক শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে এরা খুব ভাল ব্যবহারি করে। এসব কি লোকেরা জানে? সত্যি, 'এটা ভগবানের অশেষ কৃপা যে মা ভাল হয়ে উঠেছে আর আমাদের ওপর কোনও কলঙ্ক বর্তায় নি।' রবি সব কথা শুনে মনে মনে চিন্তিত হল, 'তাহলে কি সব কিছুর কারণই আমি?'

'আচ্ছা, তুমি দুপুর গড়াবার আগেই গিয়ে স্নানটা সেরে এস' বলে বৌদি তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিল। সুশীলা তার স্নানের জন্য সাবান আর তোয়ালে ঠিক করে রেখেছিল। সেসব নিয়ে রবি ঘরের পিছন দিকে চলল। গত পাঁচ-ছ বছরে কত কি পরিবর্তন ঘটেছে। সব দেখে রবি চমকিত। পিছনের সেই কাঁঠাল গাছটা তাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে।

পাঁচ বছর আগে গাছটা অনেক ছোট ছিল। এখন তার নীচের দিকটায় অনেক কাঁঠাল। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এটা এখন একটা বিশাল বৃক্ষ। শাখার চেয়ে কাণ্ডের নিম্নভাগে কাঁঠাল বেশি। তার ওপর হাত পডতেই রবি বুঝল যে সব ভাল করে পেকে এসেছে। রসসিক্ত কোয়াগুলোর মধুর আস্বাদ সে কল্পনা করতে লাগল।

যাবার সময় একটা কাঁঠাল নিয়ে যাব। 'ওর পাকা কাঁঠাল খুব পছন্দ...' এটা ভাবতেই রবির স্ত্রীর কথা মনে এল।

সবার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে রবি বুঝল যে ভাইবোনদের কারুরই তার ব্যাপারে কোনও আপত্তি নেই। বাবা তার সঙ্গে কথাবার্তা বা খাওয়া-দাওয়ায় রাজী না হওয়ায় রবি বুঝতে পেরেছিল যে বাবার ক্রোধ এখনও কমেনি।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ভেতরের বারান্দায় এসে বসল।

'ওই নীচ লোকটা তোকেও এখানে ডেকে এনেছে?...হায় ভাগবান! তোমরা সবাই মিলে আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছ কেন?' অলমু কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল। তাকে কাঁদতে শুনে শিঙ্গারম পিল্লাই আর জামাতা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিঙ্গারম পিল্লাই ভেতরের দিকে দৌড়ে গেল।

সবার ধারণা ছিল যে রবিকে বাড়ীতে ফিরে পেয়ে অলমু আচ্চির মনে পরিবর্তন আসবে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। রবিকে দেখে অলমু আচ্চি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কাঁদতে লাগল আর বিছানায় এপাশ-ওপাশ গড়াতে লাগল। বাইরে থেকে ছুটে এসে শিঙ্গারম পিল্লাই রোগীর এই হাল দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি করবে সে বুঝে উঠতে পারল না।

'মা, আমি ভেবেছিলাম যে যেখানেই থাকি না কেন, তোমার ভালবাসা সর্বদাই পাব...এই বিশ্বাসের জোরেই আলাদা হয়ে রইলাম...আবার তুমিই সে সময় মৌন হলে...আর এই আত্মহত্যার চেষ্টার পরও তুমি কেন এমন করছ? কেন, মা, তুমি চাওনি আমি আসি? তুমি কি আমায় আর দেখতে চাও না?' অলমুর বিছানায় বসে তার হাতটা ধরে রবি খুব বিনীতভাবে এসব প্রশ্ন করতে লাগল।

তার কথা শুনে অলমুর কান্না আর বিলাপের ভাবটা কমলো মনে হল। তখন একটু শিশুর মতো সে ফোঁপাতে লাগল...চোখ থেকে থেকে জলে ভরে আসতে লাগল...রবিকে দেখে কান্নার সুরে বলতে লাগল, 'বাবা, তোদের দেখে, না আমার কোনও দুঃখ হচ্ছে, না আমার মনে কোন রাগ রয়েছে। পাপী আমি নিজেই...' অলমু আচ্চি তার হাতটা ধরে এ-ধরনের বিলাপ করতে লাগল।

তার বিলাপ আর কান্নাকাটি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রবি পাশে চুপচাপ বসে রইল। শিঙ্গারম পিল্লাই আর অন্যেরা এই বিশ্বাস নিয়েই ওখানে দাঁড়িয়ে রইল যে রবি অলমুর মনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে আর সঙ্গে সঙ্গে যে উদ্বেগ কিছুদিন যাবৎ পরিবারে দেখা যাচ্ছে, সেটা খানিকটা কমবে।

'মা, তুমি ভুলে যাও যে আমি তোমার ছেলে। এখন আমি ডাক্তার হিসাবে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। দেখি তোমার হাতটা' বলে রবি তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগল। এর পর অলমু 'রবি যেতে দে ওসব' বলে কাঁদতে শুরু করল। রবি খুব কঠোর স্বরে বলল, 'এই বকবকানি বন্ধ করো ত।' তার চোখের পাতা উল্টিয়ে চোখটা দেখল। ঘরের দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে মার কানে কানে কিছু জিজ্ঞাসা করল।

ঘরের ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ চীৎকার আর বিলাপ এবং রবির শান্তস্বরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল।

'রবি, আমার মান বাঁচা...এসময় ভগবানই তোকে এখানে পাঠিয়েছেন।'

'মা, চুপ করো। অনর্থক কথা বেশি বলো না।...এসময় অপমানের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।...তুমি সামান্য এই ব্যাপারটার জন্য পাগলীর মত আত্মহত্যা করছিলে? তুমি জানো কি বিদেশে বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর গৌরবের বলে মনে করা হয়। তুমি অনেক পূণ্য করেছ...ঈর্ষা করে কেউ তোমায় উপহাস করে ত করুক...মা, মাতৃত্বের মহিমা অপার! হায় রে হায়, মা, তুমি এই সামান্য ব্যাপারের জন্য ভয়ানক একটা কাণ্ড করতে যাচ্ছিলে? মা...মা' হাসতে হাসতে রবি বাইরে আসার আগেই শিঙ্গারম অন্যান্যদের সঙ্গে ঘরের পিছনের ক্ষেতে চলে গিয়েছিল।

রবির সন্দেহ ছিল বিষয়টা সবাই জানে কি-না। তাই সে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'একটা সুসংবাদ শোনো...আমাদের ভাই বা বোন হবে...।' রবি একথাটা বলতেই কেমন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। উঠোনে-বসা দুই জামাই জোরে হেসে উঠল। তাদের হাসি অলমুর শরীরে যেন সূঁচের মত গিয়ে বিঁধল। এক জামাই বলল, 'ঠিকই, বিয়ের পর ত' এই দুমাস হল!...কিছু দিনের মধ্যে বলয়কাপ্পু[1] সংস্কার হবে...।'

'এর ভেতর মজা বা হাসির কোনও ব্যাপার নেই। কোনও কোনও পরিবারে মা ও মেয়ে একই সময় বাচ্চার জন্ম দেয় না? সুশীলার জন্মের পর এই ষোল বছরে মা আর কোনও বাচ্চার জন্ম দেয়নি। তাই বিষয়টা তোমাদের কাছে লজ্জা বা অপমানের মনে হচ্ছে। মা আর তোমরা সবাই ধরে নিয়েছিলে যে আর তার বাচ্চা হবে না। তাই কথাটা তোমাদের এখন বিচিত্র লাগছে। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অদৃষ্টকেও কি তবে অস্বীকার কর। যদি এই মূল দেখাটাই ভুল হয়, তবে ত' আমাদের লজ্জিত হতেই হবে। আমাদের মা এই বয়সেও তার নারীত্বকে সার্থক ও সিদ্ধ করছে। মাতৃত্বের এই অবস্থায় তার পৌঁছানোর কথা ভেবে আমি গর্ব বোধ করছি...'রবি আনন্দে আবেগে বলে চলেছিল। হঠাৎ সে তার বৌদিকে মুখ ফিরিয়ে ভেতরের চলে যেতে দেখল।

'তার নিজের চিন্তা রয়েছে...'

'আমি বলে দিচ্ছি আমার সঙ্গে মজা করবি ত' এই লাঠি ভাঙছি..' বলে বাবা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে সোমু আর নিজের নাতি-পুতিদের হাতের ছড়িটা দেখিয়ে ধমকাচ্ছিল।

সোমু বাবার সঙ্গে খুব দিলখোলা..মজাও করে কত সময়। কবে কখনও এর একটা...

'ওরে সোমু, বাবার ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?' রবি হাঁক দিল। 'কিছু না' বলে

---

[1] বিয়ের পর প্রথম গর্ভধারনের পাঁচ মাস বাদে করণীয় এক সংস্কার। সে সময় গর্ভবতী নারীকে চুড়ি পরানো হয়।

সোমু বাবার কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে এসে দাঁড়াল।

এ-ভাবে দুটো দিন কেটে গেল...।

বাড়ীতে সব কিছু হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। এই নীরবতার মধ্যে সবার দৃষ্টিতেই যেন সহস্র ব্যঙ্গ আর তর্কের আভাষ। রবি মাঝের দুবোনকে হাসতে দেখল। কামাক্ষী আর সুশীলা যেন অলমু আচ্চির চেয়েও বেশি লজ্জা বোধ করছিল, যেন ওরাই ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত।

'মৌন...মৌন...মৌন...হায়, মৌন কি এক ভয়ঙ্কর ভাষা!'

শহরের লোকেরা আর আত্মীয় পরিজনেরাই বা কি বলছে? আর এ ত নিজেরই সন্তান...ছিঃ! নীচতার আর শেষ নেই। মাকে নিয়ে মজা করতে পারে? ইত্যাদি কথা ভেবে রবির মনটা উতলা হল।

এসব কথা ভেবেই না মা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কথাটা ভাবতেই রবির চোখ সজল হয়ে উঠল। রবির এসব সহ্য হচ্ছিল না। সে বাবার কাছে গেল।

'বাবা আমায় মাপ করো...। মায়ের যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি...দেশ আমাদের পিছিয়ে রয়েছে...লোকেরা সব অজ্ঞান, এরা মাতৃত্বের মহত্ব কি জানে না...এখানে মার থাকা খুব শক্ত হবে। তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।' যে-ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে এসে এসব কথা বলায় তার মন ভালবাসায় ভরে উঠল, তবে সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'এ তোরই মা, তাকে নেওয়ার জন্য আমার আদেশের কি দরকার? যদি সে যেতে রাজী হয়, তবে তুই নিয়ে যা তাকে।'

রবি সারাদিন মার পাশে বসে মাকে বোঝাল, মা, সেটাই খুব ভাল হবে...সেখানে আলাদা থাকতে চাও, তা-ও হতে পারে..ওদের দেশে এ ধরনের অবস্থাকে স্বাভাবিক ভাবেই তারা গ্রহণ করে...এটা তারা গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করে...একবার ওর সঙ্গে থাকলে, ওকে ছেড়ে তোমার থাকতে ইচ্ছা হবে না।'

'আরে সে ত আমার ভাষাও জানে না। তুই ওর সামনে আমায় অপমানিত করতে চাস?' বলে অলমু আচ্চি কাঁদতে লাগল।

'কি, মা, এখানে যারা তোমার অপমান করছে, তারা কোন ভাষায় কথা বলে?...সবাই মৌন কিন্তু যা করার করে যাচ্ছে। মৌন থেকে প্রেম আর শ্রদ্ধা কি প্রকাশ করা যায় না? কারুকে নিন্দা করতে, কাউকে ভালবাসা জানাতে কি কেবল ভাষারই প্রয়োজন?' মা রবির কথা বুঝতে পারল। সে রবির দিকে তাকাল আর হাতটা ধরে কাঁদতে লাগল।

গলিতে গাড়ী দাঁড়ানো।

বাড়ীর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আর সবাই এসে গলিতে দাঁড়ানোর পর, অলমু আচ্চি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে বসল। তার পেছনে রবি এসে গাড়ীতে সুটকেশটা রাখল আর রাজম বৌদির পাশে এসে দাঁড়াল।

সে সময় সদ্য কাটা একটি কাঁঠাল নিয়ে সোমু দৌড়তে দৌড়তে সেখানে এসে বলল, 'কি, দাদা, তুমি কাঁঠাল নেবে বলেছিলে না? এখন সেটা না নিয়ে কিভাবে চলে যাচ্ছো?' হঠাৎ রবির কল্পনা দৃষ্টিতে কাঁঠাল গাছটা ভেসে উঠল। কাণ্ডের নীচ ভাগে তার অনেক কাঁঠাল আর শাখা-প্রশাখার বিস্তারে গাছটা এখন বিশাল বৃক্ষ।

'বৌদি, তুমি বাড়ীর পেছনে কাঁঠাল গাছটা দেখনি? শাখায় না এসে কাণ্ডে তার ফল এসেছে। তার কারণ কি কাণ্ড আর শাখার বিরোধ? না, তা নয়। কাণ্ডে ফল দেখে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে শাখার আধার কাণ্ডই।' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে সে আবার বলল, 'আচ্ছা তুমি শীগগিরই দাদার সঙ্গে মাদ্রাজ চলে এসো। আগামী বছর আমি নিজেই এসে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, বৌদি তুমি যেমন ভেবেছো বা মা-ও ভেবেছে মাতৃত্ব-প্রাপ্ত-হওয়া পাপ নয়' বলে রবি হাসল।

সে সময় শিঙ্গারম পিল্লাইয়ের ধারণায় এল না গাড়িতে বসা অলমু আচ্চিকে কি বলে বিদায় দেয়। সে চুপচাপই ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। শিঙ্গারম পিল্লাই আর অলমু আচ্চি মৌনভাবেই একে অন্যকে দেখতে লাগল।

'বাবা, তবে যাই? মার জন্য কোনও চিন্তা করো না, আমরা তার দেখাশোনা করব। আচ্ছা চলি।' বলে হাত জুড়ে প্রণাম জানিয়ে রবি গাড়িতে উঠে বসল।

শিঙ্গারম পিল্লাই তবুও তাকে কিছু বলল না। বলার মত মুখও ছিল না আর কথাও জুটছিল না কিছু। মনের দুঃখটা চোখে প্রতিফলিত। গলির শেষটায় গাড়ি ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত শিঙ্গারম পিল্লাই দাঁড়িয়ে রবি আর অলমু আচ্চিকে দেখতে লাগল।

□

রাজম কৃষ্ণণ

জন্ম ১৯২৫ সালে। বহু বৎসর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কাটিয়েছেন। জীবনের আনন্দঘন অনুভূতি-গুলিকে গল্পাকারে প্রকাশ করেছেন। অনেক উপন্যাস, গল্প ও নাটক রচনা করে শ্রীমতী কৃষ্ণণ খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কাহিনীতে চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম শিল্প সৌকর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শব্দ আর শব্দ

চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী পরিবৃত এই উপত্যকায় অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীরবতাও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠলো। 'পাওয়ার হাউস' বোর্ড লাগানো উদকৈর বাস,—যেটা একবার এদিকে আসে, সম্ভবত সেটা চলে গেছে। জলাশয়ের উত্তর দিককার একমাত্র দোকানটায় কোনো ভিড় নেই।

সম্পতের নিজের বাসা থেকেই, দূরে ঘুরে যাওয়া পাহাড়ী ঢালের অন্য দিকের ছোট জলধারা আর তার ধারে প্রদীপের মতো দীপ্যমান পাওয়ার হাউসটা দেখা যায়। প্রতিদিন দেখতে অভ্যস্ত বারবার 'ডেয়লরেসে' লিপ্ত সেই ঝর্ণাধারা পড়ছিল।

এসময় দৃশ্যটা পর পর ভেসে উঠছে। গরম কোটের পকেটে হাত রেখে পাশের পাওয়ার হাউসের সামনেকার জলাশয়ের কিনারা ধরে চলতে চলতে নিজের গালে ঠাণ্ডা হাতটা ছুঁইয়ে সম্পত যেন শীতের সঙ্গে খেলা করছিল। জায়গাটা দু'হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে। ঝর্ণা, জলাশয় আর জনমনুষ্যবর্জিত অরণ্য প্রান্তর থেকে বইছে বাতাস। বর্ষার শেষে শরৎ ঋতুর আরম্ভ কেমন করে হয়। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার দরুণ শরীর প্রায় জমে যাবার উপক্রম। স্লুইস গেটের পাহারাদারদের অফিসের সামনে যেতে কিছু পরিচিত আওয়াজ শোনা যায়। অরণ্যের এক প্রান্তরে এই বিজলীঘরে হাজার হাজার কিলোওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ঘন জঙ্গল ঘেঁষে শূন্যমার্গ হয়ে বিপদশূন্য অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে আর সেটা লোকের দৈনন্দিন কাজে লাগছে। যন্ত্রের উৎপন্ন রী..ম..রী..ম ধ্বনি শুনে মনে হয় যেন কোটি কোটি ভ্রমর একসঙ্গে গুঞ্জন করছে।

মনে হচ্ছে আলেকজাণ্ডার আর শ্রবণন্ রাতের ডিউটি দিতে এসেছে। অরুণাচল দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কি ভাই, বাসটা চলে গেছে?'

'কি, তুমি জানো না? মনে হচ্ছে চলে গেছে কারণ দোকানে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না।'

ভেতরে পা দেবার আগেই আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় আর তার শক্তির আন্দাজ পাওয়া যায়।

এই বিরাট আর ঝকমকে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে সম্পত ভাবছিল যে এটা একটা পবিত্র মন্দির। এখানে প্রকৃতি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে মানব শিশুকে করুণা প্রদান করছেন। মনে এই চিন্তার উদয় হতেই তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পাঁচটার মধ্যে চারটা টার্বাইন চালু। সেগুলোর ভয়ঙ্কর আওয়াজ কানে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়ে দিচ্ছে।

যদি ভোরের ডিউটি হয় তবে নানা ব্যাপারে নানান ধরনের ধ্বনি শোনা যায়। বিজলীঘরের ভেতরকার শব্দ সব ভাল করে শোনার অবকাশ তখন থাকে না। পাশের স্কুলের হাতুড়ি পেটার আওয়াজ আর লোকজনের কোলাহল শোনা যায়। তখন শব্দগুলো ভাল করে শুনে আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করার ইচ্ছা আর হয় না।

যন্ত্রগুলো কেমন করে চলছে বোঝানোর জন্য জায়গায় জায়গায় লাল বাতি লাগানো। সেগুলো জ্বলে ওঠেনি; বিপদের কোনও সূচনা নেই। তার অর্থ সব ঠিক রয়েছে! একদম 'ও. কে.'।

আলেকজাণ্ডার তেলের কুপি আর তুলো নিয়ে যাচ্ছিল। সম্পত এসে অরুণাচলমকে সেদিনের ডিউটি থেকে রিলিভ করল আর বিদায় দিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

'কি ভাই ঠাণ্ডা লাগছে না? মনে হচ্ছে কুয়াশা পড়ছে।'

'হ্যাঁ, আরও ঠাণ্ডা পড়বে?'

'ও, তা খুব কড়া রকমের ঠাণ্ডা পড়বে। কি ভাই, আজ বাস এল না? আমি ত' পাঁচটা থেকে বসে আছি।'

'জানি না, কি ব্যাপার।'

অরুণাচলম সিনেমা পাগল। আগের বাসে গিয়ে রাতের শো দেখে ভোরে ফিরে আসা—মনোরঞ্জনের এ তার এক প্রিয় পন্থা। সে বিবাহিত, স্ত্রী আপাতত গ্রামের বাড়ীতে গেছে। হঠাৎ একজন ছোটখাট চেহারার লোককে বিজলীঘরের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল। কে সে?...

তার পরণে খাকী পোষাক আর এ. সি. সি. ক্যাডেটদের মত একটা টুপী। তাতে কোনও চিহ্ন নেই। বয়সে তার বার্ধক্যের ছাপ। চোখ আর গাল ঝুলে পড়েছে।

ভারী স্বরে সে বলল 'গুড ইভনিং স্যার...।'

'কি খবর নায়ুডু, এদিকে কি ভাবে?'

'এমনি চলে এলাম স্যার! এ সাহেব নতুন এসেছেন?'

'নতুন কেন হবে? এক মাস হতে চলল। তুমিই ত' কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে?'

'অসুস্থ ছিলাম স্যার। গতকালই বিছানা ছেড়েছি। এই ভাল কাজটা ছেড়ে কোথায় যাব?'

'তাত ঠিকই। কি ভাই, বাস এসে চলে গেছে।?'

'বাসটা 'গোডর শোলার' কাছে পৌঁছে খারাপ হয়ে যায়। তাই ত' রামৈয়ার লরীতে আমি এলাম।'

'চল রে, বোকা কোথাকার!' বলে অরুণাচলম নিজের বিরক্তিটা প্রকাশ করল।

নায়ুডু সম্পতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুরের..'

'না, না, এ-একলাই রয়েছে। নতুন এসেছে...একটু দেখাশোনা করো একে..' বলে অরুণাচলম সম্পতের গালে আস্তে একটা টোকা মারল।

'এ কি করছেন স্যার। এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় এই বনে-জঙ্গলে আপনি ত' আমাদেরই একজন। আপনি মাদ্রাজের...?'

সম্পত মাথা নাড়ল আর বলল, 'এ কে? বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

'নায়ুডু তোমার ঠিকানা বলে দাও। আচ্ছা আমি চললাম। মনে হচ্ছে বাসটা আসছে। 'ও. কে.' 'বাই বাই', 'গুড নাইট' বলতে বলতে বিদায় নিয়ে, কোটটা জোরে চেপে ধরে অরুণাচলম জোর কদমে হাঁটতে লাগল।

'এ সাহেব হপ্তায় তিনটা সিনেমা দেখেন...' বলে নায়ুডু হাসতে লাগল। 'স্যার, চার বছর আগে যদি এখানে আসতেন। সে সময় কত কাজকর্ম। জলের মতো পয়সা। বাঁধ বাঁধা হল এখানে, পাওয়ার হাউস তৈরি হল। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।... স্যার... এর আগে আপনি...।'

'গত মে মাসে আমার পড়াশুনা শেষ করেছি। প্রথমেই আমি এখানে...।'

'আচ্ছা। শহরের কোলাহলময় আবহাওয়া থেকে এসে এখানে হয়ত আপনার সময় কাটানা কঠিন। আমি ত' ত্রিশ বছর আছি এখানে। ফরেষ্ট সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে পেন্সন পাচ্ছি। ওই দেখুন বাঁধের ওপরে, লতার ফাঁকে আমার বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। সবাই আমাকে নায়ুডু নামেই জানে। আমার মেয়েটি এখানেই এক হাসপাতালে চাকুরী করে। স্যার, একদিন আসুন আমার বাড়ীতে। আপনাকে অন্তর থেকেই বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। লোকেরা আমার ওখানে তাস খেলতে আসে।'

'আচ্ছা...'

'হ্যাঁ, আরেকটা কথা..., আমার মেয়ের কাছে অনেক বইও আছে। সে ত' সেসব বলতে পাগল। স্যার খাওয়া-দাওয়া আপনার...?'

'আমি নিরামিষভোজী। এক বেলা মেসে খাই, অন্য সময় নিজেই বানিয়ে নি।'

'আপনি ত' একটা লোক রাখতে পারেন। এখানে কাজ করে, বাসায় ফিরে গিয়ে খাবার তৈরির ত' ঝামেলা। তাই না? আচ্ছা স্যার! আমি চলি। কাল দেখা হবে... গুড নাইট..।'

রাস্তায় গাড়ী আসছে দেখেই বোধহয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। রাতের সব দেখাশোনা করার জন্য অফিসার আসছিলেন। দিনে একবার, যখনই হোক, চক্কর

লাগিয়ে যান তিনি। কখনও ছটার সময়, কখনও বা নটার পর।

অফিস এলাকার বাইরে এসে সম্পতকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? নায়ুডুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল?'

সম্পত তার বন্ধুত্ব বরবাদ করেনি, তবে বুঝে উঠতে পারেনি যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাটা ঠিক হবে কি না। সে বলল, 'মশায়, আমি ত' এই সবে ওকে দেখছি...।'

'দেখা হল?... তবে ঠিক আছে...। তুমি ভাল ছেলে কিনা তাই বলছি। 'ও. কে.' 'গুড নাইট' বলে তিনি নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

তার সঙ্গী শর্মা খুব অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। প্রায়ই সময় পেরিয়ে অফিসে আসে। ঘরে নিত্যরোগী স্ত্রী। দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা। সবাই বলে যে ওরা গাঁয়ে পড়াশুনা করছে।

'মনে হচ্ছে বাস এসে চলে গেছে।' আস্তে আস্তে কথাটা বলতে বলতে শর্মা এসে ভেতরে ঢুকল।

তার কথা বলতে ভাল লাগত না। সিগারেট খোর যুবক, বৃদ্ধ, অফিসার—সবার ওপরেই তার একটা বিতরাগ। অরুণাচলমকে দেখেও মুখ বাঁকায়। ব্রিট্টোর কাছেও ঘেঁষে না। তবে সম্পতের প্রতি তার একটা স্নেহের টান।

'কি ভাই, সব 'ও. কে.' ত? মনে হচ্ছে 'লোড' কোথাও বেশি হয়ে গেছে?'

এ লোকটি গত আঠারো বছর যাবৎ এই আওয়াজের মধ্যে ডুবে আছে। বাস্তবিকই মেশিনের আওয়াজটা বেড়ে গেছে।

তাড়তাড়ি সে রিসিভার উঠিয়ে নব্বই নাইল দূরের এক কারখানা—শহরের প্রান্তস্থিত সাপ্লাই হাউসের সঙ্গে কথা বলল।

'হ্যালো, হ্যালো, পাওয়ার হাউস ওয়ান কলিং... শিঙ্গম-পট্টী সাবষ্টেশন?' তার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আশেপাশের সব শব্দই যেন চাপা পড়ে গেল।

কোথাও বিদ্যুতের লোড বেড়েছে তার দরুণ এখানে ভয়ানক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

দিন কুড়ির মধ্যেই এই ধ্বনির তীব্রতা, কম্পন আর তীক্ষ্ণ গর্জন বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রের সূক্ষ্ণ পরিবর্তন ধরতে সক্ষম হওয়াটা কেমন মজার! তাতে একটা নতুন গান শেখার আনন্দ। সেটা শিখে নেবার পর যেমন একটা মধুর রেশের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই জ্ঞানটা লাভের পরও মনের সেরকম একটা অবস্থা হয়।

নিরন্তর ঘূর্ণায়মান টারবাইনের বিভিন্ন অংশের দিকে শর্মা তাকিয়ে দেখে। দিনে দিনে বেড়ে-ওঠা শিশুর দিকে মা যেমন তাকায়, শর্মার তাকানোটাও তেমনি। সময় পেলে সে কাগজের ওপর 'শ্রীরাম জয়ম' লেখে। আলেকজাণ্ডার, রামন কুট্টী আর শ্রবণন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।

সম্পত এখানকার যাবতীয় আওয়াজের মধ্যে পুরো ডুবে গিয়েছিল। যন্ত্রের

ভয়ানক গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, লোহায়-জোড়া আধা-ডুবন্ত চক্রের ভেতর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ার একটা মৃদুমন্দ ধ্বনিও ভেসে আসছিল। জলের পরিবর্তে যেন শব্দধ্বনির একটা প্রবাহ বয়ে চলেছিল। এরই পটভূমিতে 'কেল' 'কেল' আওয়াজ—তুলে টারবাইন ঘুরছিল। এই ধ্বনিময়তার একটা যদি হয় মূল স্বর, তবে অন্যগুলো সব উৎপন্ন নাদ। একটা যদি হয় ফেনিলোচ্ছল জলাধারা, তবে অন্যটা নৃত্যপরা হংসতরী। এক যদি হয় বিশাল অরণ্য, অন্যটা বাতাসে আন্দোলিত পুষ্পগুচ্ছ। তার জীবন-আধার এই সজীব আকৃতিটা দুলতে দুলতে এদিকে আসতেই নানা রঙের সব ফুল যেন হেসে খেলে উঠছে।

'আরে,... এ কে?'

চাকরী না পাওয়ায় দিন পনেরো সে বাড়ীতেই ছিল, সেদিন বিকেল চারটার সময় পাশের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে এক যুবতীর চেহারা দেখা যাচ্ছিল। সে ভাল করে তাকাল—এ সেই যুবতী নয় ত'?... না, এ সে নয়। এর মধ্যে সে জীবন খুঁজে পায় নি।

যৌবনে কোনও সুন্দরীকে দেখে বিচলিত হবে না বা ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাবে না এই কঠোর নিয়ম যে করেছিল সে ত' নিজের মনের অবস্থা ব্যক্ত করার জন্য এটা করেনি। মেয়েটাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন বিদ্যুৎ-লতার রূপ পরিগ্রহ করে হাজির হয়েছে।

'তুমি কে? পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা খেলায়-রত ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়েটি কি? তুমি কি নীলার অনেক সখীর একজন? চাঁদনী রাতের আকাশ থেকে কি নেমে এসেছ? তুমি কি বিদ্যুৎ-লতা?'

হাতে হাত ধরে তার গলা জড়িয়ে ধরল সে। ভাবে বিভোর হয়ে উঠল। লুকিয়ে লুকিয়ে এই সুখাবেশের আনন্দে সে মেতে উঠেছিল, কিন্তু তাতে কোনও গৌরব ছিল না।

লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে নিজের হাতটা সে সরিয়ে নিল।

'তুমি আমায় নিয়ে খেলা করো না। সরে যাও তুমি।'

'আচ্ছা... তুমি রাজী হচ্ছো না। আমাকে দেখে তুমি খুশী হওনি?'

'কথাটা বলি কি ভাবে?... কিন্তু তোমায় এখানে আসার অনুমতি তো দিতে পারি না।'

'নীলা সকাল সাড়ে আটটায় তৈরি হয়ে লাইট হাউসের পাশে নিজের অফিসে চলে যায় আর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিকেলে ফেরে। কমলাও বড় বোনের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য তৈরি হচ্ছে। রাজুর আরও তিন বছর কলেজে পড়তে হবে। মার গলার সব অলঙ্কার ওজনে সাকুল্যে ত্রিশ সভরিণ—ব্যাঙ্কে বাঁধা পড়ে আছে। বাবার পেন্সনের আটাত্তর টাকা মালার বিয়ের ধার শোধের জন্য চলে যাচ্ছে। আমার কথাটা কি বুঝতে পারলে? পনেরো মাস পর্যন্ত চাকরী না পাওয়া 'বেকার ইঞ্জিনীয়ার' চলেছে। সেকারণে

লজ্জা তথা নিরুৎসাহ বোধ করে, এই নিরিবিলি ঠাণ্ডা জায়গাটায় এসেছি।'

সে তার পদ্মকোরকের মত হাত দিয়ে সুন্দর মুখখানা ঢেকে রেখেছিল। তবুও এর চোখের দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ।

'যদি কথা তাই হয়, তবে আমি যাই'

সে তার মুখটা ওর কানের কাছে নিয়ে বলল 'না, যেও না। তুমি মানতে চাইছ না? হ্যাঁ,...তুমি কে আমায় ত' বলনি।'

'আমি সব সময়ই তোমার কাছে কাছে থাকব।'

সে তার বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার সঙ্গে থাকবে বলছে সদাসর্বদা তার মানে...।

'চা,...বাবুজী..চা।'

রামন কুট্টী চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

অধিক স্নেহযুক্ত তৈল-চাকচিক্য, গরম কাপড়ের উষ্ণতা, আর চায়ের গরম আস্বাদ সবই যেন বেশ আরামপ্রদ। সবেগে প্রবাহিত জলরাশি থেকে একটা 'শোঁ' 'শোঁ' শব্দ উঠেছিল। এখানে ধ্বনি তরঙ্গের গুঞ্জনে 'হংসতরীতে' বসা যুবতী সম্বন্ধে যাবতীয় সুখস্বপ্ন আবিষ্ট করে ফেলছিল। এই শব্দ গুঞ্জন তার নিঃসঙ্গতা, তার ক্লান্তি সব দূর করে দিচ্ছিল।

রওয়ানা হয়ে আসার সময় মা মুখে বিশেষ কিছু বলেননি তবে,...নিজের তেইশ বছরের জীবনেও ত' কারুর বাড়ীতে কখনও চারদিনও থাকেনি।...কে জানে কি ভাবে এ থাকবে? হ্যাঁ, জায়গাটা ত' খুব ঠাণ্ডা ইত্যাদি বলে কান্নকাটি করেছিলেন। নীলা বাচ্চার মতো জোরে জোরে কেঁদেছিল। নাক আর চোখ তার লাল হয়ে গিয়েছিল। কমলাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

গাড়ীতে চড়ার পর বাবা বলেছিলেন 'সম্পত, তুমি ত' যাচ্ছো? সাবধানে থাকবে... অবশ্যই চিঠি দেবে।' তারপর চোখটা মুছে নিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল সেও এখন কাঁদতে শুরু করবে।

'পনেরো মাস বেকার রয়েছে। বাড়ীতে থাকায় এই বেকারত্বে তিতি-বিরক্তিটা আরও বেশি লেগেছে। এখন...' কথাটা ভেবে মার গলা ভারী হয়ে এল। নীলগিরি এক্সপ্রেস চলতে আরম্ভ করল। মনে হল সবারই এক একটা ভুলে যাওয়া কথা স্মরণে এল আর শেষে কাঁদতে কাঁদতে হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

'এখানে একশ' টাকার বেশি খরচ পড়বে না। আমি আমার কাজ শিখে নিয়েছি আর বেশ ভালই লাগছে। দিনের খাওয়াটা মেসে খাই আর রাতে নিজেই তৈরি করে নিই। সব দিকেই সুবিধা। নীলার জন্য পাত্রের খোঁজ করো...।' সব কথা সে চিঠিতে লিখেছিল। চার মাসে আমি নিজেই এক হাজার টাকা জমিয়ে ফেলব। এবছরে নীলার বিয়েটা হয়ে গেলে আগামী বছর কমলার জন্য পাত্রের খোঁজ করা যেতে পারে। তিন

বছর বাদে রাজার পড়াশুনাও শেষ হয়ে যাবে। তারপর...।

'টর র... টর র... টর র' একটানা ঘণ্টাটা বাজতেই তার খেয়াল হল যে কেউ তাকে খুঁজতে এসেছে আর কলিং বেলটা বাজাচ্ছে। বাইরে তোবড়ানো গাল আর কোটরগত চোখ নিয়ে নায়ুড়ু এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল।

'আরে, আপনি!... আসুন, আসুন।'

বারান্দায় উঠে সে দাঁড়াল। মশায়ের আজ ছুটি বলছিলেন। বাইরে সুন্দর রোদ দেখে ভাবলাম হয়ত বা উটি চলে গেছেন।'

'না, যাইনি আমি।'

'তবে ভালই হল এসে গেলাম। আসুন স্যার। চলুন আমার বাড়ীতে। রোদটা আরামের। আমার বাগানে বসে তাস খেলার জন্য বন্ধুবান্ধব সব এসেছেন।'

'তাস আমি খেলি না। আপনার কাছে বই আছে। সেসব পড়ব।'

'বই! অনেক আছে স্যার।'

সে লম্বা হাতাওয়ালা সোয়েটারটা গলিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে রওয়ানা হল। 'যদি এরা জুয়া খেলতে বলে তখন?' 'কোনও অছিলায়... ছিঃ! ছিঃ! মায়ের কোলের বাচ্চার মতো ভয় পাচ্ছে কেন? তার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, সে চাকুরী করে, বড় হয়েছে। নিজে রোজগার করে পরিবার-পোষণের ভার নিয়েছে, ছোট ছোট কথায় এত ভয় পাচ্ছে কেন? ঘাবড়াচ্ছে কেন?

জলাশয়টা ছাড়িয়ে, চা বাগানের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের ঢালু গায়ে চড়াই পথে ওরা পৌঁছে গেল। কিছু দূরে সিলভার ওক গাছের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট বাড়ী দেখা গেল। বাড়ীটার সামনের দিকে একটা ছোট গাছ বড় পাতা। নায়ুড়ু বলল, বসন্তকালে এতে ফুল-ফল হয়। বাড়ীর বাগানে ফুলের গাছ দেখা গেল না। ঘাসের ওপর সিগারেটের খালি প্যাকেট আর অনেক টুকরো। কাচের জানালাওয়ালা পাঁচফুট দীর্ঘ একটা বারান্দায় বন্ধু-বান্ধবেরা তাস খেলছে। কালো রঙের টাইট আর উলের শোয়েটার পরা যুবকবৃন্দ 'গ্ল্যাড টু মিট য়্যু' বলে কেতাদুরস্ত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আবার তাস খেলতে শুরু করল।

'গ্ল্যাড টু মিট য়্যু'-র তীক্ষ্নস্বরের মধ্যে একটা কোমল কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। সে সম্পতের দৃষ্টি তার দিকে ফেরাতে বাধ্য করল।

'স্যার, ওই আমার মেয়ে। আমি ওর নাম রেখেছিলাম সরস্বতী। তবে এখানে সবাই ওকে রোজী নামেই জানে'—বলে নায়ুড়ু হাসতে লাগল। তার প্রায় বোঁজা চোখেও একটা ঝিলিক খেলে গেল।

রোজীর সুগঠিত শরীর, উজ্জ্বল রং, গোলগাল চেহারা আর ভরা গাল—সবই আকর্ষণীয়। তার ভরা গাল, পার্বত্য অঞ্চলের ডুমুর ফলের মত এক ধরনের ফলের মত লাল। এই লাল ভাবটা পাহাড়ী মেয়েদের স্বাভাবিক রঙ, না রুজ ইত্যাদি

লাগানোর ফল সে বুঝে উঠতে পারল না।

তার কোঁকড়ানো চুলের গোছা কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কানের পাশে গাঢ় লাল রঙের ভেলভেটের মত একটা গোলাপ পাতা সমেত গুঁজে রেখেছে। ব্লাউজের হাতা নেই। মসৃণ-সুডৌল বাহু যে দেখে তারই মন বিচলিত হয়। পরণে প্লাষ্টিকের দড়িওয়ালা গোলাপী রঙের একটা লাইলন শাড়ী। সেটা বার বার খসে যাচ্ছে আর সবার নজর আকৃষ্ট করছে। বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা রেকর্ডপ্লেয়ার আর কিছুঁ টেপ। টেপে কিছু গানও রেকর্ড করা।

নায়ুডু জোরে বলল, 'রোজী, উনি বই পছন্দ করেন। তাস উনি খেলবেন না।'

'আচ্ছা, তবে আপনারও অনেকটা আমারই মত...। আসুন, বসুন...। আপনার বীটলসদের গান পছন্দ ত'...?'

কথা বলার সময় তার রঙ-করা ঠোঁটটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুঁচকে যাচ্ছিল আর অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল।

কিছু চেয়ারও সেখানে পড়ে আছে। ওপরকার কুশন-কভারে 'বি হ্যাপি' কথাটা নক্সা করা।

'বসুন...।'

'চ্যুইং গাম দেখে মনে হয় মিষ্টি হবে, তবে মুখে দেওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই সেটা রবারের মতো হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কি সেটা ফেলে দিই থু করে?'

সম্পত বসে পড়ল। '... ও. কে. দেন এনজয় ইওর-সেলভস'—বলে নায়ুডু সেখান থেকে চলে গেল।

রোজী একটা টেপ রেকর্ড-প্লেয়ারে চড়িয়ে সেটা বাজাতে শুরু করল। পরস্পর অসংবদ্ধ দুতিনটা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। সেই ধ্বনি সমূহের পৃষ্ঠপটে বিচিত্র আরো ক'টা আওয়াজ ভেসে উঠতে লাগল। এই ধ্বনি বিচিত্রা শুনে কোনও ব্যক্তিই নিজের হাত-পা বা শরীরের অংশ বিশেষ না নেড়ে থাকতে পারবে না।

'এই গান... আমার প্রাণাধিক প্রিয়'—বলে রোজী বসে পড়ে অঙ্গভঙ্গী আর তাল দিতে শুরু করল।

এই কর্কশ সুর শুনে সম্পতের মনে হল তার বাবার কথা শুনতে পাচ্ছে...'সম্পত... খোকা ঠিক মতো থাকিস।'

কয়েক মাস আগে তার জ্যেঠামশায়ের ছেলে রঙ্গমণি আমেরিকা থেকে টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসে। তাদের বাড়িতে এসে উঠেছিল। সে সময় বাড়িতে অনেক লোক এসেছিল। পিসির মেয়ে শকুন্তলার চার বাচ্চা, চেঁচানি, ঝগড়াটে আর বিশ্ব নিন্দুক তার বোন ভানু, চটকীতে সিদ্ধ তাদের জ্যেঠামশাই—সবাই এসেছিল। সেটা ছিল গরমের ছুটির সময়। রঙ্গমণি সারাটা দিন পপ মিউজিক নামধেয় 'য়া য়া, চা চা, কা কা' করত আর থেকে থেকে বিচিত্র আওয়াজ করে উল্লসিত হয়ে উঠত,

লোকেরা কেউ তার সেই সঙ্গীত বুঝতে পারত না। নিজের সেই পপ মিউজিক দিয়ে গোড়ায় সে লোককে প্রভাবিত করতে চাইত। তারপর অন্য কাজে প্রবৃত্ত হত। সেই গানে সবারই মাথা খারাপ হবার যোগাড়। একদিন রঙ্গমণি নিজের কাজে বেরিয়েছিল, তখন সম্পত তার সঙ্গে একটা চাল চালল।

সে ফিরে আসার পর সম্পত বলল, 'রঙ্গমণি, আমি এই টেপটা আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এনেছি। পপ মিউজিকের আধুনিকতম চেহারা এটা' বলে টেপটা রেকর্ড-প্লেয়ারে লাগানো হল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, 'গানটা শুনে বলবে যে কোন কোন বাদ্যযন্ত্র আর কার কার গলার আওয়াজ কানে আসছে।'

রঙ্গমণি সব আওয়াজ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। 'ড্রাম..গীটার..আরে সেতারও রয়েছে' বলে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এমন অনেক বাদ্যযন্ত্রেরও হিসাব ছিল যার সম্বন্ধে সম্পত কিছুই জানত না আর যার নামও হয়ত সে উচ্চারণ করতে পারত না। রঙ্গমণি তার তালিকা বাড়িয়ে চলেছিল।

সে বলল, 'এ গান খুবই উঁচু দরের। এটা আমি আমার সংগ্রহে রাখতে চাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাখবে। তবে এটার জন্য আমায় দশ ডলার দিতে হবে। দুপুরে আমার ঘরে যাবতীয় যা কিছু আওয়াজ শোনা গেছে, তা এটায় রেকর্ড করা হয়েছে' বলে সম্পত খিল খিল করে হেসে উঠল।

'আরে তোর তা খুব উঁচুদরের সঙ্গীত বোধ। তুই গানের চর্চা না করে শুধু লেখাপড়া নিয়ে রইলি। এ ভেবে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে' বলে রঙ্গমণি সহানুভূতি জানাল।

এখানে বসে হঠাৎ সম্পতের সেই রকমারি আওয়াজের কথা মনে হল।

রোজীর জানা প্রয়োজন যে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পতের বিশেষ সম্পর্ক নেই।

'চলুন ভেতরে গিয়ে বই দেখবেন। আমার অনেক বই এক জায়গায় রাখা আছে। এটা আমার একটা বাতিক।

তার মনে হল এর চেয়ে তাস খেললে ভাল হত। ঘরের ভেতর গেল। ঘরটা বেশ গরম। একটা চওড়া সোফা, গোল একটা টেবিল, বই বোঝাই কাঠের একটা আলমারী। বইগুলো আলমারীতে রাখারই যোগ্য নয়, অধিকাংশই পুরানো। সবই পকেট বুক সিরিজের সস্তা বই। তার বুঝতে দেরী হল না যে অধিকাংশ বই-ই সেক্স-ক্রাইমের।

'বসুন' বলে রোজী তাকে পড়ে থাকা সোফাটায় বসাল। আলমারীটা খুলে তার গোলাপী আঙুল দিয়ে সাত আটটা বই টেনে বের করে সম্পতের সামনে রাখল।

পথ-ভুলে যাওয়া বাচ্চার মতো ভয় পেয়ে সম্পত একদিক ছেড়ে অন্য অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল। বইয়ের পাতা উল্টে দেখতে লাগল। সব... সবই...।

বইয়ের ছাপা শব্দগুলোর মানে সে বুঝতে পারল না।

'বইগুলো কেমন? এ বইটা খুব মজাদার... বলতে বলতে একটা বই সে উল্টোতে লাগল।

সে উপন্যাস পড়ার কথা কখনও ভাবেনি। সংবাদপত্রের বড়-বড় অক্ষরে ছাপা খবর আর খেলাধূলার বিবরণ কিছু কিছু পড়ত।

রোজী রেকর্ড-প্লেয়ারটা বন্ধ করেনি। বারবার সেই পরস্পর অসংবদ্ধ ধ্বনিগুলো শোনা যাচ্ছিল। সে আওয়াজগুলো তার মাথার কোণে-পড়ে থাকা অর্ধ-সুপ্ত কতকগুলো ভাবনাকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছিল।

'সম্পত... ঠিক মতো থাকিস...' বাবা বলেছিলেন। সে বইগুলো সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'কি, এখন বাগানের দিকে যাবেন?'...বলতে বলতে সে মেয়েও তার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

'নায়ুডু কোথায়...?'

'হা-হা-হা' সে খিল খিল করে হেসে উঠল। 'বাবা ত' প্রায়ই এরকম ঘুরতে চলে যায়। আমরা দুজনে কোথায় যাব?'

'কোথাও নয়... আজ আমার ডাকে একটা... চিঠি পাঠাতে হবে। আমি... যাচ্ছি..' বলতে বলতে হঠাৎ সম্পত চুপ করে গেল।

'কি বলেছিলেন আপনি? আমি ত' ভেবেছিলাম যে সময়টা বেশ মজা করে কাটবে... কি, আপনার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না?'

'না, তা নয়... ডাক চলে গেলে চিঠিটা পাঠাতে পারব না, তাই?'

'একথায় আমার খুব দুঃখ হচ্ছে...যাক কাল আসবেন?'

'কাল?!

'হ্যাঁ, কাল। বাবা তার বন্ধুদের সঙ্গে কাল শিকারে যাবে। আপনি না এলে 'বোর' হয়ে যাবো। কাল নিশ্চয়ই আসবেন।'

'ও কাল... কাল ত' হবে না... কাল আমার কাজ রয়েছে একটু... আচ্ছা আমি চলি।'

তার মনে হল কোমল একটা ফুলকে সে সূঁচ দিয়ে বিদ্ধ করছে। মনে মনে তাই সে লজ্জিত বোধ করল আর তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

এখনও রোজী টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে আর হাসছে। পর্বত-শিখরও যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসছে। সামনের দিক থেকে সম্পতের বাস আসছিল। ড্রাইভার সাবধান করার পরে সে সচেতন হল। ঝটপট রাস্তার ধারে সরে এল। তার মনে হল বাসটা ওকে খুব খুঁটিয়ে দেখছে।

'আমায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে নায়ুডুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল নাকি? এখন আমাকে এখানে দাঁড়ানো দেখে ওরা আমার বিষয়ে কি ভাবছে?

সেদিন সে সারাদিন ঘরেই রইল। থেকে থেকে রোজীর হাসির গুঞ্জন তার নিঃসঙ্গতা ঘোচাচ্ছিল। সেই হাসি যেন কম্বলের ভেতরকার ছড়িয়ে পড়া এক ঠাণ্ডা আমেজ। সেটা থেকে থেকে শীতলতার ছোঁয়া দিচ্ছে আর প্রশ্ন করছে, 'কি, একা একা লাগছে?' হাসবার সময় রোজীর লিপষ্টিক রঞ্জিত ঠোঁট সঙ্কুচিত আর প্রসারিত। সেই ঠোঁট যেন সম্পতের নিদ্রা হরণ করে নিয়েছে।

ভোর হয়ে গেল, তবুও তার ঘুম আসছিল না।

চোখ খুলতে কলিং বেলের 'টর.. র...র' আওয়াজ শোনা গেল।

ভীত হয়ে নায়ুডুর কথা ভাবল, 'সে কি সকাল সকালই তার পেছনে ধাওয়া করেছে।'

সম্পত চুপচাপ পড়ে রইল বিছানায়। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাঁচেও টোকা পড়ল। সে উঠে হাত দুটো একত্র করে আস্তে আস্তে কপাটের কাছে গেল, কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। বাইরে অরুণাচলম দাঁড়িয়ে।

'কি ভাই, শরীর কি ঠিক নেই? বারবার টেলিফোন করে সাড়া না পেয়ে ভাবলাম কি নিজেই এসে দেখা করি। ঘণ্টাও বাজাচ্ছি দশ মিনিট ধরে আর তুমি আসছো না। ব্যাপার কি?'

'না ভাই কিছুই নয়। ভেতরে এস। কখন গাঢ় ঘুম এসে গেছে টের পাইনি।'

'খুব ঘুমিয়েছো! এখন কটা বাজে... খেয়াল আছে? সাড়ে দশটা বাজে। এতক্ষণ ঘুম, কি ব্যাপার?'

'তেমন কিছু ব্যাপার নয়... ভাবলাম ডিউটি ত' বিকেলে...।'

'সম্পত, আমায় একটু সাহায্য করবে?'

'হ্যাঁ, বল।'

... বাড়ী থেকে কজন লোক আসছে আজ। ওদের আনতে উটি যাচ্ছি। চারটে পর্যন্ত ব্রিট্টো থাকছে। তারপরটা তুমি যদি সামলে দাও।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

অরুণাচলম তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

পাওয়ার হাউসের বিশাল বাড়ীটা যেন তার আশ্রয়স্থল। সে ভাবলো এখানকার আওয়াজে সে সব কথাই ভুলে যেতে পারে। এরকম ভাবলে মনে একটা শান্তি পাওয়া যায়।

জলাশয়ের ধার ধরে যাবার সময় নিজের অজ্ঞাতেই সে ওই চা-বাগানের অন্যপ্রান্তে দৃশ্যমান সেই বাড়ীটার দিকে তাকাল। বিজলীঘরের আওয়াজের বদলে যেন সেই মেয়েটির হাসি শুনতে পাচ্ছে। দাঁতে আঙুল-কামড়ানো রোজীর লাল ঠোঁটটার কথা মনে হয়।

গভীর বেদনা। জোরে পা চালিয়ে সে বিজলীঘরে পৌঁছে গেল।

লুব্রিকেটিং অয়েল... তুলো নিয়ে এসো... আওয়াজ...।

যন্ত্রের মাথায় লাগা নোংরার দিকে দেখছে। লাল বাতি জ্বলে উঠেছে। ইঙ্গিত করছে যে যন্ত্র বেশি গরম হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে, পিছলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে সব কিছু 'ও. কে.' নয়। সেই ভয়ানক আওয়াজ শান্ত হয়ে আসার পর সে 'কয়েঙ্গ' 'কয়েঙ্গ' আওয়াজকারী ঘুর্ণায়মান টারাবাইনের দিকে নজর দিল।

তাকে সাহায্য করার জন্য তেলের কুপী নিয়ে যন্ত্রের যে অংশটা গরম হয়ে গেছে, সেখানে তেল দেবার জন্য শ্রবণন দাঁড়িয়েছিল। অফিসার এসে চলে যায়। সব সময়ের মতো শর্মাজী আবার লেট আসছে! সম্পত রামন কুট্টীকে পাঠিয়ে মেস থেকে দোসা আনিয়ে নিচ্ছে আর রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলছে।

শর্মাজী 'শ্রীরাম জয়ম' লিখতে বসে যাচ্ছে। সম্পতের কল্পনা দূর দূর প্রান্তে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ধ্বনির লয়ে সে 'তাকে' দেখার চেষ্টা করছিল।

যখন টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করছে, তখনই কি তার চেহারা ভেসে উঠছে?

তার হাসি, লাল ঠোঁট, সুডৌল বাহু—বারবার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে।

উঠে মাথাটা সজোরে ঝাঁকাল, তবুও যেন একটানা ওর শ্লেষাত্মক হাসিটা শুনতে পাচ্ছে।

হায়... সেই হাসি...।

সে কানটা চেপে বন্ধ করে নিল।

'ঘড় ঘড়' শব্দে এক্সপ্রেস গাড়ী চলে গেলে রেললাইন যেমন নড়ে ওঠে, তেমনি যেন ওকেও ধরে কেউ জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

রামন কুট্টী বলছে, 'বাবুজী, চা... কি, আপনার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

সম্পত জবাব দিল না। সে আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলল।

শর্মাজী 'শ্রীরাম জয়ম' লেখা বন্ধ রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাই, বৃষ্টিতে ভিজেছো? তুমি ত' নতুন এসেছো এখানে। তোমায় একটু খেয়াল করে চলতে হবে?'

'না মশায়।'

'কি না বলছ? তোমার চেহারাই ত' বলছে। তুমি চলে যাও। গিয়ে বিশ্রাম করো। এখানকার কাজ আমি সামলে নেব। তেমন প্রয়োজন হলে খবর দেব তোমায়। তুমি যাও...।'

'না, মশায়, সেরকম কিছু নয়...।'

'মনে হচ্ছে যে আজ তুমি বেলা তিনটায় ডিউটিতে চলে এসেছো। আজকাল তোমার কাজ করার সেই ক্ষমতা কোথায়? বলে শর্মাজী লোহার সিঁড়ি বেয়ে উপরে বিশ্রাম কামরায় তাকে পৌঁছে দিয়ে এল। এসে আবার নিজের কাজে লেগে গেল।

ওখানে একটা স্ক্রীন, দুটো বেঞ্চি, একটা বালিশ আর একটা কম্বল পড়ে ছিল। হিটার থাকায় কামরাটা গরম।

সেই নিরিবিলি পরিবেশে শুয়ে পড়ার পরেও আওয়াজ কি আর ভোলা যায়। ধ্বনি তরঙ্গের মধ্যে সে... এখানে রোজীর... তার সেই পাহাড়ী ডুমুরের মত গাল...

'সর, বদমাইস মেয়ে কোথাকার! ভাগ এখান থেকে' বলে সে কম্বল ঠেলে সরিয়ে চটপট উঠে পড়ল। কোণায় পড়ে থাকা খবরের কাগজের একটা টুকরো আর মোটা অক্ষরে ছাপা একটা খবর তার নজরে এল। চিন্তাধারাটাকে অন্য পথে চালানোর জন্য সে খবরের কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

সংবাদের শিরোনামাটা ছিল : বিজলীঘরের গভীর জলাশয়ে পড়ে যাওয়া বেচারী হাতী। এধরনের ঘটনা কখনও কোনও বিজীলঘরের কাছে ঘটে। হাতীটা গভীর জলে পড়ে গিয়েছিল। সেটাকে উদ্ধারের জন্য লোহার তারের দড়ি আর ক্রেন ব্যবহার করতে হয়েছিল। মনে মনে ঘটনাটা কল্পনা করতে করতে সে চোখটা বুঁজলো।

উঁচু উঁচু বীম-ওয়ালা দুটো ক্রেন। সেসব শব্দ আর হাতীর চীৎকার যেন আস্তে আস্তে শোনা যেতে লাগল. একটু ভুল হয়ে গেছে। ভয়ানক চীৎকার করতে করতে সে ধপাস করে পড়ে গেল। 'কে আছ? আরে, ওখানে কে? কি হল ওখানে? কি হাতীটাকে জল থেকে তোলা গেছে?' এখানে জলের ভেতরটা তন্ন তন্ন করে দেখছে। তার মনে হল পায়ের নীচের জমি খু ব জোরে দুলছে। 'আরে ওইত' ওখানে...ওখানে না? বিদ্যুৎ-লতারূপে হংসতরীতে বসে ছিল না?... তাকে... এই পাঁকের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে কে ফলল?'

তার মনে হল কারুর হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কি রোজী হাসছে? হঠাৎ শরীরের স্নায়ু-তন্ত্রী কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ শোনা গেল. সে সময় ওখানে পড়া ওই বেঞ্চিটাও নড়তে লাগল। জলাশয়ে পড়ে যাবার কথাটা খেয়াল হতে কর্তব্য-ভাবনাও জেগে উঠতে লাগল।

'বাটন বন্ধ করো। বন্ধ করে দাও... করো না বন্ধ! বলতে বলতে সে ঝটপট উঠে ভাঙ্গা সিঁড়িটা ধরে নেমে আসতে লাগল।

'কি ভাই, সম্পত, এভাবে ঘাবড়ে গেছো কেন?'

'মশায়,...আওয়াজ...'।

'সব ঠিক রয়েছে ভাই। তুমি নিজেই দেখে নাও সব ঠিক আছে।'

লাল বাতি জ্বলছে না। জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টারবাইন ঘোরার সময়ও কারুর হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...।

'কটা বাজে, স্যার?'

'দুটো। তুমি মাত্র পনেরো মিনিট আগে শুতে গেছো।'

'মশায়, এই গোলমালে শুই কি ভাবে? মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে...।'

'এখানে এটাই ত' সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার। যতক্ষণ এই আওয়াজের ধরণ-ধারণ রপ্ত না হচ্ছে, ততদিন এসব আজব মনে হয়। কানে একটু তুলো লাগিয়ে শোবার চেষ্টা করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা... তুমি স্বপ্ন ত' কিছু দেখোনি... ?'

সে কি উত্তর দিতে পারে ?

'যেদিন প্রথম বিজলীঘরে কাজে এসেছিলাম, সেদিন আমারও এরকমই লেগেছিল। সেসময় কোথায় ছিল 'অটোমেটিক মেশিন'? বড় কষ্ট করতে হ'ত। বাড়ী ফিরে গেলেও সেই আওয়াজ গুঞ্জরিত। পরের মাসে গ্রামে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এলাম। তখন কিন্তু অন্য রকম, অনেক হালকা মনে হল...।'

শর্মার মুখে হঠাৎ বিজয়ী-সুলভ একটা জয়ের হাসি ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। সম্পত আর ঘুমের চেষ্টা করল না। সে চোখ বুঁজে ভাবতে লাগল যে বাড়ীর লোককে কি লিখবে।

'এখানে মেসে ভাল খাওয়া পাওয়া যায় না। পেটে আমার সর্বদা একটা ব্যথা। এখানে হোটেলও ভাল নেই। এখানে সবাই আমায় বিয়ে করতে বলছে। যদি ভাল মেয়ে পাওয়া যায় ত' আমারও...।'

□

কু. অলগিরিস্বামী
১৯২১ সালে জন্ম। বিভিন্ন পত্রিকার জন্য নানা ধরনের সুন্দর রচনা ছাড়াও সম্পাদকের কাজও করেছেন। অনেক গল্প-সংগ্রহ, সংকলন, নাটক, ছোটদের জন্য গল্পের বই প্রকাশ করা ছাড়াও, সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত। গান্ধীবাদী চিন্তাধারার বিশেষ সমর্থক। গান্ধীজীর অনেক লেখার অনুবাদও করেছেন।

কুমারপুরম রেলস্টেশন

নির্জন একটা স্থানে কুমারপুরম স্টেশন। চারিপাশে আধ-মাইল পর্যন্ত কোনও গাঁ-বসতি নেই। স্টেশন বানানোর পর একটা নাম ত' তার দিতেই হয়? তাই এই স্টেশনের নাম কুমারপুরম রাখা হয়েছে। নইলে এক মাইল দূরের গাঁ কুমারপুরম বিগত পঁচাত্তর বছর যাবৎই স্টেশনের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখেনি। বলা হয় যে দাদুবর্ষে[1] একবার আকালের সময় জনহিতার্থে তিরুচ্চী থেকে তিরুনেলবেলী পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হয়েছিল। এই স্টেশনটা সে লাইনের কোচিলপট্টী থেকে সাত মাইল দক্ষিণে। আশে-পাশের গাঁয়ের লোকেরা মন্দির-দর্শন বা তীর্থযাত্রা করতে জীবনে হয়ত এক বা দুবার বেরিয়েছে। এখান থেকে দশ মাইল দূরে চণ্ডিকা দেবীর এক মন্দির। সেখানে গিয়ে ক্ষীর চড়ানোর এক রেওয়াজ। সেই তীর্থক্ষেত্র পর্যটনের জন্য রেল বা মোটর, কোনোটারই প্রয়োজন নেই। সাধারণত যেসব জায়গায় লোকজনের যেতে হত, সেসব জায়গা স্টেশনের চেয়ে কম দূরে। এ-অবস্থায় গাঁয়ের লোকেরা পায়ে না হেঁটে কোন বুদ্ধিতে স্টেশনে গিয়ে রেল ধরবে?

এই স্টেশনের ইতিহাসে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুব্বারাম আয়ারই প্রথম বলা যেতে পারে। কোচিলপট্টী থেকে তিন দিন হল উনি এসেছেন। নতুন স্টেশন মাষ্টারের তিনি বাল্যবন্ধু। কিছুদিন এরা স্কুলে একসঙ্গে পড়েন। কি যেন একটা আত্মীয়তাও ছিল। এই নির্জন স্টেশনে হঠাৎ তাঁর বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানো তথা অতিথি সৎকারের একটা সুযোগ মিলে গেল। ওঁর ছেলের ছ'বছর পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে বন্ধুকে উনি আমন্ত্রণ জানান। সেই শান্ত পরিবেশে বন্ধুর সঙ্গে নিশ্চিন্তে সময় কাটানোর জন্য সুব্বারাম আয়ার চলে এলেন।

ষষ্ঠ বর্ষপূর্তির উৎসবে সুব্বারাম আয়ারই ছিলেন একমাত্র বহিরাগত অতিথি। দুই বাল্যবন্ধু রাতভোর নিজেদের জীবনের নানা বৃত্তান্ত—এক জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার পরবর্তী সব ঘটনা আর পারিবারিক সব বিস্তারিত আলোচনায় মগ্ন রইলেন।

---

[1] অন্যতম তামিল সাল

স্টেশন মাষ্টার জানতে চাইলেন কোচিলপট্টীতে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়। সুব্বারাম আয়ার জানতে চাইলেন কুমারপুরম স্টেশনে সময় কাটে কেমন করে...। এসব কথাবার্তায় একদিন চলে গেল।

পরের দিন কাজে যাবার সময় স্টেশন মাষ্টার সুব্বারাম আয়ারের অনুমতি নিয়ে তবে গেলেন। দিনে স্টেশন মাষ্টার যখন বাড়ীতে নেই সে-সময় তাঁর ছেলের সঙ্গে সুব্বারাম বসে বসে মজা করলেন। অবশ্য তাঁর সেই ছেলের সঙ্গে খেলা করা বা তাকে আনন্দ দান করার অভ্যাস ছিল না। কারণ সম্ভবত তাঁর নিজের পেশা। এসব সময় কথায়-বার্তায় উনিও ছোট্ট ছেলেই হয়ে যেতেন। কোনও প্রকারে দুপুর কাট্‌ল। খাওয়া-দাওয়ার পর দুঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলেন। তিনটা, সাড়ে তিনটা নাগাদ উঠে একটা বই নিয়ে তিনি স্টেশনে চলে গেলেন।

প্লাটফর্মের ওপর পাঁচ-ছটা নিমগাছ। গরমের সময় গাছে অজস্র ফুল। বহু ফুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন পাতায় গাছ ছেয়ে গেছে। মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে শীতল বাতাস বইছে। স্টেশনের এক ধারে গাছের নীচে একটি বেঞ্চে বসে বই খুলে উনি পড়তে শুরু করলেন। এখানে বেশ হাওয়া লাগছে। কিছুক্ষণ বাদে দক্ষিণ-দিক থেকে একটা এক্সপ্রেস গাড়ী এল। যথাবিধি না থেমে গাড়ীটা চলে গেল। এখন পরের গাড়ীটা আসবে সন্ধ্যা ছ'টার পর। তাই স্টেশন মাষ্টার এসে বন্ধুর কাছে বসলেন। সুব্বারাম আয়ার বই বন্ধ করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব স্টেশনে কোনও যাত্রী আসে?"

স্টেশন মাষ্টার উত্তর করলেন, 'কেন্ আসবে না? কালও ত' এখানে এক যাত্রী এসেছিল।'

সুব্বারাম আয়ার জোরে হেসে উঠলেন। আগের দিনের যাত্রী ত' উনি নিজেই।

আরও জোরে জোরে হেসে বললেন, 'এরকম আরও দশটা স্টেশন থাকলে প্রতি বছরই রেল বাজেটে ঘাটতি দেখাতে হবে।' উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'না এমন কথা বলা চলে না। কাল সোমবার কোচিলপট্টীতে হাট। দশজনেরও বেশী লোক টিকিট নেবে।'

'তাহলে বলো, কাল স্টেশনওয়ালা দুটাকা কামাবে।'

দুজনেই হাসতে লাগলেন। কুরুপ্পেয়া নামে একটি কুলী এসে এক ধারে দাঁড়াল। সে-ও তাঁদের কথায় মজা উপভোগ করতে লাগল।

'এই স্টেশনটা বানানো হয়েছিল কেন? না হলেই বা কি ক্ষতি ছিল?'

'চারপাশের গ্রামের সব অধিবাসীরা এই স্টেশনের উপকারটা পাচ্ছে। স্টেশনের দরুণ তাদের এই লাভবান হবার ব্যাপারটা এখানে আসার পরই আমি বুঝতে পেরেছি।'

সুব্বারাম আয়ার চুপচাপ ওঁর কথাগুলো শুনছিলেন। স্টেশন মাষ্টার বললেন, 'আজকাল গরমের দিনে চারিপাশের মাঠ সব খাঁ-খাঁ করছে। কোনও দিকে সবুজের

চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না। অন্য সময়ে এমনটি হয় না। জমি এখানে উর্ব্বর। সব রকম শস্য জন্মায়। ক্ষেতে যারা কাজ করে, তারা মাটির কলসী নিয়ে এখানে খাবার জল নিতে আসে। ওদের কম করে বিশ কলসী জলের প্রয়োজন। সে হিসেবেও স্টেশন ওদের কাছে প্রয়োজনীয়।'

'তা হলে বল যে জলের জন্য স্টেশন বসানো হয়েছিল।'

স্টেশন মাষ্টার গম্ভীর হয়ে গেলেন। উনি বললেন, 'একটা জিনিসের প্রয়োজন হলে মানুষ দুটো জিনিস বানিয়ে ফেলে। কোনও বিশেষ কাজের জন্য একটা জিনিস তৈরী করে, কিন্তু অন্য কাজেও সেটা আসে। লোক এক উদ্দেশ্যে পয়সা খরচ করে, কিন্তু পরে বোঝে বাজে খরচা হল। সংসারেই যখন এই নিয়ম, তখন কুমারপুরম স্টেশানের দোষ কি?'

সুব্বারাম আয়ার ঈষৎ ব্যঙ্গ ভরে হেসে বললেন, 'তোমার এই স্টেশনটা একটা জানালা। এর মধ্যে দিয়ে তুমি দুনিয়া দেখছো। এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে এই ছ'মাসে পাথরে তৈরী এই বাড়ীটার প্রতি তোমার এতটা মোহ জন্মে গেছে।'

ক্ষণিক মোহাবিষ্ট থেকে স্টেশন মাষ্টার বললেন—'আচ্ছা, আমায় বলো ত' কোচিলপট্টীতে যে স্কুল বানানো হল, সেটা কিসের জন্য?'

'স্কুল কেন বানায়? বাচ্চাদের পড়াশুনার জন্যই বানায়।'

স্টেশন মাষ্টার বললেন, 'একথায় তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু বলো ছেলেরা এত দলে দলে কেন পড়ে?'

'তুমি অমনি জেরা শুরু করলে?'

বুঝে শুনেই প্রশ্নটা আমি করছি। তুমি জবাব দাও।'

'... ... ...'

'তুমি বলবে জ্ঞানার্জনের জন্যই বাচ্চারা পড়ে।'

'তুমি অন্য আর কি কারণ দর্শাতে চাও?'

'নিছক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই বাচ্চাকে স্কুলে পাঠায় এমন বোকা কেউ নেই। আমরা দুজন কি কেবল নিজেদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্যই স্কুলে পড়েছি? যদি এধরণের কোনও বিধান চালু হয় যে নিরক্ষরেরও চাকুরী হবে, তবে বলব যে কেউ, এমনকি বর্ষা থেকে বাঁচার জন্যও স্কুলবাড়ীতে আর আসবে না।' স্টেশন মাষ্টার টিপ্পনী কাটলেন।

সুব্বারাম আয়ার হেসে উঠতেই কুলীটিও হাসতে লাগল। ওর সামনে মস্করা ঠিক হবে না ভেবেই সম্ভবত সুব্বারাম আয়ার চুপ করে গেলেন আর নিজের বইটা উঠিয়ে নিলেন।

'কি চুপ করে গেলে কেন?' এই বলে স্টেশন মাষ্টার তাকে উস্কে দিলেন।

'কথায় তোমার সঙ্গে কে জিততে পারবে? যতদিন চন্দ্র-সূর্য রয়েছে,ততকাল

কুমারপুরম স্টেশন থাকুক, আমার ক্ষতি কিছু নেই' বলে সুব্বারাম আয়ার এমন ভাবে বইয়ের পাতা উল্টোতে লাগলেন যেন কিছু খুব জরুরী বিষয় খুঁজছেন।

স্টেশন মাষ্টার কুলীটাকে বললেন, 'কুরুপ্পৈয়া বাসায় গিয়ে কফি বানাতে বল।' এই বলে তাকে সরিয়ে দিলেন।

সুব্বারাম বললেন, 'আমিও চলি।'

কিছুক্ষণ বাদে দুজনেই স্টেশনের ধারে বাড়ীর দিকে চললেন।

সকাল আটটা নাগাদ উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী ছিল। তৃতীয় দিনে সে গাড়ীতেই তাঁর যাওয়ার কথা। দিনটা ছিল সোমবার। কোচিলপট্টীর হাটে যাবার জন্য বস্তা-পোঁট্‌লা শুদ্ধ চার পাঁচজন যাত্রী এসে স্টেশনে জড় হয়েছিল। পান চিবোতে চিবোতে নিজেদের মধ্যে এরা কথাবার্তা বলছিল। সওয়া সাতটা নাগাদ সকালের জলখাবার খেয়ে সুব্বারাম আয়ার প্ল্যাটফর্মের নিমগাছের নীচে একটা বেঞ্চিতে এসে বসলেন। প্রথম দিনের মতোই যে বইটা হাতে ছিল, সেটা বের করে পড়তে শুরু করলেন। তাদের স্বভাবমতো গাঁয়ের লোকগুলো জোরে জোরে কথা বলছিল। ফলে নিরিবিলি বই বড়া সম্ভব হচ্ছিল না। নিমগাছের দিক থেকে সুরভিত বাতাস বইছে।

'এই শুকনো মরুময় জায়গাতেও এধরণের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস। চোখ মেলে তাকালে কেবল কালো মাটি আর মাটিই চারিদিকে নজরে পড়ে। এই জমিতে গাছ লাগানোতেই এমন অনুপম সুগন্ধে সব ভরে উঠেছে। এ-ই মাটিতেই সুগন্ধ উৎপন্ন হচ্ছে।'

দূরের গ্রামগুলোর দিকে তাকালেন তিনি।

'এসব গ্রামের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ সবাই জমিকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছে। এই কালো মাটি সুগন্ধ দিচ্ছে জীবনও দিচ্ছে সবাইকে।'

হাতের বইয়ের শব্দাবলীর মতই তাঁর চিন্তাস্রোতও বয়ে চলেছিল। চিন্তাধারা অজানা দিক থেকে এসে যেন বইয়ের আগে আগে চলছে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল পশ্চিম দিকে আধমাইলটাক দূরের থেকে চার-পাঁচজন লোক স্টেশন অভিমুখে দৌড়ে আসছে।

মনে মনে ভাবলেন সুব্বারাম আয়ার 'গাড়ীর ত' দেরী আছে। এভাবে ঘেমে নেয়ে তাড়াতাড়ি আসছে কেন এরা? যারা একঘণ্টা আগে থেকে এসে গাড়ীর অপেক্ষা করছে তাদের জন্য আরও কষ্ট হল।

আপন মনে বলে উঠলেন 'গোবেচারা সব'।

থেকে থেকে ভেসে-আসা নিমগাছের বাতাসটা বেশ ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল যে এই হাওয়া খেয়ে গরমকালটা বেশ ভাল কাটিয়ে দেওয়া যায়। মনের এই অবস্থায় চতুর্দিক জোড়া মাটি, ঘাস, ঘাসের মধ্যিখানের বুনো ফুল আর মেটে রঙের জংলী গাছপালা সব কিছুই যেন একটা মোহ জাগাল। কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ীতে চড়ে চলে

যাব—এ-ই ভাবতেই যেন মোহটা আরও প্রবল হয়ে উঠল।

মানুষ কোথায় কোথায় থাকে? শুধু কি মানুষের রূপেই থাকে! কিছুক্ষণ বাদে লোক তিনটি প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছুল। এরা মাথা ঘুরিয়ে সিগন্যালের দিকে তাকাল আর একধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। একব্যক্তি একবার একটা গরু কিনেছিল। সে গল্প করে বলছিল আর অন্যেরা 'হ্যাঁ—হু' করে সব শুনছিল।

সুব্বারাম আয়ার খুব খেয়াল করে কথাগুলো শুনলেন। ওঁর মনে হল তাদের কথাবার্তা শুধু সত্যই নয়, এতে গভীরতা ও সরলতা আছে। ইচ্ছা হল ওদের ডেকে শুরু থেকে শেষ অবধি ওদের জীবন কাহিনী শোনেন।

আধ মাইল দূর থেকে শাদা ধুতি পরা যাদের দৌড়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল। ওদের ভেতর চারজন বালক আর একজন বৃদ্ধ। কেশে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে এরা স্টেশনে এসে পৌঁছুল। জোর কদমে যিনি আসছিলেন, সেই বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টিকিট দেওয়া হয়ে গেছে?'

দাঁড়িয়ে যারা কথা বলছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, 'না, হয়নি।'

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওই চারজন বালকের দৃষ্টি এসে নিমগাছের নীচে বেঞ্চিতে বসা সুব্বারাম আয়ারের প্রতি পড়ল। ওঁকে দেখে ওঁর প্রতি একটা সশ্রদ্ধ ভাব জাগল ওদের মনে। ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে লাগল। বছরে একবার দেখা পাওয়াও এদের কাছে একটা দুর্লভ ঘটনা। স্কুল-পরিদর্শনে আগত বড় ইনস্পেক্টরের মতই আয়ারবাবুর পায়ে বুট আর গলাবন্ধ কোট ও গায়ে জরিদার অঙ্গবস্ত্র। মাথা ঢাকা টুপিও গরিমা বৃদ্ধি করছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা এই ছেলেদেরকে আয়ারবাবুও দেখছিলেন। ছেলে চারটির বয়স কাছাকাছিই হবে, বারো থেকে পনেরোর মধ্যে। ছেলেদের সঙ্গে কিছু বই আর সাদা কাগজ। জামার পকেটে গোঁজা পেন্সিল। এরা নিশ্চয়ই ছাত্র। দূর থেকে ছেলেরা আর আয়ারবাবু পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কথাবার্তা বলার কারুর তাগিদ নেই। এসময় সিগন্যাল ডাউন হল। স্টেশন মাষ্টার টিকিট নিয়ে সুব্বারাম আয়ারের কাছে গেলেন।

'মনে হচ্ছে এ জায়গাটা তোমার খুব প্রিয়। এখানেই তুমি সর্বদা বসে থাকো।'

সুব্বারাম আয়ার বললেন, 'ভারী সুন্দর হাওয়া।' নিজের টিকিটটা উনি নিয়ে নিলেন।

'তাই যদি হয়, তবে সামনের ছুটিতে এখানে চলে এসো। এরকম তিন দিনের মাথায় ফিরে না গিয়ে, অন্ততঃ দশদিনের জন্য এসে থেকো।'

'হ্যাঁ, তাই করব। দশ দিন বলছ? রাম বনে গিয়েছিলেন চৌদ্দ বছরের জন্য, আর আমি এসে দশটা দিন থাকতে পারব না?'

স্টেশন মাষ্টার বললেন, 'সেই বনবাসকালে রাম নিজের প্রাণ-প্রিয়কে পেয়েছিলেন আর বনবাসের কারণেই রামত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।'

সুব্বারাম আয়ার সকৌতুকে বললেন, 'মনে হচ্ছে স্কুল ছাড়ার পর তুমি গভীর ভাবে পুরাণ ইত্যাদি পড়েছো।' মনে হল যে বন্ধুর কথার মধ্যে একটা সত্য রয়েছে।

বেশীক্ষণ আর তাঁদের এভাবে রসিয়ে রসিয়ে কথাবার্তা বলার অবকাশ ছিল না। গাড়ী আসার সময় হয়ে এসেছে। একটা কাজে স্টেশন মাষ্টার ভিতরে গেলেন। ছেলেদের ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সেই বৃদ্ধ গিয়ে টিকিট কেটে আনলেন। সব যাত্রীরাই টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মের দিকে গেল এবং গাড়ীতে চড়ার জন্য তৈরী হল।

গাড়ী সময় মত এল। যে কামরায় আয়ারবাবু চড়লেন তাতেই গ্রামের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর এক এক করে ছেলে চারটি উঠল। গাড়ীতে অনেক জায়গা। আয়ারবাবু গিয়ে একটা জানালার পাশে বসলেন। ওর সামনের সীটে অনেক জায়গা ছিল। ছেলেরা তাতে বসল। বৃদ্ধ বসলেন সুব্বারাম আয়ারের পাশেই। সুব্বারাম আয়ারের বাঁ পাশে অনেক মালপত্রসহ বিশাল বপু এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর সামনে জানালার পাশে এক মহিলা বসেছিলেন। তাঁর ওজন সেই ভদ্রলোকের ওজনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে। মহিলার কাছে গাঁটরী, বাসন-কোসন ইত্যাদি ছিল।

কুমারপুরম্ স্টেশন ছেড়ে গাড়ীটা চলতে শুরু করলো।

ছেলেরা দুদিকের জানালা দিয়ে দ্রুত ধাবমান সব গাছপালা দেখে খুশী হয়ে উঠছিল। ওদের মুখে চোখে একটা বিস্ময় আর আনন্দের ভাব লক্ষ করে সুব্বারাম আয়ারের মনে হল যে সম্ভবত এই প্রথম এরা রেলগাড়ী চড়ছে। ওদের সঙ্গে ওঁর কথাবার্তা বলার ইচ্ছা হল। উনি যা তাতে অন্য কারুর সঙ্গে কি এভাবে কথা বলা সম্ভব? এই কাজটা ওঁর বেশ কঠিন বলেই মনে হল।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পশ্চিম দিকের জানালায় বসা সেই বিশালকায় ভদ্রলোক ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কেতাদুরুস্তভাবে উনি কথা শুরু করলেন।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর শরীরের তুলনায় আরও ভারী লাগল।

এর উত্তর দেবার ইচ্ছা ছেলেদের ছিল না।

তাদের পরিবর্তে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, 'এরা কোচিলপট্টিতে বড় স্কুলে ভর্তি হতে যাচ্ছে।'

'গ্রামে ওরা ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েছে। ওখানে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করাতে হবে।

'এ ছেলেটি কোন গ্রামের?'

'ইডেশেবলের।'

'ইডেশেবল? কিন্তু সেখানে সপ্তম শ্রেণী নেই?'

'নেই। দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে সরকারের কাছে।'

'পাশের সার্টিফিকেট আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তবুও পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি করাতে হবে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'একারণে বড় মাষ্টার মশাই একমাস নিজের বাড়ীতে রেখে এদের পড়িয়েছেন।'

সেই বিশালবপু ভদ্রলোক একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ তিনটে প্রশ্ন আমি তোমায় করব। তুমি তার জবাব দিতে পারলে তোমায় সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোওয়াট ইজ ইয়োর নেম?'

একটি ছেলে বলল, 'মাই নেম ইজ শ্রীনিবাসন।'

তার পরের প্রশ্ন ছিল, 'হোওয়াট ইজ ইয়োর ফাদার নেম?'

'মাই ফাদার্স নেম ইজ রামাস্বামী নায়ুডু।

তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, 'হোওয়াট ক্লাশ য়ু পাশ?'

ওঁর ভুল ইংরেজী শুনে মনে মনে সুব্বারাম আয়ার হাসলেন।

শ্রীনিবাসনের নিজের উত্তর ছিল 'সিক্সথ ক্লাশ।'

'আচ্ছা, অনেক হল। তুমি ত' বেশ চালাক ছেলে? এভাবে চট-পট জবাব দিয়ে দেবে। তোমায় সপ্তম শ্রেণীতে নিশ্চয়ই নেবে।'

ছেলেটি খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল।

বৃদ্ধ সেই ভদ্রলোকটিকে বললেন, 'আপনি এই ছেলেদেরও প্রশ্ন করুন।'

'আমার ইংরাজীর দৌড় এ-ই পর্যন্ত। আমার মাষ্টারমশায় আমায় এর চেয়ে বেশী পড়াননি' বলে উনি হাসতে লাগলেন। সাথে সাথে ওঁর ভুঁড়িও দুলতে লাগল।

সামনে বসা তাঁর স্ত্রী ও সুব্বারাম আয়ারও হেসে উঠলেন।

গ্রামের সেই বৃদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কোন গ্রাম?'

'তিরুন্নেলবেলী জংশনে পঙ্কজ-বিলাস কফি ক্লাব যেটা রয়েছে সেটা আমারই। আপনি দেখেন নি?'

'তিরুন্নেলবেলী? ব্যস্ একবারই ছোট বয়সে গিয়েছিলাম।'

'ওই হোটেলটা আমারই। ওদের মতো হাজার ছেলে আমার হোটেলে খায় আর পড়ে। আমি পঁচিশ বছর ধরে দেখছি যে কলেজের ছেলেরা জংশনের আমার সেই হোটেল ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না।'

'ভাল হোটেল ছেড়ে অন্যত্র কে যেতে চায়?'

উনি ঘুরে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ, তোমরা যখন কলেজে পড়তে আসবে, তখন আমার হোটেলেই খেতে এসো...'

ছেলেদের খুশীর সীমা ছিল না। শহরের লোক তাদের যেতে বলেছে। এটাই রাজকীয় অভ্যর্থনা বলে মনে হল তাদের কাছে।

'মশায়ের ছেলেপিলে কটি?' গ্রামের সেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।'

'আমার হোটেলে যতজন রয়েছে আর যত খেতে আসবে, সবাই আমার ছেলে।'

বৃদ্ধ তাঁর কথাটা বুঝতে পারলেন না। হোটেলের মালিক ভদ্রলোক সেটা ধরতে পারলেন। কিন্তু সন্দেহ নিরসনের কোনও চেষ্টা তিনি করলেন না। তিনি বললেন, 'আপনি হয়তো জানতে চাইবেন পাতানো ছেলেদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে খাওয়াই কেন। কি করবো। হোটেলের মালিক এত দান-খয়রাত করতে পারে না। কিন্তু সাধ্যানুযায়ী কিছু দিয়ে-থুয়েও থাকি। কত ছেলেকে স্কুলের মাইনে বাবদ টাকা দিয়েছি। কিছু পয়সা ফেরৎ নিয়েছি আর কিছু নিইনি।' শান্ত ভাবে কথাগুলো বলার একটু পরেই তিনি স্ত্রীকে খাবার বের করে দিতে বললেন। হ্যাঁ, নিজের খাবার চাইলেন তিনি।

গ্রাম্যবৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি অনেক দূরে যাবেন?'

'আমি মাদুরাই যাচ্ছি। সেখানে বিয়ে আছে একটা।'

বৃদ্ধ আবার তাঁর সেই গোড়ার প্রশ্নটাই করলেন, 'মশায়ের ছেলেপিলে ক'টি?'

'আমি বললাম না যে সব বাচ্চাই আমার নিজের? আমার ঘরে যে জন্ম নেয়, শুধু সেই কি আমার বাচ্চা? এই চারটি ছেলেও ত' আমার? এখন বলুন, কি বলতে চান?'

বৃদ্ধ কথাটা এবার বুঝতে পারলেন। সেটা জানানোর জন্যই বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনার কোনও বাচ্চা নেই। তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি যেমন বললেন তা-ই। সংসারে সবাই আপনার সন্তান। আমার কথাটাই ধরুন। এদের একজন আমার নাতি। বাকি তিনজন ওর সঙ্গে পড়ে। সবাইকে আমার নিজের ছেলের মতো সঙ্গে করে কোচিলপট্টী নিয়ে যাচ্ছি। ওই যে ওপাশে বসে আছে ছেলেটি, ও এক গরীব পরিবারের সন্তান। ওর বাবা খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছে! সে আর কি করে ছেলেকে পড়াবে? অন্য ছেলেদের সঙ্গে এ-ও পড়ে নেবে। এ সময় খরচ যা হয় আমি দিয়ে দেব। এভাবে বুঝিয়ে-সঙ্গে নিয়ে এসেছি একে। পড়ার এর খুব আগ্রহ। না খেয়েদেয়ে তিনদিন ধরে সে জিদ করে বসেছিল যে আরও পড়বে...' এইভাবে তিনি বলে চললেন।

হোটেল মালিকের স্ত্রী খাবারের চাঙারি খুললেন। এত মিষ্টি তাতে ছিল যে এক বিয়ে কুলিয়ে যায়। না বলা সত্ত্বেও মহিলা বড় একটা কলাপাতা ছিঁড়ে পাঁচ-ছ' টুকরোতে কিছু কিছু মিষ্টি দিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আর সঙ্গের ছেলেদের দিলেন। ছেলেরা নিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

হোটেল মালিক বললেন, 'এই ছেলেরা, পেটকে ফাঁকি দেবে না। খেয়ে নাও।'

বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ নিয়ে নাও।'

ছেলেরা হাত বাড়িয়ে মিষ্টি গ্রহণ করল।

হোটেল মালিক একটা পাতা সুব্বারাম আয়ারের দিকে এগিয়ে দিলেন। উনি

শিষ্টতাপূর্বক উত্তর দিলেন, 'এক্ষুনি কফি খেয়েছি। আমার চাইনা। আপনি খান।' তারপর কোটের পকেট থেকে বইটা বের করলেন।

সবাই বসে খাবার খাচ্ছিল। এর মধ্যে গাড়ি নালাট্রিনপুত্তুরে থেমে আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

সুব্বারাম আয়ার নিজের বইটা খুলে পড়ছিলেন। ছেলেরা গিয়ে হাতধুয়ে এসে আবার নিজেদের জায়গায় বসল। সুব্বারাম আয়ারের হাতে যে বইটা ছিল তার নামটা দেখে একটা ছেলে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে পড়ল, 'আনা ক্যারেনিনা, লিও টোলষ্টয়।' এটা সুব্বারাম আয়ার শুনতে পেলেন।

'টোলষ্টয়! হ্যাঁ, ঠিকই-ত'। না বলে দিলে কেউ টোলষ্টয় না পড়ে টলষ্টয় কি করে পড়বে?' মনে মনে ভাবলেন উনি।

কিছুক্ষণ বাদে ছেলেরা হাতের একটা কাগজ খুলে পড়তে লাগল।

হোটেল মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি হে?'

'আমাদের হেডমাষ্টার মশাই লিখে দিয়েছেন।'

'কি লিখে দিয়েছেন?'

একটি ছেলে বলল, 'গরু' সম্পর্কে একটি ইংরেজী রচনা, শেয়াল আর আঙুর ফলের গল্প, কুকুর আর ছাগলের গল্প আর বন্ধুকে লেখা একটি চিঠি।

বৃদ্ধ বললেন, 'সবই ইংরেজীতে লেখা! আমাদের বড় মাষ্টার মশাই অনেক লেখাপড়া করেছেন। লোকও খুবই ভাল। বাবার মত করে এদের পড়িয়েছেন আর সব লিখে দিয়েছেন এদের।'

হোটেল মালিক বললেন, 'ভাল করে পড়ে নাও সব। এধরণের কিছু লিখতে দিয়েই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে।'

বই পড়ার ভান করে সুব্বারাম আয়ার ওদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছিলেন।

হোটেল মালিক বৃদ্ধকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে পড়াশুনায় এরা পটু।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'এরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে হলেও, পড়াশুনায় ভাল। তার কারণ মাষ্টারটি এদের খুবই ভাল। আমি বলছি আপনাদের যে বাপও বোধহয় নিজের ছেলেদের এত ভালবাসে না।'

হোটেল মালিক বললেন, 'সে ত' ঠিক কথা। গুরুও ত একরকম বাবাই।'

কথাটা শুনে সুব্বারাম আয়ারের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, 'এতে আর সন্দেহ কি? আর এ-ছেলেরা শুধু পড়াশুনা নয়, কাজ-কর্মেও পাকা।'

'কাজ?'

'হ্যাঁ, কাজ ছাড়া চলবে কি করে? স্কুলে যাওয়ার আগে গরু চড়ানো, বিনৌলা পেষা ইত্যাদি ঘরের কাজ সারতে হয়...।'

'সাবাস্! এই ত চাই। স্বাবলম্বীরই এই ত' লক্ষণ। বিনা আয়াসে যে শিক্ষা

মেলে, ওটা কি শিক্ষা? সেরকম লোক দিয়ে দেশের কি কোনও লাভ হয়? সে শিক্ষা আদৌ কি কোনও কাজে লাগে? আমার কথাই ধরুন...আমি মোটে দুক্লাশ পড়েছি। বি.এ., এম. এ. পড়লে সরকারী চাকুরী করতাম। আর এত বছর যে স্কুলের সব ছেলেদের সাহায্য করেছি, সেটা কি চাকুরী করলে পারতাম? দুচার জনের যা কাজে আসে সেটাই শিক্ষা। গ্রামের লোককে অধঃগামী হবার পথ দেখানোটা শিক্ষা নয়। আমার কথা ঠিক কিনা...?'

বৃদ্ধ বললেন, এতে সন্দেহ কি? এধরণের কথা চলছিল। গাড়ী এসে কোচিলপট্টীতে দাঁড়াল। যে বইটা পড়ার ভাণ করছিলেন সেটা বন্ধ করে কোটের পকেটে রাখলেন সুব্বারাম আয়ার। সবাই নামবার জন্য তৈরী হল।

'ভয়-ভাবনা না করে পরীক্ষা দেবে। আমি বয়স্ক মানুষ। আশীর্বাদ করছি তোমরা পাশ করে যাবে। আচ্ছা যাও। যখন তিরুন্নেলবেলীতে পড়তে আসবে, তখন পঙ্কজ-বিলাসকে ভুলবে না। বুঝলে?' এই বলে হোটেল মালিক ওদের বিদায় জানালেন।

সুব্বারাম আয়ার, সেই ছেলেরা আর বৃদ্ধ গাড়ী থেকে নামলেন। আয়ার বাবু চলতে চলতে হোটেল মালিকের দিকে তাকিয়ে হেসে 'নমস্তে' বলে বিদায় নিলেন। ছেলেরা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল। তাঁর সম্বন্ধে ওদের এমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল যে ওঁর আগে হাঁটতে ওদের সঙ্কোচ হচ্ছিল।

স্টেশনের বাইরে এসেই সুব্বারাম আয়ার টাঙ্গার জন্য দাঁড়ালেন। কুলীর কাজ করত এমন একটি লোক পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার রাতের ডিউটি ছিল। বৃদ্ধ আর ছেলেদের দেখে সে 'আসুন, আসুন' বলে এগিয়ে গেল। একথা থেকে সুব্বারাম আয়ার অনুমান করলেন যে এ-ও ইডেশেবল গ্রামের বাসিন্দা।

কুলীটি সেই বৃদ্ধ আর ছেলেদের জলখাবারের জন্য নিয়ে যেতে যেতে রাতটা তার বাসায় কাটিয়ে পরে গ্রামে ফিরতে অনুরোধ জানাল।

সুব্বারাম আয়ার টাঙ্গা পেয়ে গেলেন। বসে পড়লেন টাঙ্গায় আর সেটা রাস্তার মোড় না ঘোরা পর্যন্ত সেই ছেলেদের দেখতে লাগলেন। কুমারপুরম স্টেশন, স্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক, নিমফুলের সুরভিত বাতাস, কালো মাটির সুগন্ধ আর জীবন, হোটেল মালিকের উদারতা, গ্রামের হেডমাষ্টারের ছেলেদের প্রতি পিতৃবৎ আচরণ, ছেলেদের জ্ঞান—টলষ্টয়কে টোলষ্টয় পড়া, গরীব কুলীর জবরদস্তি নিমন্ত্রণ—সব কথা তাঁর মনে পড়ছিল। তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে উঠছিলেন। তাঁর মনে হল যে বিশ মিনিটের রেলযাত্রায় এমন জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন, যা বিশ বছরের পড়াশুনায়ও পেতেন না। প্রশ্ন জাগল মনে—গ্রামের হেডমাষ্টার, হোটেলের মালিক আর এই কুলীর মতো উদার শিক্ষাদাতারা কি এই জগতেরই অধিবাসী? নিজেই বলে উঠলেন, 'এতদিন এঁদের কাছ থেকে কিছু না শিখে থাকলেও, এখন ছেলেরা শিখতে যাচ্ছে।

কুমারপুরম স্টেশনে যাত্রী না আসার চেয়েও এই সব ছেলেদের পড়াশুনার জন্য এখানকার স্কুলে আসা অনেক বেশী আনন্দের। জলছত্রের মতোই এই স্টেশনের উপযোগিতা, তবে...!

টাঙ্গায় এসে বাসায় পৌঁছুলেন সুব্বারাম আয়ার।

কুলীটি সেই বৃদ্ধ আর ছেলেদের তার বাসায় নিয়ে গেল। সকালের জলখাবার সেরে ওরা গ্রাম থেকে রওয়ানা হয়েছিল। তাই এখন আর কিছু খেল না। কুলীটি অনেক বলায় এক কাপ কফি খেল আর দ্বিপ্রহরের ভোজনে রাজী হল। স্কুলের বারান্দায় ওদের দাঁড় করিয়ে, জিজ্ঞাসা করতে করতে কুলীটি প্রধান শিক্ষকের ঘরের কাছে পৌঁছুল। সে তাঁকে বলল যে ইডেশেবল গাঁয়ের চারটি ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণী শেষ করে এখানে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এসেছে। তিনি তাড়াতাড়ি এক শিক্ষককে ডেকে দুতিনটা প্রশ্ন পত্র দিয়ে ছেলেদের যোগ্যতা বিচার করার জন্য পরীক্ষা নিতে বলে দিলেন।

একটি ঘরে ছেলে চারটিকে আলাদা আলাদা বসানো হল। সহকারী শিক্ষক প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো লিখে নিতে বললেন আর সেগুলো পড়তে শুরু করলেন। ওরা লিখে নিল সব। সহকারী শিক্ষক জানিয়ে দিলেন যে একঘণ্টার মধ্যে উত্তর লিখতে হবে। ছেলেরা লিখতে শুরু করে দিল।

কুলীটি আর বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্কুলের বাইরে এসে একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় বসলেন আর গ্রামের নানা কথা আলোচনা করতে লাগলেন।

সাড়ে দশটা নাগাদ ইংরাজী পরীক্ষা হয়ে গেল। এরপর হল অঙ্ক, তামিল আর সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা। বারটা নাগাদ সব পরীক্ষা-পর্ব শেষ হল। স্কুলের ছেলেরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য স্কুল থেকে বাড়ীর দিকে চলল। চকিতদৃষ্টিতে ছেলে চারটি ওদের দেখতে লাগল। শিক্ষক ওদের বসে থাকতে বলে তাড়াতাড়ি উত্তরের খাতাগুলি পরীক্ষা করে নম্বর দিতে লাগলেন। তারপর উনি প্রধান শিক্ষকের কাছে চলে গেলেন। সেসময় কুলীটি ও বৃদ্ধ ছেলেদের কাছে গিয়ে পৌঁছুল।

কুলীটি জিজ্ঞাসা করল, 'খাতা ঠিক লিখেছো?'

'অঙ্কের প্রশ্ন কঠিন ছিল।'

ইংরেজীর প্রশ্ন কেমন ছিল?'

'খুব সোজা।'

একটি ছেলে বলল, গ্রামের হেড মাষ্টার মশাই যেসব প্রশ্ন লিখে দিয়েছিলেন, ওই সবই জিজ্ঞাসা করেছে। আমি এক মিনিটে উত্তর লিখে দিয়েছি।' বাকী ছেলেরাও তাই-ই বলল।

'ইংরেজী খাতা ভাল লিখে থাকলে পাশ করে যাবে', বলেছিল কুলীটি। আর বৃদ্ধ 'আমাদের গাঁয়ের মাষ্টার খুবই খাঁটি আর যোগ্য। কি অদ্ভুত লোক! এখানে কি

জিজ্ঞাসা করবে, তা আগে থেকে জানতেন। তাই-ই এদের বলে দিয়েছিলেন। একে-ই ত' বলে বুদ্ধি!' ইত্যাদি বলে ইডেশেবল গ্রামের হেডমাষ্টারের খুব উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করতে লাগলেন।

'খুব হুঁশিয়ার মাষ্টার।'

'মামুলী হুঁশিয়ার নয়। আমি ত' বলব যেমন গুণের তেমনি স্বভাবের। আমাদের গ্রামে এরকম মাষ্টার আর আসেনি। মনে রেখো, এতখানি স্নেহ কোনও বাপও তার ছেলেকে করে না,' বৃদ্ধ আনন্দের সঙ্গে বললেন।

সবাই সফলতার প্রত্যাশায় জোরে জোরে কথাবার্তা বলছিল।

যে সহকারী শিক্ষক ছেলেদের পরীক্ষা নিয়েছিলেন কিছুক্ষণ বাদে তিনি এসে ছেলেদের, সেই বৃদ্ধ আর কুলীটিকে প্রধান শিক্ষকের কামরায় নিয়ে গেলেন। সেসময় এদের প্রসন্নতা মিলিয়ে গিয়ে বুকের ধড়্ফড়ানি শুরু হল।

'এদিকে আসুন' বলে সহকারী শিক্ষক ওদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সবাই গিয়ে ভেতরে ঢুকল। প্রধান শিক্ষককে দেখে কুলীটি ওঁকে নমস্কার জানাল। নমস্কার করার জন্য বৃদ্ধও হাত ওঠালেন, কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল। ছেলেরা কিছু করল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, বিস্ময়ে চোখের পাতা পড়ল না। হঠাৎ মুখ হাঁ হয়ে গেল। আঙুল মটকাতে শুরু করল এরা।

কুমারপুরম স্টেশন থেকে টলষ্টয়ের বই নিয়ে যে ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে রওয়ানা হয়েছিলেন, তিনিই প্রধানশিক্ষকরূপে তাদের সামনে বসেছিলেন। ছেলেরা কি সেটা আশা করেছিল? 'আসুন' বলে উনি সবাইকে স্বাগত জানালেন।

কুলীটি যখন বলল 'প্রধান শিক্ষককে নমস্কার করুন, ছেলেরা আর বৃদ্ধ তাঁকে নমস্কার জানাল।

'কি, প্রশ্ন খুব কঠিন ছিল?' বলে আবার সুব্বারাম আয়ার হাসলেন। এই হাসিতে যে সৌন্দর্য, যে সম্মোহনী শক্তি আর যে স্নেহ ছিল, সেটা হৃদয়ঙ্গম করে ছেলেদের চোখে জল এসে গেল।

কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর উনি বললেন, 'নিজের নিজের নাম বল।'

'নারায়ণস্বামী,' 'শ্রীনিবাসন,' 'সুর্ব্বেয়া,' 'তিরুপ্পদি।'

সুব্বারাম আয়ার বললেন, 'তোমরা সবাই পাশ করেছো।' আনন্দে ছেলেদের চোখে জল এসে গেল।

'সবাইকে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করছি। ভাল করে লেখাপড়া করতে হবে। বুঝেছো? সব পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হবে। কেবল তোমাদের গ্রামের নয়, এখানকার শিক্ষকেরাও তোমাদের পিতৃতুল্য। বুড়ো দাদু! আমি ঠিক বলছি কি?' মজা করে ভাবাবেগে উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

বৃদ্ধ গ্রামবাসী সুলভ উঁচু গলার বললেন, 'এতে সন্দেহ কি?' আবার তাঁকে নমস্কার জানালেন।

সুব্বারাম আয়ার আবার এক মধুর হাসি হাসলেন।

'আচ্ছা, আসুন আপনারা' বলে ওদের তিনি বিদায় দিলেন। মানশ্চক্ষে ভেসে উঠল কুমারপুরম স্টেশনটার ছবিটা।

মনে মনে বললেন সুব্বারাম আয়ার, 'ওই মস্ত বড় এক পাঠশালা।'

□

ন. পিচ্চমূর্তি

জন্ম ১৯০০ সালে। আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে সাংবাদিকতা শুরু করেন। বিতর্কমূলক গল্প লিখে সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। গল্পে জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ আরোপের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিকলন, অলৌকিক অনুভূতি, সহৃদয় ও শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশে তিনি সিদ্ধহস্ত।

আরাধনা

আমার বন্ধুটি বলল, 'ওই লোকটিকে ভাল করে দেখো।'

'ওকে দেখে আমার কি লাভ?'

'আরে, দেখো ত', পরে সব বলব।'

আমরা এসব কথা বলছি, ইতিমধ্যে লোকটি আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। তার পিঠের দিকটাই কেবল আমি দেখতে পেলাম। শুকনো খড়ির মত শরীর। কোমরে দুগজ একটা কাপড় জড়ানো আর কাঁধে একটি তোয়ালে—এসবই আমার নজরে পড়ল।

আমি বললাম, 'দেখলাম ওকে।'

'কিন্তু তুমি ত' ওর চেহারাটা দেখনি।'

'চলতে চলতে এই দেখায় বাকী আর কি রইল, বল?'

'লাল সবুজ ধরণের কিছু দেখা গেল ত' ব্যস্, আর কোনও কথা না বলে বা শুনে সে উঠে যাবেই,' আমার বন্ধুটি জানাল।

'এখন বলত কি এল গেল তাতে?'

'এ এক বিচিত্র মানুষ।'

'একথার মানে কি?'

'অন্য সকলের মত সে-ও কাজকর্ম করে। তবে একটা কথা আছে। সেটা যে ঠিক কি তা আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারিনি।'

'কি কাজ করে সে?'

'মিস্ত্রির কাজ।'

'ও, আচ্ছা।'

'ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করলেও, কথাবার্তা কিন্তু বলে না।'

'বোবা নাকি?'

'না, মৌন থাকে।'

বোবা নয় কিন্তু মৌনাবলম্বী জেনে আমি চমকে উঠলাম। বোবার কথা বলার

ইচ্ছা হয়। নানাধরণের আওয়াজ করে সে, হাত আর আঙুল নেড়ে বক্তব্য পেশ করে। আর বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির এই মৌন থাকাটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি? এধরণের কাজ করে অথচ কথা বলে না, এ অবস্থায় জীবিকা ঠিক মত নির্বাহ হয় তার বিশ্বাস কি?

'কথা ত' বলে না ঠিকই, কিন্তু মজুরী নেয় কি নেয় না?'

'মজুরী ঠিকই নেয়।'

'তুমি কি জানো ওকে?'

'আমি বার কয়েক দেখেছি। সামান্য পরিচয় আছে।'

'কিন্তু এ ত' কথা বলে না?'

'হ্যাঁ, কথা বলে না, কিন্তু ইশারায় অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়।' যা ইশারায় প্রকাশ করতে অক্ষম, সেটা লিখে জানায়। আগে এক সময় সে জনৈক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ষাট টাকা মাইনেতে মোটর ড্রাইভারের কাজ করত। মোটরে বসে থাকার সময় পট্টীনতার[1], তায়ুমানবর[2] আর আঠারো সিদ্ধাইদের[3] সব লেখা পড়ত। একদিন মালিকের সঙ্গে মোটরে যাচ্ছিল। সামনের এক গলি থেকে বেরুনো এক মোটরের সঙ্গে এর মোটরের জোর ধাক্কা লাগে। মালিক ভীষণ ভাবে আহত হয়। অজ্ঞান হয়ে সে নিজেও গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে যায়। একেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। হাসপাতালে মালিকের মৃত্যু হয়। পরীক্ষাকালে ডাক্তার এর শরীরের ভেতরে বা বাইরে কোনও আঘাত দেখতে পাননি। কিন্তু চোখ সব সময় বোঁজা ছিল। দশদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। এগারো দিনের সকালে রোজকার মত যখন ডাক্তার এর কাছে এলেন, তখন তার মূর্চ্ছা কেটে গেছে আর সে উঠে বসেছে। ডাক্তার যখন খবর জানতে চাইলেন, সে বলল, 'অমৃতের কুম্ভ পূর্ণ হয়েছে।' ডাক্তার এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি অন্য কথা জিজ্ঞাসা করলেন। 'এতদিন যমরাজার সঙ্গে লড়াই চলছিল। আজই সেটা শেষ হল। নাসারন্ধ্র দিয়ে ছ' আঙুল দূর থেকে শ্বাস বেরিয়ে আসছে।' একথা বলে সে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাকের দুই ফুটো দিয়ে কি একই সঙ্গে শ্বাস নির্গত হতে পারে?' ডাক্তার কোনও জবাব দিলেন না। ডাক্তার ওকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

'বাড়ী ফেরার পর কিন্তু এর অবস্থা আর আগের মত রইল না। স্ত্রী আর দুই ছেলে থাকলেও, কারুর সঙ্গেই কোনও কথাবার্তা বলত না। সব কাজই আকারে ইঙ্গিতে করতে শুরু করল। ওর স্ত্রীর এক সময় মনে হল হয়ত বা পাগলই হয়ে গেছে

---

[1] তামিল শৈব-কবি

[2] তামিল সন্ত-কবি

[3] রহস্যবাদী রচার জন্য খ্যাত আঠারো জন তামিল সিদ্ধকবি

লোকটা। কথাবার্তা না বললেও বা বিশেষ একটা চিন্তায় ডুবে থাকলেও, তার ব্যবহারে পাগলামির ভাব কিছু ছিল না। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করত। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলত। আবার স্ত্রীকে দেখে হাসত ও। হাসিটা ঠিক আগের মত ছিল না, আবার ঠিক পাগলেরও নয়। এক সপ্তাহ চুপচাপ ঘরে বসে থাকার পর, আট বা ন' দিনের মাথায় বাজারে গিয়ে ছুতোরের কাজকর্মের সব যন্ত্রপাতি কিনে আনল। এগারো দিনের থেকে ছুতোরের কাজ শুরু করল। সেদিন কাজ করে তিন টাকা রোজগার করে ঘরে ফিরল।' এই বলে আমার বন্ধুটি তার কথা শেষ করল। আমার মনে হল পা চালিয়ে গিয়ে এই লোকটিকে আমার দেখে আসা উচিত ছিল।

'অন্য কোনও দিন ওকে ভাল করে দেখে নিও', একথা বলে আমার বন্ধুটি নিজের কাজে চলে গেল।

সেইথেকে আমারও মনে ইচ্ছা জাগল যে, ওকে ভাল করে দেখে রাখতে হবে।

দিন কয়েক বাদে লোকটি ছুতোরের কাজকর্মের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় আমি ওকে ভাল করেই দেখে নিলাম। কানে ও একটি ধুপ গুঁজে রেখেছিল। বুকে চন্দন লেপা ছিল। আর সেদিনের মতই পরণে ছিল দুগজী ধুতি। কাঁধে একটি তোয়ালে রাখা। চেহারাটা ভাল করে দেখলাম। একটা তন্ময় ভাব ছাড়া আলাদা আর বিশেষ কিছু আমার নজরে পড়ল না। চোখ ওপরে ওঠাতেই সে আমায় দেখল আর আমিও ওকে দেখলাম।

এরপর সেই গলিতে বহুবারই আমি ওকে দেখেছি। ক্রমে ওর সঙ্গে আমারও একটা মৌখিক পরিচয় গড়ে উঠল। এখন আর আমায় দেখলে মুখ ঘুরিয়ে সে চলে যেত না।

একদিন আমার পাশেরই এক বাড়ীতে সে কাজ করতে এল। সে বাড়ীর কর্তা আমার কাছে লোকটির খুব প্রশংসা করলেন। উনি বললেন, 'এ এক বিচিত্র মানুষ। খুব ন্যায্য মজুরী নেয়। এত সুন্দর কাঠের বাক্স আমি আর কাউকে বানাতে দেখিনি। তার এই চুপচাপ থাকাটা অবশ্য বিচিত্র কিছু নয়। লোকটি কাজ শুরু করার আগে কানে গোঁজা ধূপকাঠিটি জ্বালিয়ে নেয়। তারপর একটু বাদে টেনে টেনে শ্বাস নেয়। কাজ করে খুব মনোযোগ সহকারে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে সে আধ সের লঙ্কা নেয় খাবার জন্য। কখনও কখনও গরম জলও চেয়ে নেয়। সব সময় সে আপনাতে আপনি পরিপূর্ণভাবে মগ্ন। এই অবস্থায় কাজ করার সময় ওকে ওই গাছের মত মনে হয়। হয়ত সেটা কাৎ হয়েছে সামান্য, কিন্তু নিপাট সটান খাড়া রয়েছে। সত্যি বড় বিচিত্র এই লোকটি।' লোকটি সম্পর্কে রহস্য আরও বাড়ল। এর সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হল। সে কি শুধু ছুতোর না একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, নাকি দুই-ই, কিছুই বুঝলাম না।

ওকে ডেকে একদিন আমি বললাম যে বাড়ীতে কিছু কাঠের কাজ করবার আছে।

আমার সন্দেহ ছিল যে সে মজুরী কম চাইবে। আমি মনে মনে যা মজুরী দেব বলে স্থির করেছিলাম, তাই-ই সে চাইল। তাতে আমি থ' মেরে গেলাম। ন্যায্য মজুরীই সে চেয়েছিল। ওর এমনই জ্ঞান যেন আমার মনের কথাটা জেনে নিয়েছিল।

সে আমার বাড়ীতে দুদিন কাজ করেছিল। আমার বন্ধুটি যা যা বলেছিল, তার একটি কথাও সে বাড়িয়ে বলেনি। দ্বিতীয় দিনে কাজ শেষ হওয়ার পর মজুরীর সঙ্গে আরও দুটি টাকা আমি দিলাম।

টাকাটা হাতে নিয়ে সে গুণল। নির্ধারিত মজুরীর অতিরিক্ত টাকা সে আমার হাতে রেখে দিল। তারপর ইশারায় কাগজ আর পেনসিল চাইল। তাতে লিখল, 'এ ব্যক্তি বখ্‌শিষ নেয় না।' এতে আমার মনে লোকটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মাল। টাকার জন্যই সে মেহনৎ করে, কিন্তু আবার টাকায় অনাগ্রহ। তার সংযম দেখে আশ্চর্য হলাম।' তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্খা হল। আমি বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে তোমার বাসায় যাব।' সে হেসে উত্তর করল, 'আচ্ছা বেশ।'

তার সঙ্গে আমি চললাম। রাস্তায় কারুর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেনি। সোজা বাজারে গিয়ে ছোট একটা ফুলের দোকানে দাঁড়াল। দোকানদার তাকে দু' আনার ফুল দিয়ে দিল। আমি যে পয়সা দিয়েছিলাম তা থেকে ফুলের দামটা দিয়ে চন্দনের দোকানে এল। আট আনার সুগন্ধী চন্দন আর এক প্যাকেট ধূপবাতি নিয়ে সেখান থেকে সে চলল। ফুল আর চন্দন বিক্রেতাদের দেখে বুঝলাম যে এটা নিত্যকারের ব্যাপার।

সোজা তার বাসায় গেলাম। সাজ-সজ্জা-বিহীন তার ছোট ঘরটি যেন পাখীর বাসার মতো। বাসায় পৌঁছে সে স্ত্রীর হাতে ফুল দিয়ে দিল। এর পরিবর্তে ওর স্ত্রী ওকে একটি চামেলী ফুল দিল। এতে আমার মন গলে গেল। আমার মনে হল, জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে অন্য এক লোকে পৌঁছে গেছি। এর তাৎপর্য আরাধনায়...।

তারপর সে উঠোনের ধারে হাত-পা ধুয়ে নিল। ধূপবাতি, চন্দন আর বাড়তি পয়সা সবই স্ত্রীকে দিয়ে দিল। এসব নেবার সময় ওর স্ত্রীর মুখটা আমার নজরে পড়ল। সে চেহারায় যেন নিতান্ত নর-নারীর সম্পর্কের চেয়ে আলাদা, বন্ধুভাবের একটা স্পষ্ট প্রকাশ।

সে বারান্দায় এল। আমার জন্য একটা আসন বিছিয়ে এবং নিজের জন্য একটা পেতে সে বসল। ওর স্ত্রী আমাদের জন্য গ্লাসে করে লস্যি নিয়ে এল।

'তোমার ছেলেপিলে কটি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আঙুল দিয়ে সে দুটি দেখাল। 'ওদের ত' দেখছি না।' আমার এ-কথা বলতে বলতে ছেলে দুজন ঘরের ভেতর এল। ওদের কানে জংলী ফুল গোঁজা ছিল। আমার সঙ্গে কোনও পরিচয় না থাকলেও, ছেলে দুটি আমায় নমস্তে বলে চলে গেল। এতে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম।

ইশারায় এবং স্লেট ও খড়ির সাহায্যে অনেক বিষয়ে খোঁজ খবর করতে লাগলাম। বলে আমার বলা কঠিন যে সব কিছুই আমি বুঝেছিলাম কি না। কিন্তু ওকে যেন 'ভিন্ন লোক' মনে হল। লিখে সে আমায় জানাল, 'এতে ভিন্নতার কিছু নেই। ফুল নতুন, কিন্তু গাছ পুরানো।

এর সব কথা ঠিকমতো বুঝিনি। এটুকু বুঝেছি মন তৃপ্তি পেয়েছে।

'কাল আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে কিছু কাজ আছে। তুমি আসবে?' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

লিখে সে জবাব দিল, 'এ ব্যক্তি তিন দিন আর কোথাও যাবে না।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

লিখে জানাল, 'তিন প্রহরের আবশ্যকীয় সোনা হাতে আছে।' আমি আর কিছু বলতে পারিনি। 'নমস্তে' বলে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম।

□

অখিলন (অখিলান্তম)

জন্ম ১৯২৩ সালে। অল্প বয়সেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ। উপন্যাস ও কাহিনী লিখেছেন। কিছুকাল চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন। আকাশবাণীর মাদ্রাজ কেন্দ্রে বার্তা সংযোজক। তামিল সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি ও গৌরবে ভূষিত লেখকদের মধ্যে অখিলন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত।

আশ্রয়

মাদ্রাজ প্রান্তের জন্ম-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন তথা প্রচারের যোগ সম্ভবত সবচেয়ে অধিক ছিল। সেখানে সামান্য মাথার যন্ত্রণা, জ্বর আর সর্দি হলেই হুট্ করে সে খবর উড়ে সবার কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু এটা সত্যি যে গলি-বস্তি-মাঠ-কোঠা-ঝুপড়ি বা রাস্তাঘাট ততখানি গুরুত্ব পায়নি। কখনও কখনও এসবের কপালেও প্রচার বা বিজ্ঞাপন জুটে যায়। যদি ঝুপড়িতে আগুন লাগে, জ্বলে ওঠে অথবা সেসবের বাসিন্দারা লুকিয়ে লুকিয়ে বার্ণিশ খেয়ে জ্ঞান হারায়, কাগজওয়ালারা তার প্রচারের জন্য কয়েক পংক্তি লিখে ফেলে।

বর্ষা না হওয়ার দরুণ সেখানে জলের অভাব রয়েছে। এটা দেশশুদ্ধ সবাই জানে। নলে জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। গোয়ালারা দুধে মেশানোর জল না পেয়ে কষ্টে আছে। এরকম নানা খবর দিয়ে খবরের কাগজওয়ালারা সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। যে নগরপাল—নেতৃবৃন্দ জলের সামান্য অভাবও বোধ করেনি, তারা পত্রিকা-মারফৎ বিষয়টা জানতে পারল।

জলাভাবের রাগ-আলাপ শেষ হবে কবে? আর সেকারণেই যেন পত্রিকার নতুন খবর হিসেবে মাদ্রাজে জোর বর্ষা শুরু হল।

সম্ভবত আকাশ লজ্জা অনুভব করছিল—হাওয়া, বৃষ্টি মেঘ-গর্জন আর বিদ্যুৎ—সব কিছু একসঙ্গে দেখে পত্রিকাওয়ালাদের আনন্দের সীমা ছিল না। বিকেলের কাগজে আর পরের দিনের পত্রিকায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যেন বর্ষার খবরে সিক্ত মনে হল।

বর্ষা বিষয়ে এই আনন্দদায়ক খবর শুকনো হয়ে যাওয়ার আগেই নগর নেতাদের জোরালো চিঠি পত্রিকা কার্যালয়ে পৌঁছে গেল। কেউ লিখল বাড়ীতে বিজলী নেই, কেউ জানিয়েছে টেলিফোন খারাপ হয়ে গেছে আবার কেউ বা ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছে যে রাস্তাঘাট এত নষ্ট হয়ে গেছে যে গাড়ী জোরে যেতে পারছে না। এরা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাদের শরীরে ত' বর্ষার একটা ফোঁটাও পড়েনি।

দ্বিতীয় দিনে রাতের বেলায় আকাশ শান্তই ছিল। তবে তৃতীয় দিন দুপুরের পর থেকেই মেঘ ছেয়ে এল। নিরন্তর বর্ষণকারী আকাশ অন্ধকারের একটা বিরাট কড়াইয়ের

মতো দেখাচ্ছিল। থেকে থেকে বিদুৎ-চমকে মনে হচ্ছিল যেন সেটা আগুনে ফেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। আকাশ থেকে যেন একটানা নাকাড়া-ধ্বনি ভেসে আসছিল।

রাত আটটা বেজে গেছে। বিজলী বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা রাস্তায় কিছুটা জায়গা ছেড়ে জলের একটা প্রবাহ দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবত জায়গায় জলটা বেরিয়ে চলে গেছে। যেখানে সেটা সম্ভব হয়নি সেখানে বাড়ীর অনাহূত অতিথির মত একটা গণ্ডীতেই সেটা ঘুরপাক খাচ্ছে।

না বলে আসা আরও অতিথি বর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য রাস্তার এদিক-ওদিক ঘুরছিল। এরা খোলা আকাশের নীচের মানুষ। কখনই যেন বর্ষা না হয়, রাস্তার ধারের মন্দিরে গিয়ে এরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ফিরছিল। রাস্তার ধারের গাছের নীচে, বন্ধ দোকানের সামনে, বাস ষ্ট্যাণ্ডের ছায়ার আশ্রয়ে, পার্কের সিমেণ্টের বেঞ্চিতে, নির্জন ফুটপাথে, দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে নেওয়া সিনেমার পোষ্টার বিছিয়ে শোয়া—এই নর-নারায়ণদের এটাই রীতি।

পুরানো ধরণের চিন্তা যাদের তারাই বাড়ীর সামনের দিকে বারান্দা বানাত। নাগরিক সভ্যতার সত্যিকার তাৎপর্য এই যে প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে দেওয়াল দুর্গের মতো উঁচু হবে। বলা হয় যে উঁচু প্রাকারের এই দুর্গতুল্য গঠন বাস্তু-বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। বর্ষাই হোক, মেঘ গর্জন করুক, প্রতিবেশীর গৃহের ছায়ায় এক মূহূর্তের জন্যও কেউ থাকতে পারবে না। বড় কম্পাউণ্ড বা সীমানা নিয়ে যেসব বাড়ী, সেখানেও হয় বড় বড় কুকুর আর নয়ত গুর্খা পাহারাদার দাঁড়িয়ে।

ময়িলাপুরের দিক থেকে যে পাঁচ ছয় জন লোক আসছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল বৈল্লেস্বামী। এখানে-ওখানে ঘুরে সে সময় কাটাচ্ছিল। প্রতিদিন গাছের তলায় যে উঁচু জায়গাটায় সে শুত, সেটা বর্ষার জলে ডুবে গিয়েছে। রাতে যদি শোবার জায়গা কিছু নাও মেলে, অন্ততঃ বসে কাটাবার মত কোনা-কানাচও ত' অবশ্যই চাই।

বৈল্লেস্বামীর বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। দুমাস হল সে জীবিকার সন্ধানে রামনাথপুরম্ জেলা থেকে শহরে এসেছে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যা যা কাজ করা সম্ভব, তা সবই বিনা আলস্যে করছে। সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কখনও মণ্ডীতে গিয়ে গাছ-ছাল ইত্যাদি বইছে, কখনও ঠেলাওয়ালার সঙ্গে থেকে সাহায্য করছে, কাঠ কাটছে। কখনও যাত্রীদের মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মণ্ণাডি থেকে ওর ময়িলাপুর আসার একটা কারণ ছিল। রিক্সাওয়ালা কুরুপ্পন ওই কুয়ম নদীর ধারের ঝোপড়িগুলোর একটায় থাকত। একদিন বৈল্লেস্বামী কুরুপ্পনের সঙ্গে তার ঝোপড়িতে গিয়েছিল। ওখানে একবার খাওয়া-দাওয়াও করেছিল। বন্ধুত্ব খুব একটা বেশি না হলেই বা কি, ওর কাছে এ অবস্থায় গেলে কি সে মানা করবে না! তবে বৈল্লেস্বামীর পক্ষে ঢাকা বারান্দার আশ্রয়ই যথেষ্ট।

বাসে শহরে আসতে ত্রিশ পয়সা খরচ করতে হয়। পকেটে ছিল মোটে পঁচানব্বই পয়সা। অন্যদিন পরিশ্রম বেশি করতে পারলে কিছু পয়সা মেলে। এখন বর্ষার দরুণ গত দু-তিন দিন কিছুই মেলেনি। কিন্তু পেট, তিনবার কেন সারাদিনে পাঁচ ছয় বার খেতে চায়। তবে দিনে অন্ততঃ একবার খোঁজ নিলে, তারপরই ত' সেটা অন্যবার পর্যন্ত চুপচাপ থাকবে?

রায়পেট্টার রাস্তা ধরে সে ময়িলাপুরের কাছে পৌঁছুল। জায়গা জিজ্ঞাসা করতে করতে সে পূবমুখো ঘুরল। এই দারুণ বর্ষায় সে চার মাইলেরও বেশী পথ চলেছে। তখন রাস্তায় চায়ের দোকান দেখে তার খিদেটা বেড়ে গেল। দোকানটা খুবই ছোট। বসে সেখানে চা খাওয়া চলে না। সে নায়ারের কাছ থেকে দশ পয়সা দামের তিনটে 'বন' রুটি কিনল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেগুলো খেয়ে, দুটো কলা মুখে পুরল। সব মিলিয়ে চল্লিশ পয়সা। ওর শরীরটা ঠাণ্ডায় শিঁটিয়ে এসেছিল, কাঁপছিল ও। চা খেতে তার ইচ্ছা হল। আরও দশটা পয়সা দিয়ে চা নিয়ে নিল। গরম গরম চা নেড়ে নেড়ে আস্তে আস্তে খেল। তার গরমটা শরীরের ভেতরের ছড়িয়ে পড়তেই বেশ ভাল লাগল তার।

ঝোপড়ির দিকটায় পৌঁছুতেই মনটা তার ধক্ করে উঠল। ঝোপড়ি ঠিক আগেকার চেহারায় ছিল না। লোকজনও দেখা যাচ্ছিল না। নোংরা ছড়ানো রাস্তা ধরে গোড়ালী-উঁচু জলটা বয়ে যাচ্ছিল। ভাঙা-চোরা দুতিনটা ঝোপড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। 'বয়ে এলাম কেন এতদূর' মনে তার এ প্রশ্ন জাগল।

রাস্তার আন্দাজে সে কুরুপ্পনের ঝোপড়িটা কোনও ক্রমে খুঁজে বের করল। বারান্দায় টাঙানো পর্দা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দরজার ফুটো দিয়ে জ্বালানো ল্যাম্পের শিখা কাঁপছে। কখনও সেটা জোরে জোরে জ্বলে উঠছে। তাতে ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল।

সে বাইরে দাঁড়িয়ে সবই নজর করে দেখল। ছাদের-চুঁইয়ে-পড়া জল আটকাবার জন্য জায়গায় জায়গায় মাটির মট্‌কা রাখা। মট্‌কা জলের তুলনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ছিল না, কারণ—বাণের তোড়ে ঘরটা প্রায় পুরোই ডোবা মনে হচ্ছে। ঘরের কোণায় দুটো মনুষ্যমূর্তি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল। মেয়েলোক দুটির মধ্যে একজন কুরুপ্পনের মা ও অন্যজন তার মেয়ে। সে জানত যে কুরুপ্পনের বৌ মরে গেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল। দিন দশ পনেরো আগে দিনের বেলায় একদিন সে এসেছিল। তখনও সে এখান থেকে নড়েনি। ঝোপড়ির পেছন দিককার গন্ধনালা কয়ুম নদীর জলে নেমে মোষ আর শূয়োর চড়ে বেড়াচ্ছিল। সেই দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। দিনের বেলাতেও ঝোপড়ির মধ্যে মাছি। এসব জেনেশুনেও বর্ষায় অন্য আর ভাল কোনও জায়গা না পাওয়ায় বৈল্লেস্বামী এখানে আসে।

কুরুপ্পন সে সময় ঘরে ছিল না। আর ঘরে নিজের থাকার মত জায়গাই ছিল না। ছাত চুঁইয়ে জলও পড়ছে। এই ঝোপড়ির চেয়ে ত' বাইরে খোলা জায়গায় থাকা অনেক ভাল। বৈল্লেস্বামী নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন জায়গায় পৌঁছানোর জন্য কেন কষ্ট করে ঠেঙিয়ে চার মাইল বর্ষার রাস্তায় এলাম' মন তার উদাস হয়ে গেল। সে ওখান থেকে চলে আসা স্থির করল।

এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। 'ঠাকুমা, ঠাকুমা, বাবা এসেছে!' বলতে বলতে মেয়েটি দৌড়ে এসে কপাট খুলে দিল। দরজায় দাঁড়ানো লোকের চেহারাটা ভাল করে না দেখে 'এসে গেছো? রাস্তা খুঁজে পেলে' বলতে বলতে আবেগ আর ক্রোধে সে তাকে স্বাগত জানাল।

বৈল্লেস্বামী ঘাবড়ে গেল, 'আমি...আমি...।'

শণ্বকম মেয়েটিও তাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। আগত লোকটিকে চিনতে পারার পর ওর বিস্ময় কিছুটা কাটল। তবে তার চেহারায় নৈরাশ্যের ছাপটা সেরকমই রয়ে গেল। বৈল্লেস্বামী বলল, 'আমি ওকে খুঁজতে এখানে এসেছিলাম' আর তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এখনও সে ঘরে ফিরে আসেনি?'

মেয়েটি কঠোর স্বরে জবাব দিল, 'ওর ঘরে আর দরকার কি? দুদিন একবার এসে উঁকি দিয়েও দেখে যায়নি। জানে যে ঠাকুমার শরীর ভাল নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে মদ টেনে কোথাও হয়ত গড়াগড়ি যাচ্ছে।'

বৈল্লেস্বামীর পক্ষে কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। সে এখনও মদের 'আদি নাগরিক' হয়ে উঠতে পারেনি। 'এই ভয়ানক দুর্যোগে কেউ নিজের মা আর মেয়েকে ভুলে থাকতে পারে? ছিঃ, তবে সে মানুষ কিসের?

সে ভেবেছিল তাড়াতাড়ি চলে আসবে, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ইতস্তত করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এদের এই ছট্‌ফটানির ভেতর ফেলে রেখে, আত্মরক্ষার্থে কোথাও চলে যাওয়া ঠিক মনে হয়নি। এখন সে কি করে? সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে নিজেও একটা আশ্রয় খুঁজতে এখানে এসেছে।

শণ্বকম, তাকে ভেতরে আসতে বলল। সে ভেতরে গেল। যেখানেই পা দিচ্ছে, সব জায়গাতেই জল। কাঠের যে পিঁড়িটায় বুড়ী নিজে বসেছিল একসময়, সেটাতেই সে তাকে বসতে বলল। সে বসল না। ছাদের থেকে টিপ্ টিপ্ করে তার মাথায় জল পড়ছিল। এই লোকটি কে। মেয়েটি তার ঠাকুরমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। পয়সার অভাবের সঙ্গে বয়স আর অসুখ বিসুখ যুক্ত হওয়ায় এই বুড়ী ভাল করে চোখে দেখত না, কানেও শুনত না। তার বসে থাকা আর তাকানোর ধরণ দেখে তাকে অসুস্থ মুর্গীর মত মনে হচ্ছিল।

বৈল্লেস্বামী বলল, 'ঝোপড়ির অন্যান্যদের মতো তোমরাও অন্য কোথাও চলে গেলে না কেন?'

'ঠাকুরমা চলতে ফিরতে পারে না। একে একলা ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।'

'এভাবে ভিতরে বসে জলে ভিজলে শীতে ঠক্ ঠক্ করে তোমরা দুজনেই ত' মরে যাবে।'

'আর যাবই বা কোথায়?' শণ্বকম জিজ্ঞাসা করল।

'আর যাবই বা কোথায়' ওর এই প্রশ্নটা চাবুকের মত এসে ঝাঁকিয়ে দিল তাকে। তামিলনাড়ুর রাজধানী শহরে যেখানে হাজার হাজার বাড়ী, উঁচু উঁচু সব অট্টালিকা আর প্রাসাদ ভবন স্বগর্বে দণ্ডায়মান সেখানে থেকে সে এই প্রশ্ন করল।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি?' ও উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, খেয়ে নিয়েছি।'

নিশ্চয় মিথ্যে কথা, কারণ ঘরের ভেতরকার উনুন জলে ভর্তি হয়ে ছিল। দেশলাইয়ের কাঠিও সব জলে ভেজা। ছাদ থেকে পড়া জল আটকানোর জন্য জায়গায় জায়গায় মটকা রাখা ছিল।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বৈল্লেস্বামী বলল, 'তোমরা আমার সঙ্গে চল। বর্ষা থেকে বাঁচার জন্য কোথাও গিয়ে উঠব।'

শণ্বকম চিন্তায় পড়ে গেল। সে এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতেই চাইছিল তবে সে সঙ্গে তার কথাটাও এড়াতে চেয়েছিল। ঠাকুরমার অবস্থা দেখে তার সঙ্গে একলা থাকতে ভয় করছিল আর এই অল্প বয়স্ক যুবকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেও আশঙ্কা হচ্ছিল, বিশেষত তাকে যখন সে তেমন ভাল করে জানেও না।

'কি ভাবছো? এখান থাকলে দুজনে কাঁপতে কাঁপতেই মরে যাবে!'

সে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠাকুরমা চলতে পারে না।'

'সেটা আমি সামলে নেব।'

সে আস্তে আস্তে তুলে নিল বুড়ীকে। বুড়ীর শরীরটা পুড়ে যাচ্ছিল। যদিও এর সঙ্গে তে শণ্বকমের ভয় করছিল, তবুও এসময় সে এসে পড়ায় তার বিশ্বাস হচ্ছিল যে ভগবানই তাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এর দয়া-মায়া, ভালবাসা ও দৃঢ়তার কারণে ওর মনের ভয়টা কেটে যেতে লাগল। ঝোপড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার মত কিংবা তালাবন্ধ করে রেখে যাবার মত কোনও জিনিসই ছিল না। ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পটা নিভিয়ে আর ওটা আলসেয় রেখে দরজাটা বন্ধ করে ওরা বেরিয়ে এল।

বুড়ীকে নিজের হাত দিয়ে আড়াল করে আস্তে আস্তে বৈল্লেস্বামী এগুতে লাগল। যে পুরোপুরি ভিজে গেছে আর ভিজছেও একটানা, তাকে বর্ষায় আর কতটা কি কাবু করতে পারে?

চা-দোকানের দোকানী নায়ার, তার দোকান বন্ধ করছিল। তাকে ডেকে সে চারটা বন-রুটি বেঁধে দিতে বলল। প্যাকেটটা সে কোমরের কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে

রাখল। তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জামার পকেটে আরও পাঁচটা পয়সা পড়ে ছিল। নায়ারের দোকানের ভেতরের জায়গাটুকু তার নিজের ও তার লোকটার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে থাকার জায়গা কোথাও পাওয়া যেতে পারে কি না।

নায়ার বলল, 'সাণ্ডোম সমুদ্রতীরের শেষ প্রান্তে একটা সরকারী স্কুল রয়েছে। সেখানে চলে যান। লোকেদের জন্য স্কুল বাড়ীটা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

বৈল্লেস্বামী এখানে নতুন এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, সেটা কোথায় ?'

শণ্বকম বলল, 'আমি জানি স্কুলটা। চলুন।'

আধমাইলের ওপর ঠেঙিয়ে যাওয়ার পর ওরা জানতে পারল যে সেখানে আর জায়গা নেই। গিয়ে যারা নিরাশ হয়েছে তারাই বলল যে জায়গা পাওয়ার জন্য সেখানে ধাক্কা ধাক্কি চলছে। বৈল্লেস্বামীর কান্না পেয়ে গেল, রাগও হল খুব। বুড়ী চলতে না পেরে কাৎরাচ্ছে। রাস্তার বাতির আলোয় সে শণ্বকমের চোখে অশ্রুধারা দেখতে পেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে কিছুক্ষণ ওরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন দশটা বেজে গেছে। অনেকগুলো মোটরগাড়ী ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ীর মত নিপ্রাণ-যন্ত্রকেও রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য শেডের ব্যবস্থা, আর যাদের মানুষ বলা হয় তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ?

যেদিক থেকে তারা এসেছিল, সেমুখোই তারা ফিরে চলল। বাঁদিকে কাঠের তক্তা লাগানো একাট লম্বা দেওয়াল দেখা গেল। তার পেছনে বাড়ীঘর নজরে আসছিল না। বৈল্লেস্বামী উঁকি দিয়ে দেখল। সেখানে দেওয়ালের ভিতর দিকে একটা জায়গায় টিনের দুতিনটা ঢাকা জায়গা দেখা গেল। সেই টিনে ছাওয়া জায়গা দেখে বৈল্লেস্বামী উৎসাহিত। আবার উঁকি মেরে সে দেখল। একটা ছাওয়া জায়গায় কজন লোক শুয়ে ছিল। দ্বিতীয়টা গরু আর ছাগল দাঁড়িয়েছিল, তৃতীয়টায় দাঁড়িয়ে ছিল শুধু একটা গাধা।

ভগবান তাদের দয়া করেছেন ভেবে সে আনন্দিত হল। খোলা ময়দানের মধ্যে চারিদিক ঘেরা দেওয়ালের নিশ্চয়ই কোনও প্রবেশ রয়েছে। জানা নেই সেটা খোলা না বন্ধ। দেওয়ালটা টপকালেই হবে। যদি কোনও পাহারাদারও থাকে, সে এই বর্ষায় আর এখনও কি জেগে আছে! ধরেই যদি ফেলে ত' পায়ে পড়ে অনুরোধ করতে হবে।

তার চিন্তার খেইটা ধরতে পেরে শণ্বকম শিউরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। সে জোর করে তাকে আটকাল।

'আমি যাব না, আমার কথা শোনো, আমি যাব না ভেতরে।

'কেন যাবে না ?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল বৈল্লেস্বামী।

'আমার কথাটা শোনো আমি যাব না।'

'দেখ এসময় তোমার ঠাকুরমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর সামলাতে পারছি না। না যাও ত' আমায় সমুদ্রের রাস্তাটা দেখিয়ে দাও। ওখানে গিয়ে সবাই ডুবে মরি।'

শণ্বকম ওকে কিছু আর বলতে চাইল না। বৈল্লেস্বামী বাইরে থেকে এসেছে। এখানকার কথা সে জানে না। ওকে কিছু বলে ভেতরে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে চাইল, কিন্তু ওর রাগ দেখে সে ঘাবড়ে গেল। আর কিছু বললে হয়ত তাকে সেখানে ফেলেই সে চলে যাবে। সেসময় শণ্বকমের ততটা ধৈর্য ছিল না, কারণ সে ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

সে বুড়ীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে শণ্বকমকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। তার হাত যেন লোহার তৈরী। তুলে ধরার ক্ষমতাও অনেকখানি। আপাতত তাই শণ্বকমের ভয়টাও কমে এল। সে বুড়ীকে দেওয়ালের ধারে বসিয়ে তাকে ধরার জন্য বলল। তারপর সে দেওয়ালের উপর চড়ে বসে অন্যদিকে লাফিয়ে পড়ল। আর ওদের দুজনকেও নীচে নামাল।

তারা সেই গাধার ছাওয়া ঘরটাতে যেতেই সেটা বেরিয়ে এল আর স্বজাতি-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অন্য ঘরটার দিকে চলে গেল। বৈল্লেস্বামী বুড়ীকে নীচে মাটিতে শুইয়ে দিল। সেখানে জায়গায় জায়গায় ছাইয়ের গাদা দেখা যাচ্ছিল। সে ফুঁ দিয়ে শান-বাঁধানো জায়গাটার ছাই দূরে সরিয়ে দিল। এর মধ্যে শণ্বকম এক কোণায় গিয়ে ছেঁড়া কাপড় নিংড়ে তা দিয়ে চুলটা ঝাড়ল। নিজের ও ঠাকুরমার চুল মুছে দিয়ে ধুতিটা জায়গায় জায়গায় নিংড়ে নিল। বৈল্লেস্বামীও নিজের জামাটা খুলে নিয়ে তা দিয়ে চুল মুছে নিল।

সেই টিনের ছাউনীর ঘরটা খোলা মাঠের এক কোনায়। সেখানে সিমেন্টের তৈরী চবুতরার এক অংশ বর্ষার জলে ভিজে গিয়েছিল, তবে অন্য অংশ শুকনো ছিল। জায়গাটা তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবে সেসময় সেটা স্বর্গের মতই মনে হচ্ছিল।

বৈল্লেস্বামী কোমরে বাঁধা নেতিয়ে যাওয়া 'বন' রুটির একটা শণ্বকমের দিকে এগিয়ে দিল। বনরুটি বুড়ীকেও একটু দিতে বলল। বুড়ী প্রায় মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকলেও, শণ্বকম রুটির টুকরো মুখে দিয়ে দেওয়ার পর মুখ নাড়তে লাগল। সে একটা আস্ত আর অর্দ্ধেকটা বন রুটি খেল। এর বেশী পারল না।

'কি তুমি খেলে না?' বলে শণ্বকম একটা বন রুটি বৈল্লেস্বামীকে দিল।

'আমি ভরপেট খেয়েছি। আমি আর খেতে পারছি না।' অনায়াসে যে কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তার অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক মিথ্যা। সে সময় চারটা কেন ছ'টা বন রুটিও তার পেটে এঁটে যেত।

শণ্বকমকে খেতে দেখে বৈল্লেস্বামীর সব চিন্তা দূর হয়ে গেল। নিজে খেতে বা আত্মীয়-পরিজনকে খেতে দেখে যে আনন্দ, অনেকটা সেই অনুভূতি নিয়ে সে খাওয়াটা

দেখল। চমকিত বৈল্লেস্বামী দূরের বিজলীর আলোতে উজ্জ্বল বাড়ীঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল।

'তুমি জান কি শহরে এসে আমি কি ভেবেছিলাম?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'কি ভেবেছিলে?'

'আমি চিন্তা করছিলাম যে এই কুবের-পুরীতে বাড়ী-ঘর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এখানে রাস্তায় কাতারে কাতারে গাড়ী। বাজারে-দোকানে এখানে মালপত্র স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ আমি নিজেই চেঁচিয়ে উঠি এমন জায়গায় আমার একটু পেট ভরে খাওয়া আর মাথা গোঁজার একটু ছাদ মিলবে না?'

'তোমার কাছে এটা কুবের-পুরী মনে হচ্ছিল? এখানে একসময়ের খাওয়ার জন্য লোকে পনেরো টাকা খরচ করে। মেয়েরা ব্লাউজের জন্য পঞ্চাশ টাকা গজের কাপড় কেনে। সেই কুবের-পুরী তুমি দেখেছো...?'

বৈল্লেস্বামী বলল, 'আমি পাপ নগরীও দেখেছি।'

'তুমি সেটা ভাল করে দেখনি হয়ত। যদি আমাদের ঝোপড়ি নগরী দেখতে চাও ত' কুয়ম নামক নালার ধার ধরে চলে যাও। নিত্যবর্ধমান ঝোপড়িগুলোতে উঁকি দিয়ে দেখ।'

'আমি ত' ক্লান্ত হয়ে গেছি। সেখানে যেতে আমার যে কষ্ট হয়েছে, একটা কুকুরও সেটা সইতে পারবে না।' একথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

'ধনীর জন্য এটা স্বর্গ। তুমি, আমি যেমন, তাদের জন্য এটা...এটা...এ জায়গা।'

শণ্বকম নিজের কথাটা মাঝপথে চেপে গেল। যে কথাটা তার মুখে এসেছিল, না জানি কেন, স্পষ্ট করে সেটা বলতে পারল না। তার চেষ্টা বৈল্লেস্বামীর কৌতূহলটা বাড়িয়ে দিল।

'বলে ফেল। কেন চেপে যাচ্ছো?'

'বলা ঠিক হবে না।'

'বলে ফেল, নইলে ছাড়ব না। আমার রাগ এসে যাবে, এখনই এসে যাচ্ছে। বলে দাও...।'

যখন মনে হল যে না বললে সে মানবে না, তখন সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমরা এখন যেখানটায় বসে আছি...সে জায়গাটা...সেটা কোন জায়গা...সেটা বলতে চাইছি...।'

'কেন, কোথায় বসে আছি?'

অতিরিক্ত দুঃখের কারণে সে জবাব দিতে পারল না। তবে বার-বার সে প্রশ্নটা আওড়াল।

'এখনও বুঝতে পারলে না?'

'বুঝলে কি জিজ্ঞাসা করতাম?'

'আমরা শ্মশানে বসে আছি...।'

'কি?'

'এখানে মড়া পোড়ায়। আমরা সে জায়গাতেই বসে রয়েছি। যে ছাই সরালে সেটা চিতাভস্ম।

বৈল্লেস্বামী কেঁপে উঠল। এখন সে বুঝল যে কেন ও তাকে এখানে আসতে বাধা দিয়েছিল। তবে সে নিজের মনের ভয় বা বিচলিত ভাবটা প্রকাশ করতে চাইল না। ধৈর্যশীল ব্যক্তির মতো বলল, 'কুবের-নগরীর লোকেরা যেখানে শেষে এসে পৌঁছোয়, আমরা সেখানে এসেছি।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ভয় করছে না?'

টাকাপয়সা সঙ্গে থাকলেই পথ চলতে ভয়? আমার আছেটা কি? ভয় পাবার মত কিছুই নেই আমার সঙ্গে।'

'দেশে হয়ত আছে কেউ...?'

'বাবা-মা, ঘর-দুয়ার, ধন-দৌলত আমার কিছুই নেই। গ্রাম থেকে আমি পালিয়ে চলে এসেছি।'

'কেন পালিয়ে এলে?'

'বৃষ্টির উপর ভরসা করে থেকে ক্ষেত-ফসল কিছুই হল না। করার মতো কাজও আর কিছু ছিল না। লোককে ধোঁকা দিয়ে কিছু করা আমার আসে না। সুদিনের আশায় কোনও প্রকারে শহরে এসে পৌঁছেছি। তবে এখানেও বাঁচতে পারলাম না।'

বৈল্লেস্বামীর এই কণ্ঠস্বর ওর স্বাভাবিক স্বরের চেয়েও করুণ শোনাল। একটু আগেই সে বলছিল যে কোনও কিছুকেই সে ভয় পায় না। তবে এসময় নিজের জীবনের কথায় সে ভয়ে কেঁপে উঠল। চোখের জল তার বাধা মানছে না। সে প্রশ্ন করল, 'এখন কোন মুখে গাঁয়ে ফিরে যাব? কি করব সেখানে গিয়ে?'

'ঘাবড়িও না। তুমি নওজোয়ান। তোমার এভাবে ঘাবড়ালে চলবে না। মনকে চঞ্চল হতে দিও না', বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শণ্বকম তার আরও কাছে সরে এল। আকাশের বিদ্যুৎ চমকের আলোয় বৈল্লেস্বামীর ওর গোল চেহারা অন্য এদিকে ফেরানো ওর চোখের দিকে এক নজর দেখল। রঙ তার কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু চেহারাটা আকর্ষণীয়।

এক যুবতী কন্যা সহজ সরল ঢঙে ওই ভাবে কথাবার্তা বলছে—এ তার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। গাঁয়ের মেয়েরা দূর থেকে ইশারায় কথা সারে আর তার ফলে বিপত্তির উদ্ভব হয়। কেউ তার সঙ্গে এভাবে মন খুলে কথা বলেও নি আর তার কথা শোনেও নি।

শণ্বকম বলল, 'আমিও ত' এ-শহরেই বেঁচে আছি? তোমারও জীবনধারণের জন্য একটা কাজ জুটে যাবে।'

বৈল্লেস্বামী চটে উঠে বলল, এভাবে বেঁচে থাকাটা কি বাঁচা? যে বাপ আমার

জন্ম দিয়েছে, আর যে বাবা তোমার জন্ম দিয়েছে, তাদের গলা টিপে মেরে ফেলা উচিত। যার কাছে পয়সা-কড়ি নেই, সেরকম গরীবের সন্তান জন্ম দিতে চাওয়া ঠিক নয়। বাচ্চার ভরণ-পোষণ না করতে পারলে, তার জন্মদান না করাই উচিত। তোমার বাবা এখন কোথায়?'

এ তার বাবার নিন্দা করবে সেটা তার ভাল লাগল না। আবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল যে একথা বলার তার হক রয়েছে। বাপের প্রতি তার নিজের যে ক্রোধটা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, ওর কথাতেই সেটা ব্যক্ত।

শণ্বকম বলল, 'আচ্ছা, দেরী হল অনেক। তোমার ঘুম এসে থাকলে তুমি শুয়ে পড়। আধারাত ধরে এ জায়গায় বসে যদি তুমি এভাবে নৈরাশ্যজনক কথা বল, তবে আমারও কান্না এসে যাবে।'

বৈল্লেস্বামী বলল, 'তুমি শুয়ে পড়। নির্ভয়ে শুয়ে থাক। ওদের মাঝে বুড়ী কাঠের টুকরার মতো নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল। বৈল্লেস্বামীর মনে হল সেদিন অন্ততঃ সে আর শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না। শরীর শ্রান্তি-ক্লান্তিতে ভেঙে আসছিল। তবে হৃদয়ে একটা মধুর ভাব জেগে উঠেছিল। একটা অজানা মেয়ে তার জন্য কেঁদেছে একথা ভেবেই সে মনে মনে হেসে উঠল।

শণ্বকম শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ-বাদে বৈল্লেস্বামীও তার পা ছড়িয়ে দিল। খুব বেশী সরে শোবারও জায়গাও ছিল না। একটা মানুষ শুইয়ে জ্বালানোর মতো ছোট ছাওয়া ঘর ছিল এটা। বর্ষার জলের ফোঁটার জন্য সে বেশী দূরে সরে শুতে পারল না।

ঠাকুরমার হাতটা চেপে ধরে শণ্বকমকে শুতে দেখে সেও চোখ বুঁজল।

বৃষ্টি এক একবার কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাচ্ছে আবার জোরে শুরু হচ্ছে। ঘরটা ছিল টিনে ছাওয়া। তাই তার ওপর পড়া ফোঁটাগুলো খুব আওয়াজ করছিল। সাণ্ডোমের সমুদ্রতীরও কাছেই। মেঘের গর্জনের সঙ্গে তাল দিয়ে সমুদ্র গর্জন। ভেজা বাতাসে মৃতদেহের গন্ধও এখন প্রকট।

বৈল্লেস্বামীর ঘুম আসছিল না। থেকে থেকে তার মনে ভাবনা জাগছিল যে সে বিচিত্র সংসারের এক বিচিত্র ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেছে। তার রক্ষণাধীনে দুটি মেয়েছেলে নির্ভয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। সেটা দেখে তার পৌরুষ জেগে উঠল। সেসময় নিজেকে তার অত্যন্ত দরিদ্র, বেকার আর নীচ জাতীয় কুলী বলে মনে হল না। সে ভাবল সে একটা যুবা পুরুষ-সিংহ। সে স্বীয় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা নিজের ও শরণাপন্ন আরও দুজনের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে।

তার আত্মবিশ্বাস যে জাগিয়ে তুলেছে, সেই শণ্বকমকে কিছুক্ষণ সে খুঁটিয়ে দেখল। সুস্বাস্থ্য, আকর্ষণীয় চেহারা আর হৃদয় ভরা প্রেম। মনে হল এই কন্যাকে কাঠের গাদার চিতায় নয়, রেশমী গদি তোষকের শয্যায় যেন শায়িত। মুখে তার হাসির ছাপ। আস্তে আস্তে নিজেকে ভুলে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রহর।

হঠাৎ জোরে আওয়াজ হল। মনে হল ওই টিনের ছাতে যেন পাথর বর্ষণ হচ্ছে। কি শিলাবৃষ্টি হচ্ছে? চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত তীক্ষ্ণ আলোর ঝলক দেখা গেল। মনে হল এই জনমানববর্জিত স্থানেও জল উঠছে। তার সঙ্গে বিশ্ব চরাচর প্রকম্পিত করে ভয়ঙ্কর গর্জনও শোনা গেল। শণ্বকম চট্ করে উঠে তার ঠাকুরমাকে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু ঠাকুরমার শরীর তখন ঠাণ্ডা হয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সে জোরে চেঁচিয়ে উঠে বৈল্লেস্বামীর কাছে এল আর সে তার হাত জোর করে ধরে নিল। তার মুঠি খুব শক্ত ছিল। ভয়ে শরীর তার কাঁপছিল। বৈল্লেস্বামীও জেগে গেল।

সে তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। সারা বিশ্বের সমস্ত ভয় এসে তার চোখে জমা হয়েছে।

'আমার ভয় করছে। ভয় করছে আমার।' বলে সে কাঁদতে লাগল। 'আমরা চলে যাই এখান থেকে। এখানে থাকব না, থাকব না এখানে।' সে বিড়্ বিড়্ করে বলছিল।

বৈল্লেস্বামী তাকে আস্তে করে ধরে কোলের উপর শুইয়ে দিল। সে তাতে বাধা দিল না। কাঁপুনি আর ভয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে সে নিজের চওড়া বুকের মধ্যে চেপে ধরে রইল।

'ভয় পাবে না। আমি সঙ্গে রয়েছি, তোমার ভয় নেই।' খুব আদর করে বারবার সে তার কানে কথাগুলো বলতে লাগল। তার ভয়টা আস্তে আস্তে কমে এল। এইভাবে শ্মশান-ভূমিতে, মৃত্যুদেবতার লীলাক্ষেত্রে, শবদাহের পর অবশিষ্ট ছাইয়ের গাদায় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আর আত্মজ্ঞান রহিত হয়ে কিছুক্ষণ এরা পড়ে রইল।

বৃষ্টি পড়ছে। মেঘের গর্জন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। প্রবল বাতাস বইছে, সমুদ্রও গর্জন করছে, তবুও শণ্বকমের ভয় বাতাসে হালকা তুলোর মত উড়ে চলে গেল।

সে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে হাসল। সেই ঘন অন্ধকারেও চার চোখে নবীন আলোর ঝলকানি দেখা গেল। শণ্বকম আস্তে আস্তে হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। হাতের গরমে তার কাঁপুনিও মিলিয়ে গেল।

'এমন জায়গায় এভাবে আমরা দুজনে এক সঙ্গে যদি মরে যাই তবে কেমন মজা হয়?' বিগলিতভাবে সে বলল।

সে নিজের ঠোঁট দিয়ে ওর নরম ঠোঁট চেপে ধরে তাকে আর কথা বলতে দিল না। এর পর এরা আর এই লোকে রইল না। এরা নিজেদের ভুলে গিয়ে, বিদ্যুৎ-গর্জন, বর্ষণ, ঠাণ্ডা বাতাস, শ্মশান, মৃত্যু, অনাহার, নির্দয়তা, লোভ, নীচতা ভুলে এক অদ্ভুত লোকে ওরা বিচরণ করতে লাগল। সেই আনন্দলোকে একে অন্যের জন্য প্রাণ দানেও কুণ্ঠিত নয়।

তাণ্ডব নৃত্যরত, কুবেরপতি আর ক্রোড়পতিদের নিমেষের মধ্যে ছাইয়ের গাদা

বানিয়ে উড়িয়ে দিতে তৎপর শিব তার বিনাশ কর্মের বিরুদ্ধে তন্ময় এই দুই অনাথকে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। আজকের মত কোনও কোনও সময় কামদেহী শিবকেও কামদেবের পুনর্জীবনকল্পে ব্যস্ত হতে হয়।

বিনাশের এই গর্ভগৃহে বিনাশ দূরীকরণের প্রাণশক্তির একটা ফোঁটা ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মুক্তায় পরিণত হল। একটা মুহূর্তে কেউ কাউকে জানত না। এরা নিজেদের জন্মদাতা মাতা পিতার নিন্দা করেছে, কিন্তু প্রত্যুষের এই লগ্নে এরা নিজেরাই যে মা-বাবা হয়ে গেল, সে অদ্ভুত কথাটা এরা জানতে পারেনি।

বৃষ্টি পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ গর্জে চলেছে, সমুদ্রে ঢেউ জেগে উঠে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। বারবার উঠে সামনে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরমা এই মিলিয়ে যাওয়া ঢেউয়ের মত পড়ে ছিল। তার নাতনী নতুন ঢেউ জাগিয়ে তুলছে। বিদ্যুতের সেই আলোয় টিনের সেই ঘর তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

□

কল্কি (রা. কৃষ্ণমূর্তি)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম। অসংখ্য কাহিনী, নিবন্ধ, গান, সমালোচনা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন ও সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিছুকাল 'আনন্দ বিকেতন' সাপ্তাহিকেব প্রধান সম্পাদক ছিলেন। পরে 'কল্কি' নামে নিজের একটি পত্রিকা শুরু করেন। তামিল সাহিত্য জগতে তাঁকে 'সাহিত্য সম্রাট' বলা হয়।

ধনকোটির ইচ্ছা

'হাতছাড়া হয়ে গেল! হায় ভগবান, কেন হাত থেকে বেরিয়ে গেল!'

শব্দগুলো যেন শিবশঙ্করনের কানে শূলের মতো বিঁধল। 'হায় রে! এই কি শেষ বিচার!'

এসময় শিবশঙ্করন পিল্লে হাইকোর্টে তার উকিল বিনায়ক শাস্ত্রীর কামরায় বসেছিল। সেটা ছিল তার আপীল কেসের বিচারের রায় দানের দিন। কোর্টে গিয়ে তার কেসের রায় নিজে সামনে বসে শোনার সাহস তার ছিল না। তাই উকিলের কামরাতেই বসে রইল। তার উকিলের মুহুরী কিট্টু আয়ারকে অনুরোধ জানানো ছিল, কেস শেষ হয়ে গেলে তাকে যেন সব খবর জানিয়ে যায়। দুপুরে সাড়ে তিনটায় কিট্টু আয়ার এসে একটা কেসের কাগজপত্রের পোঁটলা রেখে আরেকটার কাগজ পত্র নিয়ে চলে যায়। সে মুহূর্ত কালের মধ্যেই সেই আপ্ত বাক্যটা জানিয়ে ফিরে গেল।

কানে শব্দগুলো পৌঁছুতেই শিবশঙ্করন পিল্লের মনে হল যেন এই ঘর এখানকার চেয়ার-টেবিল এমনকি এই হাইকোর্টের বাড়ীটা—সবই খুব জোরে ঘুরছে। সে তার মাথাটা শক্ত করে দুহাতে চেপে ধরল। তার মনে হল কেউ যেন একটা লাল গন্‌গনে শলা দিয়ে তার মাথায় 'হাতছাড়া হয়ে গেল! হায় ভগবান, কেস হাত থেকে বেরিয়ে গেল' এই কথাগুলো লিখে দিচ্ছে।

শিবশঙ্করন পিল্লে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। এইভাবে সে হাইকোর্টের সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল। তারপর সে সমুদ্রতীরের দিকে রওয়ানা দিল। সমুদ্রের ধারে রেলের উঁচু বাঁধটায়, যেখানটায় সে প্রায়ই যায়, সেখানটায় গিয়ে সে বসল।

এখন কি করা যায়? সে কোমরে গোঁজা পয়সা হাতে নিয়ে দেখল। সকালে পকেটে চার আনা ছিল। ময়িলাপুর থেকে হাইকোর্টের বাস ভাড়া আর নস্যির পুরিয়ার দাম দেবার পর এখন মোট দেড় আনা পয়সা পড়ে রয়েছে। গ্রামে ফিরে যাওয়ার রেল ভাড়াটাও নেই। মালপত্র হোটেলে কিছু পড়ে রয়েছে। সেগুলো আনতে যদি যায়, তাহলে হোটেল মালিককে দুদিনের খাওয়ার পয়সাটা দিয়ে আসতে হবে।

হ্যাঁ, কেসটা জিততে পারলে কেমন ভাল হত! কে জানত যে বিজয়লক্ষ্মী এত কাছে এসেও ধরা দেবে না। ছিঃ, এ কেমন সরকার, কি ধরণের বিচারালয়। ন্যায় কোথায় এখানে?

দুই বছর আগে শিবশঙ্করন পিল্লে এধরণের রায় শোনার জন্য তৈরী ছিল। সে তার চল্লিশ বেলী[1] জমি বন্ধক রেখে এক লাখ টাকা কর্জ নিয়েছিল। প্রায় দশ বেলী জমি মহাজনের নামে লিখে দিয়ে ঋনের একটা মোটা অংশ সে কাটিয়ে দিয়েছিল। তারপরে সর্ব-সাকুল্যে দশ বেলীর মত অবশিষ্ট ছিল যার উপর আটান্ন হাজার টাকা ধার করেছিল। মহাজন তাকে বার বার বলেছিল, 'আমি দুই বেলী জমি ছেড়ে দিচ্ছি, বাকীটা আমার নামে লিখে দাও।' শিবশঙ্করন পিল্লে সে হিসাবে একরকম তৈরীও হয়ে গিয়েছিল। সেসময় মহাজনের হাত থেকে ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের তরফে একটা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। 'ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেলাম' এরকম চিন্তা করে সে খুব খুশীও হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণদাতাকে ১,৬০০ টাকা দিতে হত। অনেক বছর আগে শিবশঙ্করন পিল্লে দশ হাজার টাকা ধার করেছিল। এ পর্যন্ত সুদ হিসাবে ১৮,৪০০ টাকা সে দিয়ে দিয়েছে।

ঋণ মুক্তির প্রস্তাবটা গৃহীত হয়ে সেটা আইন হিসাবে বলবৎ হল। পিল্লে ১,৮০০ টাকার ১,৮০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ৩,২০০ টাকা দিতে প্রস্তত ছিল। কিন্তু মহাজন সেকথা মানতে রাজী হয়নি। সে কোর্টে কেস করল। তাকে কোর্টে কেস করতে দেখে সে তাকে পাগল মনে করে বিষয়টা হেসে উড়িয়ে দিল। কিন্তু জেলা ন্যায়ধীশ যখন রায় দিল তখন লোকে জানল যে হেসে উড়িয়ে দেওয়াটা বোকামীর পরিচয় হয়েছে।

আই. সি. এস. যারা পাস করে আসে, তাদের মধ্যে কিছু মূর্খও ত আছে। তাদেরই বিচার বিভাগীয় কাজে নিযুক্ত করার একটা রীতিও আছে। তাই না? সেসময় এধরণেরই একজন আই. সি. এস. জেলা ন্যায়াধীশের পদে নিযুক্ত ছিল। সাধারণ লোক যা বলে তার বিরোধিতাতেই সে পটু ছিল। তাই সে রায় দান করল যে মহাজনের হাত থেকে রেহাই পাবার যে আইন হয়েছে, সেটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মাদ্রাজের হাইকোর্ট, এমনকি ভারতের সর্বোচ্য আদালতের এধরণের আইন-স্বীকৃতির ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে গভর্ণর বা ভাইসরায়ের সইয়েরও কোন মূল্য নেই। স্বয়ং মহামান্য সম্রাট যদি এই আইন স্বীকার করে সই করে দেন, তবে তা প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আপাতত প্রতিবাদীকে পুরো টাকা অর্থাৎ ১,৮০০ টাকা আর কোর্টের যাবতীয় খরচ দিয়ে দিতে হবে বাদীকে। শিবশঙ্করন পিল্লের ওপর যেন

[1] জমির মাপ (পৌনে সাত একর জমির সমান)

বজ্রপাত হল। সবাই ওকে বোঝাল যে জেলা ন্যায়াধীশ মূর্খতাবশত এধরণের রায় দিয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলে, ন্যায়ের জয় হবেই। লোকের কথা শুনে শিবশঙ্করন পিল্লে নিজ-সন্তানের গলার অলঙ্কার ইত্যাদি বিক্রী করে সে টাকায় হাইকোর্টে আপীল করল। কিন্তু কে জানত যে হাইকোর্টের রায়ও এমন মারাত্মক হবে?

দুই

সমুদ্রের ধারের রাস্তায় বাতি জ্বলা পর্যন্ত শিবশঙ্করন পিল্লে সমুদ্রতীরে বসে রইল। থেকে থেকে তার মনে কথাটা উঁকি দিল যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই জীবনটার অবসান করে। ছোটবেলায় পড়েছিল যে অ-সময়ে যারা মারা যায় তাদের আত্মা সংসারেই ঘুরে বেড়ায়। সেসব আত্মার কখনও শান্তি মেলে না। কথাটা মনে পড়ল। 'হে ভগবান, আমার কেন মরণ হয় না! সংসারে ত অল্পবয়স্ক কত লোক মরে যাচ্ছে। আমার ত পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়ে গেল। আমার কেন মৃত্যু হচ্ছে না?

শেষবারের মত শিবশঙ্করন পিল্লে মনটাকে শক্ত করল। সে ভেবে স্থির করল যে এ সংসারে তার আর বেঁচে থাকা অর্থহীন। একসময় না একসময় তাকে মরতেই হবে। একথা চিন্তা করে সে সমুদ্রাভিমুখে চলল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হে সমুদ্রাধিপতি, এ সংসারে তুমিই দীন-দুঃখীর শরণ।'

হঠাৎ শিবশঙ্করন পিল্লের নিজের ছেলেপিলের কথা মনে এল। সে ভাবতে লাগল, 'তাদের সঙ্গে কি একবার শেষ দেখা না করেই প্রাণ বিসর্জন দেব?' আরে, আগামী-কাল রাতেই ত' দীপাবলী। বাচ্চারা হয়ত আমার অপেক্ষায় রয়েছে যে বাবা নতুন ধুতি-লহেঙ্গা, পটকা ইত্যাদি নিয়ে আসবে। দীপাবলীর দিনে আমার বদলে আমার মৃত্যু সংবাদটা পৌঁছুলে কি অবস্থা হবে?...হায় বাচ্চারা কেমন ছট্‌ফট্‌ করে উঠবে? একথা সত্যি যে এসময়টায় আমার হাতে কাণাকড়িও নেই। তবু খালি হাতেই হোক দীপাবলীর আগে আমার একবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। বাচ্চাদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার পরই...এ দুনিয়ায় প্রাণ-বিসর্জনের ত অনেক উপায়ই রয়েছে তাই না?

শিবশঙ্করন পিল্লে এলম্বুর স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। স্টেশনে পৌঁছেই ধুতিতে বাঁধা দেড় আনা থেকে এক আনা দিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটল। যখন সে স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করল, তখন একটা গাড়ী ছাড়ছিল। সে তাতে চড়ে বসল। গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। ঝক্ ঝক্ করে গাড়ী চলছিল। সেসময় ছোট বেলায় পড়া সেই ছড়াটার কলি বারবার সে গুন্ গুন্ করছিল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার মতো পয়সাও কখনও বাড়ে কখনও কমে সে ভাবতে লাগল আমি আগে কি

ছিলাম আর এখন আমার কি অবস্থা—দুয়ের মধ্যে কত ফারাক! এক সময় আমার চল্লিশ বেলী জমির মালিকানা ছিল আর আজ হোটেলে খাওয়ার পয়সা দিতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। কোনও সময় সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে বেড়িয়েছি আর আজ বিনা টিকিটে থার্ড ক্লাসে যাচ্ছি। টিকিট চেকার না এসে যায়, সেই ভেবে অনুক্ষণ বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

সেটা ছিল এক্সপ্রেস গাড়ী, তাই ছোট স্টেশনগুলোতে না থেমেই এগিয়ে চলেছিল। যাত্রীদের মধ্যে কেউ শুয়েছিল, কেউ বসে ঝিমুচ্ছিল। তবে শিবশঙ্করন পিল্লের চোখে ঘুম আসছিল না। সে চোখ মেলে বসে রইল।

রাত তখন প্রায় দুটো। একজন টিকিট চেকার পাশের গাড়ী থেকে এসে এটায় উঠল। সে শোয়া লোকদের জাগিয়ে তাদের টিকিট দেখতে লাগল। তারপর এল শিবশঙ্করন পিল্লের কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কাঁদতে কাঁদতে বিড় বিড় করে বলল, 'আমার টাকা পয়সা আর টিকিট সব বাক্সের মধ্যে ছিল। যখন আমি শুয়েছিলাম তখন এসে কেউ বাক্সটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে।'

টিকিট চেকার কয়েকবার তার মাথা থেকে পা অবধি দেখল। সে বুঝবার চেষ্টা করল যে তার ঐ কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যা। গাড়ী একটা স্টেশনে পৌঁছুতে সে শিবশঙ্করন পিল্লেকে গাড়ী থেকে নামতে বলল। তাকে স্টেশন মাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে টিকিট চেকার বলল, 'এর কাছে টিকিট নেই। টিকিট চাইতেই একটা গল্প ফেঁদে ফেলেছে। আপনি একে পরীক্ষা করুন।' তারপর সে চলে গেল। স্টেশন মাষ্টার বলল, 'কেটে পড়ুন এখান থেকে। দাঁড়িয়ে থেকে আর যন্ত্রণা দেবেন না আমায়।' শিবশঙ্করন পিল্লে বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। সে ফিরেও দেখল না সেটা কোন স্টেশন আর সোজা কাছাকাছি গাঁয়ের দিকে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে এ জায়গাটা আগে সে সম্ভবত দেখেছে। কিন্তু নামটা ঠিক আর মনে পড়ছে না।

আগের দিন সকাল দশটায় খেয়েছিল। খিদের জ্বালায় আর ঘুমে শরীর ভেঙে এসেছিল। চলার সময় পা টলতে লাগল। যে রাস্তাটা ধরে সে চলছিল তাতে লোক চলাচল বড় একটা ছিল না হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে সব ঝাঁপসা হয়ে এল। সে বুঝতে পারল যে অজানা একটা জায়গায় রাস্তার ওপর বেহুঁশ হয়ে সে পড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একটা বাড়ীর দরজায় এসে সে বসল। পরের মূহুর্তেই তার চেতনা বিলুপ্ত হল।

তিন

যখন শিবশঙ্করন পিল্লে চোখ মেলল, তখন সামনে এমন এক বিচিত্র দৃশ্য সে দেখল, তাতে আবার বেহুঁশ হবার অবস্থা। সে বেলফুল আর ধূপের গন্ধ অনুভব করতে

পারল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ঘরটা ছোট মতন। দেওয়ালে একটা তাক মতন দেখা যাচ্ছিল—তাতে বেলফুলের মালায় সাজানো একটা ছবি। তার সামনে একটা বড় প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোতে ছবিটা ভাল করে সে দেখল। হঠাৎ ধড় মড় করে সে পালঙ্কের উপর উঠে বসল। ছবিটা আবার নজর করে দেখল। তার মনে হল এ ছবি তারই, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পঁয়ত্রিশ বছর আগে ছবিটা তোলা, তাই কিছুটা রঙচটা হয়ে এসেছে। সে ছবিটায় তার নিজের চেহারা বড় বিচিত্র প্রতিভাত হল। কান ছাড়িয়ে নামা জুলফী, খোপা করা চুলের ওপর টুপী, কানে হীরার ফুল, কপালে বিভূতি-চিহ্ন, তার ওপর কালো একটা বিন্দী। কামিজ কোট ইত্যাদি পরা অবস্থায় তার যুবক চেহারা আর এখনকার বৃদ্ধাবস্থার মধ্যে কত তফাৎ; এখন একথা বিশ্বাস করাই কঠিন যে কোনও সময় তার ওই চেহারা ছিল।

এক এক করে সব পুরানো ঘটনা শিবশঙ্করন পিল্লের স্মরণে আসতে লাগল। মনশ্চক্ষে সব সে দেখতে পেল। তার মনে হল যেন ঘটনাগুলো সব সম্প্রতি ঘটেছে।

সেসময় শিবশঙ্করন তিরুচিনাপল্লীর সেণ্ট জোসেফ কলেজে পড়ত। সে বছর তার এম. এ. পরীক্ষা দেবার কথা। পড়াশুনার জন্য একটা ঘর সে নিয়েছিল। চাকর একটা এসে খাবার তৈরী করে খাইয়ে দিয়ে যেত। সে ছিল বড়লোক জমিদারের ছেলে। খরচের কোনও চিন্তাই তার ছিল না।

সেবছর শ্রাবণ মাসে তার বিয়ে স্থির করা হয়েছিল। বৌও বড় ঘরের মেয়ে। শিবশঙ্করনের বাবা খুব ধূমধাম করে বিয়ের তোড়জোড় করছিলেন। উনি শিবশঙ্করনকে পত্র লিখলেন বিয়ের সপ্তাহকাল আগে গ্রামে চলে আসার জন্য। তাই বিয়ের দিনকয়েক আগেই গাঁয়ে চলে গেল।

ওর গ্রাম রেল স্টেশন থেকে ছ'মাইল দূরে। রাস্তায় চার মাইল পেরিয়ে একটা ছোট নদী পার হতে হয়। সেসব দিনে পোলের কোনও বালাই ছিল না। গাড়ীতে চড়ে শিবশঙ্করন নদীর ধার অবধি গেল। নদীতে বড় বড় স্রোত উঠেছে। ওপারে বাড়ীতে পৌছানোর জন্য নিজেদের গাড়ী মজুত রয়েছে। নৌকাটা তখন উল্টো দিকে অর্ধেক চলে গেছে। সেটার ফিরতে অন্তত পনেরো মিনিট লাগবেই। তাই শিবশঙ্করন নদীর ধারে পিপল গাছটার নীচে গিয়ে বসল।

খিল্ খিল্ হাসি শুনে সে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। পিপল গাছটার ওপাশে একটি মেয়ে আর তার মা ভাত খাচ্ছে। খেতে খেতে সেই মেয়েটা নদীর ধারের কাকগুলোকেও ভাত খাওয়াচ্ছিল। সে ভাতের গোলা ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল আর পাঁচ-ছটা কাক ওটা নেবার জন্য উড়ে উড়ে আসছিল। শেষে সে ভাত হয়ত কোনও একটা কাকের মুখে লেগে যাচ্ছিল। তখন খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠছিল মেয়েটা। কখনও কখনও হয়ত দুটো কাক মিলে গোলাটা ধরে ফেলছিল। সেসময় দুটোর একটা অন্যটাকে ঠোঁট দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল। তাতে খুব মজা পাচ্ছিল মেয়েটা।

এই সবকিছুই শিবশঙ্করন বেশ নজর করে দেখছিল। মাঝে মাঝে সেও হেসে উঠছে। একবার মেয়েটা তাকে হাসতে দেখল। তারপর থেকে প্রতিবারই ভাতের গোলা ছুড়ে দেবার সময় মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল। শিবশঙ্করন খুব মগ্ন হয়ে দেখতে লাগল।

নদীর ধারের কাকগুলোর সাহস বেশি। ওগুলোর সাহস বেড়ে গেছে। শেষে একটা কাক এসে মেয়েটার হাত থেকে ভাতের ডেলা ছিনিয়ে নিল। 'হায়রে' বলে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। সে খেলাচ্ছলেই অথবা ব্যাথায় কাতর হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—সেটা ঠিক বোঝা গেল না। তবে শিবশঙ্করন দৌড়ে গিয়ে সেই কাকটাকে তাড়িয়ে দিল।

মেয়েটা তার মাকে বলল, 'এ-ভদ্রলোক কাগাসুরের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছে।'

মেয়েটার কথা শুনে শিবশঙ্করনের বিস্ময় তথা আনন্দ হল। 'কাগাসুর' সে আবার কে? মনে হচ্ছে মেয়েটা লেখাপড়াও বেশ করেছে। জানে না, কেন ওর সঙ্গে সে কথা বলতে পারল না। ইতিমধ্যে নৌকা এসে গেল। তিনজনেই গিয়ে নৌকায় বসল।

নৌকাটা নদীর স্রোত ঠেলে এগিয়ে চলল। মেয়েটা খুব কৌতূহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে দেখছিল। ফুলের গোছা থেকে এক একটা ফুল ছিঁড়ে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলছিল। জলে-ভেসে যাওয়া সেই ফুলগুলো দেখার জন্য দৌড়ে সে নৌকোর অন্য ভাগে ছুটে যাচ্ছে। একবার যাওয়ার সময় পা পিছলে গেল। শিবশঙ্করন এসব দেখে মজা পাচ্ছিল। সময় মত ধরে ফেলে মেয়েটাকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। তার মা বলল 'এই ধনকোটি! দুষ্টামি করছিস কেন? এখনই পড়ে যেতিস না নদীতে?'

ধনকোটি খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল। সে শিবশঙ্করনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সাঁতার জানেন?' সে হ্যাঁ বলায় ও বলল, 'আমায় তবে ধরতে গেলেন কেন? নদীতে পড়ে যাবার পর কেন বাঁচালেন না?' আবার সে হেসে উঠল। জীবনে এ-ধরনের অনুভূতি তার কখনও হয়নি।

নৌকো গিয়ে অন্য পারে ভিড়ল। শিবশঙ্করন আগে থেকে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে। নেমে সে নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসল। নদীর এপারে সেই মেয়ের পরিচিত তিন চারজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কেউ খুব তাড়াতাড়ি যাবার কোনও চেষ্টা করল না। শিবশঙ্করনের গাড়ী বেগে বেরিয়ে গেল। তার যেন মনে হল ধনকোটি তার গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'এ কে? কোথা থেকে আসছে? যাচ্ছেই বা কোথায়? আর কি দেখা হবে ওর সঙ্গে? আহা! কি সুন্দর দেখতে!' ইত্যাদি চিন্তায় তার মন ভরে উঠল। আরও ভাবতে লাগল, 'মুখে কি শোভা, কি অদ্ভুত এক চঞ্চলতা? তার চোখের

কি মাদকতা? যখন সে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে তখন...হায়! কিছুদিন আগে এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আর এই বিয়ে...ছিঃ ছিঃ আমার মনে এ ধরনের নোংরা চিন্তার উদয় হচ্ছে কেন?' এসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিবশঙ্করন।

ধূমধামের সঙ্গেই তার বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের হৈ চৈ এর মধ্যে শিবশঙ্করন নদীর ধারের সেই ঘটনা ভুলেই গেল। বৌ দেখে সে খুশী হয়েছিল। পরের দিন একটা নাচের আয়োজন করা হয়েছিল। নাচে শিবশঙ্করনের বীতরাগ। নাচের কথা শুনে সে জ্বলে উঠল আর বলল, 'এ কোন পুরানো কালের রীতি?' সকলে মিলে বোঝানোর পর সে নাচের আসরে গিয়ে হাজির হল! এত লোকের সামনে যে অসঙ্কোচে নাচছে সেই নৃত্যপরা মেয়েটিকে দেখার জন্য চোখ তুলে দেখতে গিয়ে সে চমকে উঠে তাকিয়েই রইল। এই ত সেই মেয়ে যার সঙ্গে নদীর পাড়ে দেখা হয়েছিল।

কিছুক্ষণবাদে শিবশঙ্করনের সম্বিত ফিরে এল। সে ভাবল, 'মেয়েটার দিকে যদি এভাবে তাকিয়ে থাকি, তবে লোকে কি মনে করবে?' সে তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। পাশে বসা বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ-নাচিয়ে কোন জায়গার?' বন্ধু বলল, 'তুই এটা জানিস না? এতদিন ধরে তুই তিরুচিনাপল্লীতে রয়েছিস? এ ত' মল্লৈকোট্টৈয়ের নামকরা নাচিয়ে ধনকোটি।'

গোড়ায় কিছুক্ষণ নৃত্য প্রদর্শন করল ধনকোটি। তারপর গানের সঙ্গে পদমের অভিনয় করতে লাগল। তার এই অভিনয়াংশটা শিবশঙ্করনের মনে ধরেনি। সে বুঝে উঠতে পারল না যে কি সব উল্টোপাল্টা করে চলেছে। মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য সে ধনকোটিকে দেখছে আবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। শেষে সে সংস্কৃত শ্লোক-সঙ্গীত-সহযোগে অভিনয় করল। শিবশঙ্করন তন্ময় হয়ে সে অভিনয় দেখতে লাগল। রামায়ণের এই শ্লোকটায় কাগাসুরের কাহিনী বিবৃত ছিল। রাম সীতার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। সেসময় কাগাসুর সীতাকে বিরক্ত করতে শুরু করল। বারবার তাড়িয়ে-দেওয়া সত্ত্বেও সেটা সরছিল না। জেগে উঠে রাম কুশাস্ত্র বানিয়ে ওর দিকে ছুঁড়ল। কুশাস্ত্র অসুরের পিছু ধাওয়া করল। ত্রিভুবন ঘুরে কাগাসুর অবশেষে রামের স্মরণ নিল। ধনকোটি সেই শ্লোকটা গেয়ে তার অভিনয় দেখাল। সে তাঁর আঙুল মুড়ে কাকের একটা চেহারা ফুটিয়ে তুলল। সে যখন কাকের মত চোখ ঘোরাল, আসরে-বসা সব লোক হাসতে শুরু করল। সভায় বসা একটা কাণা উঠে চলে গেল। তারপর নর্তকী সীতার কাক তাড়ানো, বারবার সীতাকে উত্যক্ত করা, শেষে তার রামের শরণযাজ্ঞা আর রামের তাকে ক্ষমা করা ইত্যাদি ঘটনা অভিনয় করে দেখিয়ে—শিবশঙ্করনের দিকে তাকাল। দেখার ধরনটা খুব বিচিত্র ছিল। এতবছর পরেও শিবশঙ্করন তা ভোলেনি।

চার

বিয়ের পর পড়াশুনার জন্য শিবশঙ্করন আবার তিরুচিনাপল্লী গেল। তখন কিন্তু আর পড়াশুনায় তার মন লাগল না। সে সব সময়ই ধনকোটির চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। তিরুচিনাপল্লীতে যখনই কোথাও তার নাচ হত, সে অবশ্যই সেখানে গিয়ে হাজির হত। একদিন নাচ দেখে ফেরার সময় সে ধনকোটির মায়ের সঙ্গে দেখা করল। সে সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের বাড়ীটা কোথায়?' গলির নামটা জানিয়ে সে বলল, 'আপনি আসুন না একদিন আমাদের বাড়ীতে?'

শিবশঙ্করন ধনকোটির বাড়ীতে যেতে আরম্ভ করল। তার বাড়ীতে যাওয়া শুরু করার পর ধনকোটির মনে এক চিন্তা এসে জুড়ে বসল। শিবশঙ্করন তার বাড়ীতে আসে এটা ধনকোটির পছন্দ হত না। নদীতীরে যে চঞ্চলতা তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল, এখন সেটা আর দেখা যায় না। আনন্দের পরিবর্তে তার মুখে এক বিষাদের ছায়া ধনকোটির, চোখের ভাষায় অপার প্রেম ব্যক্ত হলেও, মুখে কিন্তু তাকে সে দুটো কথাও বলত না। তার এই বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করে, মনে মনে শিবশঙ্করন খুব দুঃখবোধ করল।

একদিন ধনকোটি শিবশঙ্করনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি ফটো তুলেছেন কখনও?'

শিবশঙ্করন মিথ্যা বলে দিল, 'হ্যাঁ তুলেছি।' তখন সে বলল, 'তাহলে আমায় একটা ফটো দিন। তাড়াতাড়ি দেবেন।'

দেওয়ালীর আর চারদিন বাকী ছিল। বিয়ের পর সেটাই ছিল প্রথম দীপাবলী। যাবার জন্য শিবশঙ্করনের ডাক এল বাড়ী থেকে। কিন্তু সে স্থির করল যে গ্রামে যাবে না। আগে থেকে সে কথা জানিয়ে দিলে বাড়ী থেকে কেউ না কেউ তাকে নিতে চলে আসবে। সেই ভেবে শিবশঙ্করন দেরী করে একটা চিঠি লিখল যাতে সেটা দীপাবলীর মাত্র একদিন আগে গিয়ে পৌঁছোয়। সে চিঠিতে লিখল, 'আমার পড়াশুনার চাপ রয়েছে, তাই দীপাবলীতে গ্রামে যেতে পারছি না।'

না-যাওয়ার আসল কারণ এ-ই ছিল যে ফটো তুলে নিজের হাতে সেটা ধনকোটিকে দীপাবলীর দিনে দেবে স্থির করেছিল। দীপাবলীর দিনে সকাল-সকাল স্নান সেরে নতুন ধুতি পরে সে ধনকোটির বাড়ী গেল। ধনকোটি তাকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'আরে একি! আপনি দীপাবলীতে বাড়ী গেলেন না?'

সে বলল, 'না। এই দীপাবলীতে তোমায় একটা উপহার দিতে চাই।' ফটোটা নিয়ে ধনকোটি বলল 'আমার খুব আনন্দ হচ্ছে' কিন্তু তার চেহারায়, তার কথায় ব্যক্ত আনন্দের কোনও চিহ্ন তেমন দেখা গেল না।

তার এই আচরণে ভগ্নোৎসাহ হয়ে শিবশঙ্করন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। চেতনাহীনের মত সে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। কিছুদূর যাবার পর, সামনে সে তার

বাবাকে আসতে দেখল? 'হায়, উনি বোধহয় ধনকোটির বাড়ী থেকে আমায় বেরুতে দেখলেন।'

বুকের ভেতরটা তার ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, হঠাৎ কেমন করে এলেন?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বাসায় ফিরে তিনি ঘর খালি করার ব্যবস্থা করলেন। 'কেন, বাবা, এরকম করছেন কেন?' কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'পড়াশুনা অনেক করেছিস। যে পড়ার কারণে তুই দীপাবলীতে বাড়ী যেতে পারছিস না, সেরকম পড়াশুনার আর দরকার নেই।'

দুনিয়ায় একটা কাজই ছিল যেটা শিবশঙ্করন করতে পারত না। সেটা হল বাবার আদেশ অমান্য করা। তাই সে বাবার কথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে এল। কিছুকাল ভেবে ভেবে কাটল। একদিকে ছিল ধনকোটির সঙ্গে আর দেখা না হওয়ার দুঃখ আর অন্য দিকে দুশ্চিন্তা যে বাবা তার পড়াটা বন্ধ করে দিলেন। শেষে সে বাবার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে খোঁজ করতে লাগল। একদিন সিন্ধুক খুলে কিছু গয়না খুঁজছিল। হঠাৎ একটা চিঠিতে হাত পড়ল। সুন্দর গোল-ছাঁদের অক্ষরে তাতে লেখা ছিলঃ

মহাশয়,

আপনি আপনার ছেলের বিয়ের পর ভারতনাট্টমের একটা সুন্দর আয়োজন করেছিলেন। মনে হচ্ছে, কোবলন[1]—মাধবী[2]র গল্পটা আপনার ছেলে সম্পর্কে খুব প্রযোজ্য। এর বেশি কিছু বলার নেই। যদি ছেলেকে আপনি রক্ষা করতে চান, তবে আপনি চেষ্টা করবেন যাতে সে মল্লেকোট্টেয়ে...ঘরে যেতে না পারে।

আপনার

সত্যিকারের হিতৈষী।

শিবশঙ্করন এখন সবই বুঝতে পারল। সে ভাবতে লাগল যে কোন পাপিষ্ঠ এই চিঠিখানা লিখেছে। ধনকোটির ঘরেই যেত এমন কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি অথবা আমার কলেজেরই কোনও বন্ধু হাতের লেখা বদলে নিয়ে কি এ চিঠি লিখেছে? যেই হোক পত্রলেখকের প্রতি শিবশঙ্করন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হল। বছর দুয়েক বাদে ধনকোটির প্রতি প্রেম যখন উবে গেল, তখন তার এই রাগটাও প্রশমিত হল। সে তখন ভাবল যে পত্রলেখক তাকে একটা মস্ত বড় অপরাধের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে তার মহা উপকার করেছে। হায় আমি কত নীচ কাজ করতে যাচ্ছিলাম। আমার আচরণের

[1] তামিল মহাকাব্য শিল্পাদিকারমের নায়ক

[2] শিল্পাদিকারমের উপ-নায়িকা (এক নর্তকী) যার প্রেমে পড়ে কোবলন নিজের স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছিল।

ফলে পরিবারের সুনাম নষ্ট হত! যখন ধনকোটির ঘরে যেতাম, বড় বড় সবাই যারা তাদের ওখানে যেত, ধনকোটির মা ও অন্যান্যরা কতভাবে তাদের নিন্দা করেছিল। তাই না? একদিন ত এরা আমারও হয়ত সেরকমই নিন্দা করত! চিঠিতে কোবলন—মাধবীর কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। তাতে ভুলটা কোথায়? কি আশ্চর্য, সেসময় আমার এই কথাটা মনে হয়নি! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা সে পুরো ভুলেই গিয়েছিল।

পাঁচ

খাটে শোওয়া শিবশঙ্করন পিল্লের সব ঘটনাই মনে পড়ছিল, যেন কালই এসব ঘটেছে। কি আশ্চর্যের কথা? এই ফটো এখানে এল কি করে? কে এই মেয়েলোকটি—পাকাচুল এই বুড়ীই ধনকোটি নয় ত', যে তার মোহজাল বিস্তার করে আমায় ফাঁসাতে যাচ্ছিল? এ ধরনের চিন্তা করা কি আমার উচিত? আর যদি তাই হবে, তবে এ সংসারে এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে কি?

সেই মেয়েলোকটি ঘরের ভেতরে এল। শিবশঙ্করন পিল্লে খুব একটা কঠোরভাব দেখিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'ফটোটা কি কোনও ছেলের? একে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।'—

'বাবুজী, এ আমার স্বামী। অল্প বয়সেই তাকে আমি হারাই'

পিল্লে চমকে উঠে প্রশ্ন করল, 'কি সত্যি কথা বলছো?'

সে বলল, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কথাটা আজ অবধি কাউকে বলিনি। কি জানি কেন, মনে হচ্ছে, আপনাকে সব কথা শোনাই।'

সব কথা শোনার জন্য শিবশঙ্করন পিল্লে আগ্রহ প্রকাশ করল। পাশে পরা দোলনাটায় বসে সে তার কাহিনী শুরু করল।

'বাবুজী, আপনি হয়ত আমার গল্প শুনে আমায় ঘেন্না করতে শুরু করবেন। আমার বেশ্যাকূলে জন্ম...' এ মুখবন্ধ দিয়ে সে তার কাহিনী আরম্ভ করল। গোড়ার প্রায় সব কথাই শিবশঙ্করন পিল্লে আগে থেকেই জানত। এই মেয়েলোকটি অন্য কেউ নয়, স্বয়ং ধনকোটি। নদী কিনারের ঘটনা থেকে দীপাবলীর দিনের উপহার পাওয়া সবই বলে শেষে সে যোগ করল, 'এর পরে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।' এর পর পিল্লে বলল, 'এখনও কি সেই মানুষটির কথা ভাবছ?'

'এ ব্যাপারে তার কোনই দোষ ছিল না' বলে ধনকোটি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলল, 'এরপরে আর বেশি দিন আমি ভারতনাট্টম নৃত্য করিনি। আসরে পৌঁছে সব সময়ই আমি চোখ ঘুরিয়ে তাকে খুঁজতাম। তার চেহারা দেখতে না পেয়ে আমার উৎসাহ মিইয়ে যেত। কয়েকবছর বাদে আমি

পুরোপুরি ভাবেই নাচ ছেড়ে দিলাম। মল্লৈকোট্টৈতে আর থাকতে ইচ্ছা হল না, তাই এ জায়গায় এসে থাকতে শুরু করলাম। আমার মনের শেষ ইচ্ছা, মৃত্যুর আগে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভগবান অবশ্যই আমায় কৃপা করবেন।' ধনকোটির কাহিনী শেষ হল।

শিবশঙ্করন পিল্লৈ সে দিন আর সে রাত সেই ঘরেই কাটাল। নানা ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। একবার ভাবল বলে, 'আমার জানানো উচিত যে আমিই শিবশঙ্করন। সে আমার অনুরক্ত। তাহলে তার ঐশ্বর্য আমি পাব। কোর্ট কেসে হেরেছি ত এমন কি ব্যাপার?' আবার ভাবল ছিঃ কি ঘৃণিত এই জীবন। এভাবে তার ঐশ্বর্য লাভে আমার কি শ্রীবৃদ্ধি হবে? যে যুবক শিবশঙ্করনের স্বপ্নে সে মশগুল তার সঙ্গে এই বৃদ্ধ শিবশঙ্করনের কত তফাৎ। আমি যদি বলে দিই যে আমিই শিবশঙ্করন তবে কি তার প্রেম খান খান হয়ে যাবে না? না, আমার কখনই একথা বলা উচিত হবে না। দ্বিতীয় চিন্তাই জয়ী হল।

টং-টং-টং করে ঘড়িতে তিনটা বাজল। বাড়ীর সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শিবশঙ্করন পিল্লৈ আস্তে আস্তে উঠে আর কোনও রকম শব্দ না করে দরজা খুলে বাইরের গলিতে বেরিয়ে এল। 'আহা! এ কি! শরীর এত হালকা কেন? শরীরে কোন রকম ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছে যেন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ এই ত মৃত্যুর পরের অবস্থা। আমার স্থূল শরীর ধনকোটির ঘরে পালঙ্কে পড়ে রয়েছে। আমি সূক্ষ্ম শরীরে বাইরে এসে গেছি! ওহো! মৃত্যু কি এত সুখদায়ক?

গলিতে পটকার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু তাতে তার ছেলেপিলের কথা মনে পড়ল। 'এ সংসার ছেড়ে যাবার আগে ওদের সঙ্গে অবশ্যই একবার দেখা হওয়া দরকার। এই সূক্ষ্ম শরীর ধারনের ফলে, যেখানে ইচ্ছা যাওয়া ত সম্ভব। তাই না?'

পরের মূহর্তেই শিবশঙ্করন পিল্লৈ তার বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেল। সে দরজা ঠক্ ঠক্ করল কিন্তু ভেতরে কোনও আওয়াজ শোনা গেল না। বাচ্চাদের নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। হ্যাঁ মরে গেলে ত' এটা করাও কঠিন।

'শিবশঙ্করন মুদালিয়ার।' 'শিবশঙ্করন মুদালিয়ার।' শব্দগুলো তার কানে পৌঁছুল। আরে কি ব্যাপার? কিট্টু আয়ার এখানে আবার এল কি করে?

শিবশঙ্করন পিল্লৈকে মুদালিয়ার বলার মত একমাত্র লোক ছিল কিট্টু আয়ারই। প্রথমবার সাক্ষাতের সময় ভুল করে কিট্টু আয়ার তাকে মুদালিয়ার বলেছিল। কিন্তু তারপর সে জেনেশুনে তাকে মুদালিয়ার বলতে শুরু করে।

ইহলোকে উকিলের এই মুহুরী আমায় ত' খুবই কষ্ট দিয়েছিল। সে কষ্ট ত

যথেষ্ট ছিল। তবে আবার কেন এখানেও ধাওয়া করেছে?

'শিবশঙ্করন মুদালিয়ার'। কারুর জোরে জোরে ডাকার আওয়াজ শোনা গেল।

সে বলে উঠল, 'আপনি কোথায়?' সহসা তার চোখ খুলে গেল। সামনে কিট্টু আয়ার হাঁটু মুড়ে বসেছিল।

কিট্টু বলল, 'মুদালিয়ার মশায়, অন্যায় করেছি। তা' এত রেগে গেলেন কেন?'

শিবশঙ্করনের পুরো হুঁস হতে কিছুটা সময় লাগল। সে চেয়ে দেখল যে সমুদ্রের তীরে সে শুয়ে আছে আর চারিদিক আঁধারে ছেয়ে গেছে। তার পাশে আরও দু-তিন জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কিট্টু আয়ার লোটায় কফি ঢেলে তাকে খেতে দিল।

কফিটা খেয়ে একটু চাঙ্গা হল। আর শিবশঙ্করন প্রশ্ন করল, 'আপনি আমায় খুঁজে পেলেন কি করে?'

'কেস শেষ হবার পর আমি আর উকিলবাবু কামরায় এলাম। তখন আপনাকে সেখানে দেখতে পেলাম না। মজা করে যে কথাটা আপনাকে বলেছিলাম সেটা উকিলবাবুকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে উনি গর্জে উঠলেন, 'ওরে দুরাত্মা! তুই একটা চণ্ডাল! কি করলি এটা? সে ত কেস জেতার আশা নিয়েই এসেছিল। তোর কথা শুনে কোথাও গিয়ে হয়ত আত্মহত্যা করবে।' আমি জানতাম যে আপনাকে সমুদ্রতীরেই পাওয়া যাবে। খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পৌঁছে গেলাম। এখানে এসে আমি বুঝলাম যে, উকিলবাবুর কথা কত সত্য। জেলেরা পাড়ে না এনে ফেললে অন্য লোকেই আপনি পৌঁছে যেতেন আর কিট্টু আয়ারের মুশকিল হয়ে যেত।'

পিল্লৈ জিজ্ঞাসা করল, 'কেসের কি হল?'

'কেসের কি হবে? জিতেছেন আপনি। জেলা জজ পাগল হলে ত হাইকোর্টের জজও পাগল নয়।'

ছয়

সে বছর খুব ধূমধাম করে শিবশঙ্করনের বাড়ীতে দীপাবলী উদ্‌যাপিত হল কারণ সে কেস জিতল আর তার দশবেলী জমিও মহাজনের হাতে গেল না।

তবুও শিবশঙ্করনের মনে শান্তি ছিল না। সমুদ্রতীরে জ্ঞান হারানোর পর যে বিচিত্র কল্পনা এসে তার মনে ভর করেছিল, সেটা সে ভুলতে পারেনি। 'সত্যি কি ধনকোটি জীবিত আছে? এখনও কি সে আমার কথা ভাবছে?'

একদিন তার কাছে একটা পার্সেল এল। সেটা খুলে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তিরুচিনাপল্লীতে থাকার সময় যে ফটো তুলিয়ে ধনকোটিকে দিয়েছিল সেটাই ছিল পার্সেলে। সঙ্গে একটা চিঠিও ঃ

'আমি সংসার ছেড়ে যাবার আগে একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। এ-ইচ্ছা আমার কাল সন্ধ্যায় পূর্ণ হয়েছে। অজ্ঞাতে শুয়ে পড়ার পর স্বপ্নে আপনি আমায় দেখা দিয়েছেন।

বৈদ্যজী আমায় বলে দিয়েছেন আর দিন দুয়েক হয়ত জীবিত থাকব। তাই আমার সম্পত্তি আমি দান করে দিচ্ছি। আমার সম্পত্তির অছি নির্বাচিত করেছি আপনাকে। আমার এই অনুরোধটা দয়া করে আপনি মেনে নেবেন। দীপাবলীতে আমায় যে উপহার দিয়েছিলেন সেটা ফেরৎ পাঠালাম। আমায় মনে রাখার জন্য এটা আপনি রেখে দেবেন।

আপনার

ধনকোটি।'

চিঠিটা পেয়ে শিবশঙ্করন পিল্লে কতটা চমকে উঠেছিলেন সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়ের চেয়ে পত্রের হস্তাক্ষরে বেশি চমকে যাবার কথা। কাঁপা হাতে লেখা চিঠি, তবুও, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার শিবশঙ্করন পিল্লের বাবাকে ছেলের আচরণ সম্পর্কে সাবধান করে লেখা সে চিঠির সঙ্গে এ চিঠির হস্তাক্ষরের অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল।

□

না. পার্থসারথি

জন্ম ১৯৩২ সালে। অনেক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তামিল শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। কয়েক বছর 'কল্কি' পত্রিকায়ও কাজ করেন। পরে নিজে 'দীপম্' নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। পার্থসারথি অনেক গল্প উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উনি মানব মন বিশ্লেষণ করেছেন।

সত্যি বলছি

'হঠাৎ কি সময় থেমে পড়েছে? মনে হচ্ছে যেন চারিদিকের জনপ্রাণী খুব ধীর মন্থর গতিতে চলছে। কুলার-লাগানো এই ঘরের শীতলতার মধ্যেও আমার শরীর-মন, দুই-ই যেন কি একটা তাপে জ্বলে যাচ্ছে। ছিঃ! ছিঃ! আজ অবধি কখনও এধরনের জ্বালা আমি অনুভব করিনি। এই বারো বছরে লক্ষ্মী প্রডাকসন্স এজাতীয় আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়নি। মিথ্যা কথা বলা, ধোঁকা দেওয়া এবং আরও নানাভাবে বড় ধরনের সাবধানতা অবলম্বনের পন্থা আমার জানা ছিল। কিন্তু আজ আমার সব সাবধানতাই নিষ্ফল মনে হচ্ছে।'

মনে তিলমাত্রও শান্তি নেই। হয়ে যাওয়া কথাটাই পিছু ধাওয়া করছিল থেকে থেকে। আর কিছুক্ষণ বাদেই টেলিফোনে আর সামনে এসে আমায় ঝাড়বে সবাই। কি কি মিথ্যা কথা বানিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাব আমি? কি বাহানায় তাদের ফেরাব আমি? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের অধিপতি পোন্নুরঙ্গম পায়চারী করছিল। কপালে তার চিন্তার বলীরেখা। নিদ্রা আর শান্তির অভাবে চোখ বসে গিয়েছে। তাতে একটা আর্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। যেন ভাবলেশহীন চেহারা।

এই বারো বছরে তার প্রচুর অর্থাগম হয়নি, ফিল্ম ব্যবসায় স্বচ্ছলতা আসেনি। ওসব কথা যারা বলে তারা নিতান্তই কল্পনাবিলাসী। সময়কালে যথাযথ বুদ্ধি আর সুযোগ বুঝে কাজ করার ক্ষমতার কারণেই ওকে ওরা বড় বলত। নিজের টাকার জোর ওর কোনও দিনই ছিল না। অন্যের জোরই ছিল তার প্রধান সম্বল। সম্ভবত সে-কারণেই ওর নামের সঙ্গে বড়বড় শব্দ সব—সিনেমা পরিচালক, প্রতাপান্বিত প্রযোজক ইত্যাদি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যের ওপর যে সে নির্ভরশীল সেকথা স্পষ্টই ঘোষিত হত। জোরদার সব তামিল শব্দই তার নামের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খেত। যেমন পিরর বলম্—যার মানে, পিরর অর্থাৎ অন্যের আর বলম্ অর্থাৎ বল।

কোনও প্রকারে এদিক ওদিক থেকে পয়সা জোগাড় করে সে ছবি তৈরী করে ফেলত। পরে তা থেকে পয়সা কামিয়ে আগের ধার-দেনা সব শোধ করত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্জও বেড়ে যেত। মহাজ্ঞানী-মহাজনেরা বলেছেন, 'আমার কর্তব্য,

কাজ করে যাওয়া।' পোন্নুরঙ্গম সেকথাটাকে ঘুরিয়ে বলত, 'আমার কর্তব্য ধার করে যাওয়া' আর দৃঢ়তার সঙ্গেই সেকাজ করে যেত। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে এই বারো বছরে, সাফল্যের সঙ্গে ছবি তৈরীর চেয়ে তার মিথ্যা বলার ক্ষমতাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। যতদিন লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি ছিল ততদিন ভাগ্য তাকে সাহায্য করেছে। সেসময় লোকে তার মিথ্যা ছলনাভরা কথাবার্তা সবই বিশ্বাস করত। তাই সহজেই তার কাজ হয়ে যেত। লক্ষ্মীও মুখ ফেরালেন আর লোকেরা ওর সত্যি কথাকেও মিথ্যা বলে ধরে নিতে লাগল। তার সঙ্গে সম্পর্কও রাখল না। বোধহয় একেই বলে নিয়তি।

পায়চারী করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পোন্নুরঙ্গম চেয়ারে গিয়ে বসল। হাত দুটো গালে ঠেকল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। সামনের দেওয়ালে লক্ষ্মীদেবীর একখানা ছবি টাঙ্গানো, লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের প্রতীক। হঠাৎ তার কেন জানি মনে হল ছবিতে দাঁড়ানো লক্ষ্মী তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন। পায়ের কাছের ফুল মাড়িয়ে দেবী কি তার মনটাকেও চূর্ণ করছেন? কি ব্যাপার? নিয়মমাফিক পূজানুষ্ঠানের পর শুরু করা তিনটা ছবি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রীলগুলো ডিব্বায় বন্ধ। যে ডিষ্ট্রিবিউটরস্ আগাম টাকা দিয়েছিল, তারা ওকে খুব চাপ দিচ্ছিল। অভিনেতাদের তরফে কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। ধার দেবার জন্য আর কোনও মহাজনকে পাওয়া যায়নি। যে প্রচার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করেছিল, তারা তাদের বিল পাঠিয়ে দিয়েছে। বাইরে কাউকে কিছু বলতে গেলে সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। নিজের গাড়ীটা সার্ভিসিং-র জন্য পাঠিয়েছে কিন্তু ফেরৎ আনার পয়সা নেই। তাই সে চুপচাপ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরটায় বসে রয়েছে।

মোটর মেরামতের কারখানা থেকে ফোন এল, 'গাড়ী রেডি। সার্ভিস করে দিয়েছি। কোনও লোক পাঠিয়ে দিন। বিল চুকিয়ে গাড়ী নিয়ে যাবে।' 'আজকাল ছবি তৈরীর ব্যাপারে খুব ব্যস্ত আছি—গাড়ীর কথা মনেই ছিল না। কিছু বর্হিদৃশ্য তুলবার কাজে আজ উটকামণ্ড যাচ্ছি। সেখান থেকে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে। একেবারেই আমার সময় নেই। এসময় গাড়ীর এত তাড়া কিসের? ফিরে এসে দেখব'খন' ফোনে এরকম মিথ্যা বলে মোটর কোম্পানীর কাছ থেকে আপাতত রেহাই পেল। 'কিসের ছবি তৈরী? কোথায় প্রাকৃতিক দৃশ্য? এখানে চারটা দেওয়ালই শূন্য দেখাচ্ছে। পয়সা এসে হাতে পড়লে তবেই ত ছবি তৈরী হতে পারে? তাই না?'

আমার মত লোকের পক্ষে মিথ্যাচরণ কত বড় আশীর্বাদ। এত বছর ধরে এ ব্যবসায়ে মিথ্যার বেসাতী করেছি। এই ভেবে ওর মন কিছুটা প্রসন্ন হল। মাথা তুলে পোন্নুরঙ্গম তাকাল। ছবিতে লক্ষ্মী হাসছিলেন।

'ফুল মাড়াতে থাকো, কিন্তু আমার মনটা আর কচলিয়ো না।'

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত এই ঘরের কাঁচের দরজাটা খুলে গেল। মাথা তুলে সে

দেখতে পেল যে চাকরটা উঁকি দিয়ে বলছে, 'বাবুজী, কলাজ্যোতি কন্দপ্পন দেখা করতে এসেছে। খুব রেগে আছে মনে হচ্ছে।'

'আসতে বল এখানে।'

'আমি জানি, সবই। কাল যে একটা চেক দিয়েছিলাম সেটা ব্যাঙ্ক 'ডিসঅনার' করে দিয়েছে সম্ভবত। আর 'রেফার টু-ড্রয়ার' বলে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছে। এখন আর কি মিথ্যা কথা বলে রেহাই পেতে পারি?' মুহূর্তকাল এই ভাবনায় মগ্ন থেকে মুখ তুলতেই রসিকজনের কাছে কলাজ্যোতি উপাধিতে সম্মানিত কন্দপ্পন সক্রোধে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এই অভিনেতার সুন্দর মুখখানা ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল।

'আপনি আপনার প্রডাকসন্সের নাম রেখেছেন 'লক্ষ্মী প্রডাকসন্স।' বাইরে টাঙ্গানো বোর্ডটা নামিয়ে নিন। প্রতিষ্ঠানের নাম 'চণ্ডালী প্রডাকসন্স' রাখুন...। ছবির নায়ক এই অভিনেতাটি খলনায়কের মত রাগে গর্জন করে উঠল।

দুমড়ে মুচড়ে চেকটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পোন্নুরঙ্গমের মুখে এসে সেটা লাগল।

'কন্দপ্পন, খুবই কি রেগে গেছো?...কথাটা ত' শোন।...আমি ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে চেক কাটবো বলেছিলাম তোমায়। ছোকরাগুলো এখানে কুঁড়েমি করে...' পোন্নুরঙ্গম হেসে সামলাবার চেষ্টা করল। ওর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল, 'মিথ্যা, মিথ্যা, বারো বছরের অভিজ্ঞতাপুষ্ট ডাহা মিথ্যা কথা।' কিন্তু বাইরে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে, আগত ব্যক্তির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে গেল।

'এই ছোকরা, কন্দপ্পনজীর জন্য ভাল দেখে একটুখানি আপেল জুস্...।'

'আমার আপেল জুসে দরকার নেই। আপনি আমায় এমন একটা চেক দিন যেটা ব্যাঙ্ক আর ফেরৎ দেবে না।'

'শোন কন্দপ্পন, তামিলনাডুর নাম উজ্জ্বল করার মত প্রতিভাবান শিল্পী তুমি। না জেনে আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ভুল করে ফেলেছে, এতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি...।'

'দুঃখ পেয়ে কি লাভ? শিল্পীকে সম্মান দেখাতে হবে। এ ধরনের...।'

'খুবই খাঁটি কথা। এই কথা আমি গত বারো বছর ধরেই বলে আসছি। শিল্পীর দৃষ্টিতে টাকার দাম নেই...সম্মান দিতে হবে তাকে...।'

'আরে পাপিষ্ঠ! কতখানি ধূর্তামির সঙ্গে কথা ঘোরাচ্ছিস তুই'...তার অন্তরাত্মা তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠল।

ছবির প্রযোজক পোন্নুরঙ্গম আধ ঘণ্টা ধরে না জানে কত কি বলে চলেছিল। টেলিফোন বেজে উঠল। 'হ্যাল্লো, নমস্কার জী, পাবলিসিটি বিলটার কথা জানতে চাইছেন? শুনুন ত একটু—আজ শুক্রবার। কাউকে একটা পাই-পয়সাও দেবার থাকলে শুক্রবার দিতে নেই। সেদিনটায় আমি চেক বইয়ে হাত ছোঁয়াই না। বলা হয়

যে শুক্রবার[1] দিন লক্ষ্মীকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে নেই। কাল ত শনিবার ব্যাঙ্ক অর্দ্ধেক দিন খোলা। আপনাকে সোমবার চেকটা পাঠিয়ে দেব। কিছু মনে করবেন না...তাই ঠিক রইল...হ্যাঁ, সোমবার নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব।'

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মাথাটা তুলল সে। সামনে লক্ষ্মীর ছবিটা দেখা যাচ্ছে। 'ছিঃ ছিঃ, মনে হচ্ছে মূহুর্তকালের জন্যও লোকেরা আমায় সত্যি কথা বলতে দেবে না। সবাই এসে আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। কোথাও পালিয়ে গেলে হয়। গাড়ীটা থাকলে দুচার দিন গিয়ে ব্যাঙ্গালোরে কাটিয়ে আসতাম। সেটাও সার্ভিস করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় গোলমাল। মনে হচ্ছে এ যাত্রায় আর পার পাব না।' ভাবতে ভাবতে সে চিন্তায় ডুবে গেল। হাতের আঙুল চালিয়ে চুলে বিলি কাটতে লাগল। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল। এখন চেহারাটা আগের চেয়েও ক্রুর দেখাচ্ছে।

টেবিলের পিন-কুশন থেকে এক একটা করে আলপিন তুলল, আবার সেগুলো গুঁজে রাখল। আঙুলের নখ খুঁটে কিছু সময় কাটাল। দেওয়ালের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। যতটাই বাজুক, তাতে কি এসে যায়!' শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের ভেতরে কড়া রোদের তাত আর কোথায়?

আবার টেলিফোন বেজে উঠল, 'হ্যালো, কে...আচ্ছা! হরিণী ষ্টুডিও? বিলের কথা জানতে চাইছেন? সোমবার পাঠিয়ে দেব চেক? কি? না ভাই, আজ পাঠাতে পারছি না। ইম্পসিবল! একেবারেই সম্ভব নয়। আজ জরুরী কাজে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি। চেক লেখার কেউ নেই অফিসে। আমার অনুরোধে দুটো দিন...কেবল দুটো দিন অপেক্ষা করুন...সোমবার নিশ্চয় চেক পাঠিয়ে দেব। থ্যাঙ্ক য়্যু।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সে আবার পায়চারী করতে লাগল। রাগে বিড় বিড় করতে করতে বলল, 'যেমন বলে গেল, তেমনই আমায় করতে হবে। এই কি 'লক্ষ্মী প্রডাকসন্স?' এখন ত এটা 'চণ্ডালী ছোটলোক-প্রডাকসন্স' হয়ে গেছে।' মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে যতগুলো মিথ্যা কথা বলেছি, তা সবই মাথায় গিয়ে জমা হয়েছে। তাতেই মাথাটা ভয়ানক ভারী লাগছে, যন্ত্রণা হচ্ছে। এক মূহুর্তের জন্য তার মনে হল কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে চলে যায়। তাকে সব বলে, কেঁদে মনটা হালকা করে। সে সিনেমার এই লাইনে রয়েছে আজ বারো বছর। আজই প্রথম মনের এই দুর্বলতা। এ ধরনের ছটফটানি আগে কখনও হয়নি। কখনও ধৈর্য হারায়নি। যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার শক্তির কখনও কমতি হয়নি। নিজের কাছে টাকা পয়সা না থাকলেও, খালি কথার ওপর লোক বশ করে লাখ লাখ টাকা এনে ছবি তৈরী করেছে। সাফল্য অর্জনেও সক্ষম হয়েছে। আজই প্রথম তার এ

---

[1] দক্ষিণে শুক্রবার লক্ষ্মীবার মানা হয়।

ধরনের উত্তেজনা, ভয় আর অস্বস্তি।

আজই প্রথম লক্ষ্মীর ছবি দেখে কান্না পেল।

'তুমি ফুলই কচলাচ্ছো। আমার মনটা দুর্বল করো না। সহ্য করতে পারব না।'

'বাবু' বলে ডেকে তার চাকরটা ঘরে এসে উঁকি দিল।

'একজন বুড়ো ভদ্রলোক একটি অল্প বয়সী মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

'কেন রে? কে উনি?'

'জানি না, বাবু...।'

পোন্নুরঙ্গম নিজেই কামরা থেকে বেরিয়ে এল। সাজগোজ করা একটি যুবতী দাঁড়িয়ে। পাশে ছেঁড়া জামা গায়ে এক বৃদ্ধ। ওকে দেখে ওদের দুজনেই হাত জোড় করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করল। মেয়েটি খুবই সুন্দর দেখতে। দিব্য লক্ষণযুক্ত। মনে হয় দেওয়ালে টাঙানো ছবির লক্ষ্মীই যেন জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভারী কণ্ঠে পোনুরঙ্গম জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই? কোথেকে এসেছেন?'

'মশায়, একটু দয়া করবেন। আপনার কৃপাদৃষ্টি থাকলে আমার পরিবার রক্ষা পাবে। টাকা কর্জ করে রেলভাড়া দিয়ে মাদুরাই থেকে এতদূর এসেছি কেবল আপনার ভরসায়। আপনার এক বন্ধু আমাদের সুপারিশ করে একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে।'

উপেক্ষার ভাব নিয়ে হাতে চিঠিখানা নিল পোন্নুরঙ্গম। এমন একজন গণ্যমান্য নামী ব্যক্তি এ চিঠি লিখেছেন, যিনি কয়েকবারই তাকে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

পোন্নুরঙ্গমের বন্ধুবর সুপারিশ করে চিঠিতে লিখেছেন, 'পত্রবাহক কন্দস্বামী' সজ্জন ব্যক্তি কিন্তু নিঃসম্বল। পরিবার তার বড়। আটটি মেয়ে। কঠিন সংগ্রাম করে তাকে সংসার চালাতে হয়। তাঁর বড় মেয়েটি ভাল নাচ গান জানে, দেখতেও বেশ সুন্দরী। এখানে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে নাম করেছে। যদি আমার খাতিরে ওকে আপনি সিনেমায় অভিনয় করার একটা সুযোগ করে দেন, জীবিকার একটা সুরাহা করে দেন, তবে আমি খুবই কৃতজ্ঞ থাকব। সে বুঝে উঠতে পারল না যে পত্র পড়ে হাসবে কি কাঁদবে।

আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে দেখল। মুখে তার হাসি। মনে হল যেন ছবির লক্ষ্মী হাসছেন।

সকাল থেকে একটানা মিথ্যা বলায় মনটা বিষণ্ণ ছিল। বেদনা বোধ করছিল। ভাবল মেয়েটির হাসি সে ভার কি দূর করে দিচ্ছে?

মনে মনে হাসল পোন্নুরঙ্গম। 'আমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে চলুন।' বলে সে বৃদ্ধকে নিয়ে নিজের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় ঢুকল। বৃদ্ধের চেহারায় অপার আনন্দ, বিনয়-নম্রতা আর বিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

'বসুন ওদিকে...।'

বৃদ্ধ বসলেন। জীবনে এই প্রথম শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় উনি বসলেন।

'মশায় আপনি শপথ হিসেবেই নিতে পারেন যে আজ এক্ষুনি যে সত্য কথা বলছি তা আপনি সারা জীবন ভুলবেন না।'

ঘাবড়ে গেলেন বৃদ্ধ। কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

'তা, আপনি যা বলছেন, তা নিশ্চয়ই সত্যি।'

'মেয়েকে সিনেমা লাইনে দেবার চিন্তা ছেড়ে দিন। নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে, সে যদি দুচারটা বাড়ীর কাজ করে পয়সা কামায় সেটা অনেক ভাল হবে। কিন্তু এ লাইন ত' মিথ্যেয় ভরা। আমার দশা দেখুন। আজ এই মূহুর্তে আমার হাত একেবারে খালি। মাথায় ঋণের বোঝা। আমি আমায় টাকা ধার দেবার জন্য নতুন লোকের খোঁজ করছি। কিন্তু আমি যদি এই সত্য কথাগুলো স্পষ্ট করে বলি তবে আমার মান সম্মান ত ধূলোয় লুটোবে।' একথা বলতে বলতে পোন্নুরঙ্গমের চোখ জলে ভরে এল। মনে হল এখুনি সে কাঁদতে শুরু করবে।

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 'স্বস্থানে ফিরে যাবার রেলভাড়া কি আছে আপনার কাছে?'

বৃদ্ধ ঠোঁট নেড়ে জানাল যে নেই। পোন্নুরঙ্গম নিজের ব্যাগটা উল্টে দেখল। তার কাছে সাতচল্লিশ টাকা আর আট আনা ছিল। ত্রিশটা টাকা সে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিল।

'দেশে ফিরে গিয়ে সসম্মানে জীবনযাপন করুন আপনি। যা আমি এক্ষুনি বললাম, তা আর কাউকে বলবেন না। যান ফিরে যান। বৃদ্ধ নোটগুলো তুলে তাকে নমস্কার করে উঠে পড়ল। অন্তর থেকে কথাগুলো বলায় পোন্নুরঙ্গমের মনে হল তার যেন হাজার বছরের অশান্তি দূর হয়ে গেছে।

টেলিফোন বাজছে, রিসিভার উঠাল। অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল, 'হ্যালো...কে? পোন্নুরঙ্গম? একজন ভাল ফাইনানসার পাওয়া গেছে। এক লাখ টাকা দেবে। যদি বল ফিল্ম লম্বায় দু হাজার ফিট তাহলে হবে না। যদি তের হাজার ফিটের মত বল, তবে পাবে টাকা। সেকথা বললে অনেক টাকা পেয়ে যাবে। তোমার হাল আমার ভালই জানা আছে। তাই তাড়াতাড়ি ফোন করছি। কি, তাহলে মিথ্যাই বলি, কেমন?' বন্ধুর কথা শুনে সে সহাস্যবদন হয়ে উঠল।

পোন্নুরঙ্গম বন্ধুকে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলবে। কম কেন বেশি করেই মিথ্যা বলবে। আসব নাকি?'

'বেশ...। চলে এসো...একটায় উডল্যাণ্ড হোটেলে আসবে...সেখানেই কথাবার্তা বলে নেব।'

পোন্নুরঙ্গম বলল, 'সে ত' ঠিক আছে, তবে আমি বুঝতে পারছি না কিসে যাব।

আমার গাড়ীখানা এক বন্ধুকে দুদিনের জন্য দিয়েছি। তুমি প্লিমাউথখানা পাঠিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ দেব। তবে এর জন্য মিথ্যা কথা বলছো কেন? তুমি তোমার গাড়ী সার্ভিসিং এর জন্য পাঠিয়েছো না? বাজে কথা কেন বলছো যে বন্ধুকে দিয়েছো...? বিল চুকিয়ে দেবার পয়সা হয়ত নেই...। এর জন্য কিছু এসে যাবে না। আমার গাড়ীখানা পাঠিয়ে দেব...চলে এসো।'

'আমি মিথ্যা বললাম, কিন্তু তুমি ত' সত্যি কথাটা জেনে গেছো। এতকাল যে মিথ্যা বলে এসেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিছুক্ষণ আগে মূহুর্তকালের জন্য খাঁটি সত্য কথা বলেছি। সেটা কি তুমি জানো...?'

'আচ্ছা গাড়ী তাহলে পাঠিয়ে দেব। আমি তোমায় ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছি।'

পোন্নুরঙ্গম রিসিভার নামিয়ে রাখল। সামনে ছবির লক্ষ্মী হাসছেন। একটুখানি সত্য কথা বলার সুযোগ কাজে লাগানো হয়েছে, তাই কি তিনি হাসছেন?

□

সোমু (মি. পা. সোমসুন্দরম)

১৯২১ সালে জন্ম। তামিলের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাও তাঁর আয়ত্তে। কবিতা, গল্প, নিবন্ধ নানা শাখায় তাঁর কৃতিত্ব। কয়েক বছর 'কল্কি' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ইংলণ্ডে গিয়ে উনি প্রসারণ কলায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ঝর্ণা তলায়

এ বছর বর্ষামুখর দিনে এই দুর্লভ আর মধুর পত্র পেলাম। এটা পাবার কোনও আশাই ছিল না।

প্রতি বছরই নিজের জন্মস্থানের আকর্ষণ আর নয়নাভিরাম পোদিকৈ পর্বতের জলপ্রপাত আমাকে তিরুক্কুট্রালমে যেতে বাধ্য করে। প্রতিবারই যাবার সময় আমি আমার বন্ধু ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী ও তাঁর পরিবারের সবাইকে আমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। প্রতি বছরই আমাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখাত হত।

'দুমাস না হোক, অন্ততঃ দুটো সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটান; হয়ত একটু জোর দিয়ে বলতাম কথাটা।

ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেন, 'ওরে বাপরে দুই সপ্তাহ, দুদিনের জন্যও আমার মাদ্রাজ ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই।'

মুত্তুকুমারস্বামীর পক্ষে এ ধরনের জবাব খুবই যুক্তিসঙ্গত। এত বড় মাদ্রাজ শহরে এরকম বহু ডাক্তার আছেন যাঁরা লণ্ডন আর এডিনবরা ঘুরে এসে ইংরাজী ছাব্বিশটা বর্ণমালার সবই নিজেদের নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলেন। তবুও ষাট বছর বয়স্ক ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামীর কাছে রুগীরা এসে ভিড় করে। বড় বড় অপারেশনের ব্যাপারে লোকেরা ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামীর কাছে আসে। সরকারী হাসপাতালের বড় বড় অনেকেই ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামীর কাছে শল্য-চিকিৎসার নানা যন্ত্রপাতি চায়।

ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়ারও সময় পান না ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী। ওঁর স্ত্রীকে ওঁর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি আক্ষেপ করে বলেন 'ওঁর ত আসন পেতে বসারও সময় নেই।' প্রকৃতপক্ষে ওঁর স্ত্রী একটা থালায় ভাতের সঙ্গে সাম্বর[1] আর অবিয়ল মিলিয়ে তাঁকে দেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু সেটা খেয়ে নেন। তাঁর

[1] গৃহে প্রস্তুত দক্ষিণ ভারতীয় শব্জী জাতীয় আহার্য

তাড়া, কোনও বড় অপারেশনের জন্য শীগ্‌গিরই পৌঁছুতে হবে। আমি বহুবার এরকম দেখেছি। আমার স্ত্রী আমাকে কয়েকবারই বুঝিয়েছেন যে রুগীদের কাছ থেকে ওঁকে জোর করে কুট্রালমে নিয়ে গেলে, আমাদের ওপর তাদের অভিশাপ বর্তাবে।

এহেন চিকিৎসক মুত্তুকুমারস্বামীর কাছ থেকে সেই দুর্লভ পত্র এল। মনটা আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে উঠল। সপরিবার এসে কুট্রালমে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকবেন তাই আনন্দ। বিস্ময়ের কথা এই যে ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী বর্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত দুমাস আমাদের সঙ্গে কাটাবেন।

দুই

তিরুকুট্রালমে যেখানে থাকতাম, সেটা আমার এক সম্বন্ধীর বাড়ি। গরমের সময়টা উনি সেখানে থাকেন। মন্দিরের কাছে একটা পাহাড়ের ঢাল। দু'টি পাহাড় যেখানে এসে মিলেছে সেখানে পাঁচটি ঝর্ণার খুব কাছাকাছি এই বাড়িটা। গাছ ও লতায়-ছাওয়া এক মোড়ের ওপর পাহাড়ী রাস্তাটার গায়ে বাড়িটা। ছোট ঝর্ণার জলধারা বাড়ির সীমানায় ঢুকে সেটার চারদিকে ঘুরে, পিছনদিকে পাহাড়ের ঢাল পথে ছোট নদীতে মিশেছে। এই ভাবেই মালিক বাড়িটাকে বানিয়েছেন।

মস্ত বড় বাড়িটা। তার চারিপাশে আম, নারকেল, কাঁঠালের গাছ আর লতা-গুল্মে ছাওয়া ঘন কুঞ্জ। বাড়িটার দক্ষিণ দিকের একটা ঘর এগিয়ে এসে যেন সোহাগ করছে সেই ঝিরঝিরে জল-ধারাটাকে। সেই ঘর আর সঙ্গের অংশটাই আমি ডাক্তারের পরিবারের জন্য খালি করিয়ে দিলাম। তিনি মাদ্রাজ শহরের কর্মচঞ্চল জীবন থেকে এই নিরিবিলি ঘরে এসে উঠবেন। এখানকার জানালাটা খুলে দিলে দখিণের হাওয়া বইতে থাকে। এ হাওয়ার রোগের জীবাণু দূর হয়, স্বাস্থ্য ফিরে যায়, পাহাড়ের গাছপালার ওপর দিয়ে ফুলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসে, এই বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে সূর্যোদয় দেখার দুর্লভ সুযোগ ঘটে; প্রকাশমান সূর্যালোকে এই জলধারায় ঝলমলে হীরার ছটা। এই ঘরে বসেই দেখা যায়। রাতের জ্যোৎস্না-ভরা চাঁদ, চাঁদের আলোয় এই জলধারাকে দেখে মনে হয়, গলিত রূপার এক প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। বড় সুন্দর এ দৃশ্য। ডাক্তারবাবু এখানে এসে খুবই খুশী হবেন; একথা ভেবে খুশী মনে আমি তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

এসে পৌঁছলেন ডাক্তারবাবু। সঙ্গে ওঁর স্ত্রী, তরুণ পুত্র দিল্লীতে কাজ করে। মেয়ে মাদ্রাজে কুইন মেরী কলেজের ছাত্রী। সবাই খুব খুশী। ডাক্তারের ছেলে আর মেয়ে রোজই সকালে ঝর্ণায় গিয়ে স্নান করতো। খিদে পেলে ধোসা খেত। আবার গিয়ে ঝর্ণার ধারে বসত। ফিরে এসে তিরুনেলবেলীর বিখ্যাত আনৈক্কোম্বন চালের ভাত, তেঁতুল আর তরকারী দিয়ে খেত। আবার চলে যেত ঝর্ণার কাছে। কুট্টালমের

দিনগুলি আনন্দ মুখর হয়ে উঠল। ডাক্তারের স্ত্রী গোড়ার দুদিন সকালে ঝর্ণায় স্নান করেছিলেন। তারপর থেকে অন্য মহিলাদের সঙ্গে ইলংজী, তেনকাশী, শঙ্কোট্রট, মওয়মপারে ইত্যাদি আশেপাশের সব জায়গায় আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এবারে তিনি মুত্তুস্বামীকে নিয়েই ঝঞ্ঝাটে পড়লেন।

যেদিন ডাক্তার এসে কুট্রালমে পৌঁছলেন, সেদিনই তাঁর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। সবার সঙ্গে হেসে যিনি কথা বলেন, এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করেন, সেই মানুষটাকে গভীর চিন্তামগ্ন মনে হল। কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলছেন না। সকালে গিয়ে ঝর্ণায় স্নান করে আসেন। প্রাতরাশ সেরে নিজের কামরায় চলে যান। দুপুরের খাওয়ার সময় তাঁকে ডাকতে হয়। ততক্ষণ দক্ষিণের সেই ঘরটায় একলা চুপচাপ বসে থাকেন। ঘরের বাইরে আসেন না। প্রায় চারটার সময় নিজের ছড়িটা নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। 'পাঁচ ঝর্ণার' রাস্তা কিংবা শেণ্বকাটবী যাওয়ার পাহাড়ী পথে একা একা হেঁটে বেড়ান, নিতান্ত সৌজন্যসূচক কথাবার্তাও আমার সঙ্গে তিনি বলেন না। অন্ধকার হয়ে এলে বাসায় ফেরেন। আমি তাঁর রকম সকম দেখে ঘাবড়ে গেলাম।

চার পাঁচ দিন বাদে আমি আরও আশ্চর্য হলাম। একদিন ভোরে ঝর্ণা থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার উনি বেরিয়ে গেলেন। একটা অ্যালুমিনিয়মের ডিব্বায় একটা ধোসা ভরে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

'আজ চড়াই ধরে উঠব কিছুটা। তারপর ফিরব,' বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবার পর ফিরলেন।

একটানা দিন সাতেক ডাক্তারবাবু এইভাবে একা একা দূরে দূরে ঘুরে ফিরে বেড়ালেন। এসব দেখে ওঁর স্ত্রী চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। একদিন কথায় কথায় ওঁর চিন্তার কারণ আমায় বললেন।

এঁরা কুট্রালমে পৌঁছানোর আগের দিন খবরের কাগজে এক রেল দুর্ঘটনার কথা পড়লাম। তাতে রাজস্থান থেকে তামিলনাড়ুতে আগত এক শিল্পী গোষ্ঠী ছিল। আর ডাক্তার মুত্তুস্বামী নিজেই সরকারী হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা করেছেন। ডাক্তারের স্ত্রী আমায় বললেন, যে এই আহতদের চিকিৎসা করার পর থেকে ডাক্তারের ব্যবহারে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তারের স্ত্রী বললেন, 'দাদা, সেদিন থেকেই ডাক্তার কারুর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলছেন না। সব সময়েই যেন একটা চিন্তায় ডুবে থাকেন। এজন্য তাঁকে কুট্রালম আসার কথা বলি। আমি তো যথেষ্ট বিচলিত বোধ করছিলাম। মনে হল কুট্রালমে এলে হয়তো বা ডাক্তার আবার স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু এখানে এসেও তো দেখছি কারুর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করছেন না। আমি কখনও বেড়াতে যেতে বললে মানা করেন। এভাবে নিজেরমনে একা একা থাকা বা তাঁর পাহাড়ে

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত বিচিত্র ঠেকছে। আপনি একটু দেখুন না।'

তিন

একদিন ডাক্তারবাবুর অজ্ঞাতে আমি ওঁর পেছন পেছন চললাম। হাতের ছড়িটা ঠক্ ঠক্ করে পাথরে ঠুকতে ঠুকতে উনি বেশ জোরে জোরে সেই পাহাড়ী রাস্তায় চলতে লাগলেন। রাস্তাটা খুবই আঁকা বাঁকা। তাই বাঁকের মাথায় তাঁর দৃষ্টির আড়াল হবার জন্য আমি ঝোপ-ঝাড় আর বড় বড় পাথরের পেছনে লুকিয়ে পড়তে লাগলাম।

ভর দুপুরে উনি শেণ্বকাটবীতে গিয়ে পৌঁছুলেন, আমি গাছ-পালার পেছন থেকে ওকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

শেণ্বকা দেবীর মন্দিরের পাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটা গুহা ছিল না? উচ্ছল গীতমুখর ঝর্ণাধারার পাশের এই গুহাটা যেন ঈশ্বর-কামী কোনও ভক্তের উদার হৃদয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক লোকই এই গুহার কথা জানে। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর আরও কতকগুলো গুহা-কন্দর নজরে পড়ে। ডাক্তার এরকমই একটা কন্দরে প্রবেশ করে চোখ বুঁজে বসে পড়লেন।

প্রবাহমানা জলধারার মৃদু কলধ্বনীতে মনে হচ্ছিল যেন তানপুরার সুর ঝঙ্কৃত। তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে পাখীরা গান গাইছে। ঝর্ণার কল-কল্লোলও যেন তাল দিচ্ছে এর সঙ্গে। নানা ধ্বনি ও গুঞ্জনের সমাবেশে যেন এই পাহাড়ী এলাকাটায় মধুর এক সুরলহরীর সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী কি তবে এই সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকেন? কিংবা তাঁর মনের বিশেষ ভাবনা এই গুহায় গিয়ে আটকে পড়ে?

লুকিয়ে থাকার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!'

আমি সোজা এসে ডাক্তারবাবুর সামনে বসে পড়লাম।

ঘাবড়ে গিয়ে চোখ খুললেন ডাক্তারবাবু। তাঁকে দেখেফেলাটা তাঁর ভাল লাগেনি। আমার দিকে উনি খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। সে দৃষ্টি যেন আমায় বিদ্ধ করল।

'আমায় মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আপনার একা একা এখানে এসে বসা, হঠাৎ চিন্তায় ডুবে যাওয়া, চুপচাপ থাকা, সবই আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে। সব দেখেশুনে আপনার স্ত্রীও ভাবনায় পড়েছেন। এ কারণে...'

'আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারছি! যদি কথা দেন যে আমায় বিরক্ত করবেন না আর আমার কাজে বাধা দেবেন না, তবে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারি। নইলে...'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'না, না, তেমন কিছুই আমি করব না। আপনাকে

আমি কথা দিচ্ছি। আপনি বলুন, ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার বললেন, 'ভাই, রাজস্থান থেকে এক দল শিল্পী তামিলনাড়ুতে এসেছিল। এরা রেল দুর্ঘটনায় জখম হলে সরকারী হাসপাতালে এদের চিকিৎসা হয়। সব খবরই কাগজে পড়েছেন। এই শিল্পীদের মধ্যে তিনজন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় এদের। আমাকেই এদের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আবার এদের মধ্যে একজন ছিল যুবতী। তার অবস্থাই বিশেষ আশঙ্কাজনক মনে হয়েছিল। তার একটা পা কেটে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরেকজন ছিল যুবক। কাঁচের একটা টুকরো তার চোখের ভেতরে অনেকটা ঢুকে যায়। আমার সাথী চোখের ডাক্তারের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে, নিজের দায়িত্বে ওর অপারেশন করাই। তৃতীয় জনের একটা হাত কাঁধ থেকে কেটে বাদ দেবার দরকার হয়—তবেই তাকে বাঁচানো সম্ভবপর। আপনি আমায় ভাল রকম জানেন। অপারেশনের সময় এত সব তলিয়ে বিবেচনা করা আমার পোষায় না। আমি ত মানুষকে তখন গাজর-মুলোর মত কচাকচ কেটে ফেলি।

আমি ডাক্তারের একথা শুনে হতচকিত হয়ে গেলাম।

'ডাক্তারবাবু আপনি এসব কথা কেন বলছেন? রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ ধরনের কাটা-চেরা ত' প্রয়োজন। এতে দোষটা কোথায়?'

'এই তিন জনের অপারেশনের পরই এই কথাটা আমার মনে হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা তিন জন কি তবে বাঁচেনি?'

'বেঁচে গেছে আর আমার চিন্তা সে কারণেই। মরে গেলে আমি এত চিন্তিত হতাম না।'

একথা বলতে বলতে ডাক্তারের চোখ সজল হয়ে উঠল।

'ডাক্তারবাবু, আপনি আমায় এত ঘাবড়ে দিচ্ছেন কেন?'

'ভাই, যখন এই শিল্পীরা বেঁচে উঠল, চেতনা ফিরে এল ও দুনিয়ার মুখোমুখি হল, তখন তারা যন্ত্রনায় কাৎরে উঠল। এদের কষ্ট দেখে যে দুঃখ পেলাম সেটা বুঝিয়ে বলতে পারব না। 'দুঃখ হল' বলাটা নিতান্তই ছেঁদো কথা। কারণ যে বেদনা আমি অনুভব করলাম কিংবা করছি—তারও কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। যার পা কেটেছি সে রাজস্থানের একজন প্রসিদ্ধ নর্তকী। ওর মতন আরেকজন খুঁজে পাওয়া ভার। চোখ যার ফেলে দেওয়া হয়েছে সে একজন বিখ্যাত চিত্রকর। অন্য যার হাত আমি নির্দয়ভাবে কেটে বাদ দিয়েছি সে একজন অদ্বিতীয় সারেঙ্গীবাদক। রাজস্থান থেকে আগত শিল্পী-গোষ্ঠীর এরা তিনজনই ছিল প্রধান। এই যুবতীর কাছে তার পা প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান। চিত্রকরের চোখই ছিল প্রাণ। সারেঙ্গীবাদকের ডান হাতটাই সারেঙ্গীর ওপর খেলা করে যেত। তাই এই হাত আর আঙুলই ছিল তার জীবন। এসবই কেটে ফেলে দিয়েছি আমি।'

কথা বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভাই, আমি ভেবেছিলাম যে লোকগুলোর প্রাণ অন্ততঃ বাঁচছে। নিজের কর্মকুশলতা আর সেবাপরায়ণতায় কিছুটা অহঙ্কারও হয়েছিল। মনে একটা ধারনা জন্মেছিল যে মাদ্রাজ ছেড়ে দুদিনের জন্য কুট্রালম চলে যাই। তা দেখে অবসর বুঝে যমরাজ বদলা নিয়ে নেবেন। এভাবে নিজেকে নিজে দণ্ডিত করতে চাইলাম। শিল্পী তিন জনের প্রাণ রক্ষা করলাম। তাদের এই দুনিয়ায় জীবিত শবের আকারে বাঁচিয়ে রাখলাম। তাই না? এই ক্ষোভে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে। ওদের প্রাণতুল্য সব অঙ্গচ্যুতি ঘটিয়ে আমি ওদের চোখে জলের ধারা বইয়েছি। তাদের চোখে জল দেখে আমি অনুতপ্ত। কুট্রালমের এই ঝর্ণধারা আমায় শান্তি দিতে পারেনি। দক্ষিণের শীতল হাওয়ায় আমার হৃদয়ের জ্বালা মেটেনি। বড় চঞ্চল হয়ে আছে আমার মন ও শরীর, আমার প্রাণের ওপর আমার আর কোন মোহ নেই। অরণ্য পর্বতের এই নিরালায় চোখ বুঁজে বসে নিজের এই চিন্তাজাল থেকে আমি মুক্ত হবার চেষ্টা করছি। বলা হয় যে 'একা নিজের মনে থাকাটা খুবই মধুর।' তাই আমি এখানে এসে একলা বসি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না। জীবন-মৃত্যুর প্রকৃত মর্ম কিছুই আমি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করে জানার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আমি। উদ্বেগ আমার বেড়েই চলেছে।'

চার

এই ঘটনার পর ডাক্তারবাবুর ব্যবহারে আরও পরিবর্তন নজরে পড়ল। আগে জঙ্গলে গিয়ে চোখ বুঁজে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতেন। এখন বাড়িতেই মৌন অবলম্বন করলেন। চোখ বুজে বসে থাকার চেষ্টা করতেন। সবাই আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল। কখনও যদি বা বেরোতেন জোর করে সবাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেত। এটা মেনে নিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। মাদ্রাজ শহর আর অসংখ্য রুগীর কথা ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামীর যেন আর মনেই আসত না। সবাইকে মানসিক এক দোটানা আর চিন্তায় ফেলে তিনি নিজেও এক কষ্টকর রোগে ভুগত লাগলেন। হঠাৎ পালৈয়ক্কোট্ট থেকে একটা খবর এল যে সেখানে তিনটে জাঁদরেল ডাকাত ধরা পড়েছে। এরা রাতের বেলায় মাদ্রাজে এক বাড়িতে ঢুকে বন্দুক উঁচিয়ে ধন-সম্পত্তি লুঠ করছিল। ওদের জিনিসপত্র তল্লাস করতে গিয়ে পাঁচ বছর আগেকার চুরি যাওয়া আমাদের কিছু রূপার বাসন নাকি পাওয়া গেছে। তাই আমায় পালৈয়ক্কোট্টে গিয়ে ওই সব জিনিস আর লোকগুলোকে ঠিকমতো সনাক্ত করতে হবে। 'গাড়ীতে যাব ও দুপুর নাগাদ ফিরে আসব।' একথা জানিয়ে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে পালৈয়ক্কোট্ট রওয়ানা হলাম।

ধরা পড়া ডাকাতদের মধ্যে একজন ছিল বন্দুক চালানোয় ওস্তাদ। তার দৃষ্টি ছিল

খুব প্রখর। দ্বিতীয় জন সিঁধ কেটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়তে ওস্তাদ। তৃতীয় জন, সে যত-ভারী বোঝাই হোক, কাঁধে নিয়ে নিমেষে দূরে উধাও হয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। পালৈয়ক্কোট্টে পৌঁছে দেখা হল এই তিন জনের সঙ্গে। খুবই আশ্চর্যের কথা যে আমার সঙ্গী ডাক্তারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এই তিন জনই মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে তাকে নমস্তে জানাল। ডাক্তার অত খেয়ালই করলেন না। তবে বড় কথা যে পাহাড়ী এলাকার জঙ্গল ভুলে অতটা সময় তিনি আমার সঙ্গে কাটালেন। আর ওখানে অপেক্ষার প্রয়োজন না থাকায় আমরা কুট্রালমে ফিরে এলাম।

আমাদের ফেরার পর পুলিশ অফিসার চুরির তত্ত্ব-তালাশ চালাতে লাগলেন।

'তোরা এই ডাক্তারকে আগে জানতিস?' অফিসার এই প্রশ্ন করার পর, এরা যা জবাব দিল তা থেকে অনেক কিছু জানা গেল।

এই ডাকাত তিন জন অনেকবার, নানাভাবে কষ্ট পেয়ে, ভিন্ন নাম নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একবার সিঁধেল কন্নুস্বামীর উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তার হাত কেটে যায়। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী ওর হাতটা সম্পূর্ণ সারিয়ে দেন। আগে যেমন কাজকর্ম করতো তেমনই করে। এখনও সেই হাত দিয়ে সে সিঁধ কাটতে পারে। বন্দুকধারী দুরাইস্বামী একবার এক দুর্ঘটনায় পড়ে চোখে সূঁচ ঢুকে গিয়েছিল। চোখ তার ঠিক হয়ে যায়। একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেই অন্ধত্ব থেকে ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী আর তার সহকারী চোখের ডাক্তার তাকে বাঁচান। অন্য কেউ নয়। বোঝাবাহী পালোয়ান চোর মুখুপক্কিরীর কি হয়েছিল? পেট চালাবার কোন পথ না পেয়ে একবার সে ছারপোকানাশা বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলে মরেই যাচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তার মুত্তুকুমারস্বামী ওভাবে তাকে কি মরতে দিতে পারেন? তার প্রাণ উনি বাঁচিয়ে ছিলেন। ভাল করে ভিটামিনগুলি খাইয়ে চাঙ্গা করে আবার তাকে সংসারে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারের দয়ায় চোখ ফিরে পেয়ে বন্দুকওয়ালা দুরাইস্বামী আবার ঠিকমতো তাক করে গুলি চালাতে লাগল। হারানো-হাত ফিরে পাওয়া কন্নুস্বামী আবার সিঁধে পটু হয়ে উঠল। পালোয়ান মুখুপক্কিরী ডাক্তারের দয়ায় নতুন বল পেয়ে নিজের কাজ সুচারুভাবে করে যেতে লাগল। এসময় এও প্রমাণ হল যে ওদের কাছে রূপোর যা বাসন পাওয়া গেছে, তা আমাদেরই।

পাঁচ

যেদিন তথ্য বিভাগ থেকে এ খবরটা পেলাম, তার পরের দিনই ডাক্তার মাদ্রাজ রওয়ানা হয়ে যান।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ডাক্তারবাবু, একা একা যাচ্ছেন কেন?'

'একমাস রুগীদের ভুলে এখানে রইলাম। আমার নিজের রোগ এখন সেরে গেছে। এখন রুগীদের চিকিৎসা করা দরকার। কে জানে কতজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ভেবে ভেবে আমি দুঃখিত উদ্বিগ্ন এবং ব্যথিত বোধ করছিলাম যে নর্তকী যুবতীর পা কেটে ফেলেছি, চিত্রকরের চোখ আর সারেঙ্গী বাদকের হাতও বাদ দিতে হয়েছে। কিন্তু এখন আমি কি দেখছি? অত্যন্ত কষ্ট করে একজনের চোখ বাঁচিয়েছি। অন্য দুজনকেও হাত পা দিয়েছি। সেগুলো কি কাজে তারা লাগাচ্ছে, দেখলেন আপনি। কারুর কোনও অঙ্গ কেটে বাদ দেবার দায়িত্ব যদি আমার হয়, তবে তো কারুর হারানো অঙ্গ ফেরতের চেষ্টার দায়িত্বও আমার। তাই নয় কি?'

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। কিছু মনে পড়তেই ডাক্তার বললেন, 'ভাই শল্য চিকিৎসাই আমার কাজ। এর পরে কি হচ্ছে সেটা আমার জানতে চাওয়া অনুচিত। নিজেরটুকু করে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। ভগবান যা করেন, সেটা আমি নিজে করেছি ভাবা মূর্খতা। চোখ, হাত-পা কেটে ফেলা কিংবা সেসব ঠিক করে দেওয়া চিকিৎসকের কাজ। সে কাজ একান্তভাবেই চিকিৎসার সঙ্গে সম্বন্ধিত। নিজের অঙ্গের ব্যবহার মানুষ ঠিক মত করে কি করে না, কিংবা কোন কাজে ঠিকভাবে লাগায় ইত্যাদি আমার ভাববার কথা নয়। এসব যার যার ভাগ্যের ব্যাপার।'

'ভাগ্য বদলে দেওয়াও ত' আপনার কাজ...?'

'না। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি সেটা ঠিক নয়। জন্ম-মৃত্যু-রোগ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক্তিয়ারের বাইরে চিন্তা করা মূর্খামি। ডাক্তার খোদার ওপর খোদকারী করতে গেলে নিজেই রুগী হয়ে পড়বে। তার সে রোগের কোন ঔষধ নেই। চলুন ঝর্ণাতলায় গিয়ে স্নান করি। আমি ত' চলে যাচ্ছি। মাদ্রাজে বহু রুগী আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। কাজ আমায় ডাকছে।'

একথা বলতে বলতে কালপ্রবাহের মতো সতত বহমানা ঝর্ণার দিকে তিনি এগোলেন।

□□

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi and
printed at Beauty Print, New Delhi